প্রথম প্রকাশ : আগস্ট : ১৯৫৫

প্রকাশক : কে. চট্টোপাধ্যায়

৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক : পার্থ চট্টোপাধ্যায় জুপিটার প্রিন্টার্স

৫৫ মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৭০০০০

প্রচ্ছদ : শ্রীগণেশ বসু

কল্যাণমল

উৎসর্গ

বন্ধুবর পার্থ চট্টোপাধ্যায়-এর মারঃ হাতে

দু কথা

সর্দার কে. এম্. পাণিক্কর ভারতীয় কূটনৈতিক মহলের সুপরিচিত ব্যক্তি। বিভিন্ন লেখার মাধ্যমেও ইতিহাসকার হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তিনি যে তাঁর মাতৃভাষা মালয়ালমেও একজন সুপ্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক তা হয়ত অনেকের অজানা। তাঁর কয়েকখানি বহুজন প্রশংসিত গ্রন্থের অন্যতম হল 'কল্যাণমল'। এই গ্রন্থ মালয়ালম্ ভাষায় রচিত কল্যাণমল উপন্যাসেরই অনুবাদ। তাঁর রচিত ও আমার অনূদিত 'কেরল সিংহম' উপন্যাস ইতিপূর্বেই সমাদৃত হয়েছে।

মালয়ালম সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ কবি জি. শঙ্কর কুরূপ এবং ঔপন্যাসিক হলেন তাকাষি শিবশঙ্কর পিল্লাই। সামাজিক অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের সুর তাঁর কথা-সাহিত্যে বেজে উঠেছে। কেরলের ধীবর-সমাজ নিয়ে লিখিত 'চেম্মিন' সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার পেয়েছে। সাহিত্য অকাদেমি প্রকাশিত ও বাংলায় আমার অনূদিত এই উপন্যাসের নাম 'চিংড়ি'। উপন্যাসটি প্রত্যেক পাঠকের প্রশংসা পেয়েছে। লোকজীবন নিয়ে সাহিত্য রচনায় কারুর নীলকণ্ঠ পিল্লাই, পোন্নীকর রফি, পোন্কুন্নম্ ভর্কি, বি. এম. বশীর, এন. পি. মুহম্মদ এবং ব্যাঙ্গাত্মক ও মনস্তাত্ত্বিক রচনায় কেশরদেব জনপ্রিয়। শক্তিশালী সাহিত্যিকদের মধ্যে 'উরূব' এবং এস. কে পোট্রেক্কাটের নাম স্মরণীয়।

এস. কে. পোট্রেক্কাট ও কে. সি. পিটারের রচনায় ভ্রমণ সাহিত্য সৃষ্ট। জীবনীসাহিত্যে কে. এম. পাণিক্করের 'আত্মকথা' এবং কে. পি. কেশব মেননের 'কড়িন্ন কলম' উল্লেখযোগ্য অবদান। ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায় কে. এম্. পাণিক্কর, ইলকুলম্ কুঞ্জন পিল্লাই ও কে. দামোদরণের নাম অবশ্যকরণীয়। মার্কসীয় দর্শন ও সমাজ চিন্তার উপর গ্রন্থের সংখ্যা কম নয়। মালয়ালম্ ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় প্রশংসনীয় প্রয়াস উল্লুরের 'কেরল সাহিত্য চরিত্রম' এবং আর. নারায়ণ পাণিক্করের 'কেরল ভাষা' সাহিত্য অকাদেমি কর্তৃক পুরস্কৃত। সহজ সরল ভাষায় বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনা করেছেন এম. সি. নাম্বুদিরিপাদ, এস. পরমেশ্বরন্, ডঃ কে. ভাস্করন্ নায়র, ডঃ সি. আর. নারায়ণন প্রমুখ।

আশাকরি, জাতীয় সংহতির স্বার্থে, কল্যাণমল পাঠক-পাঠিকাদের সমাদর পাবে।

বোম্মানা বিশ্বনাথম্

বাদশাহ আকবরের রাজধানী আগ্রা ছিল সমসাময়িক নগরগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাদশাহের প্রাসাদ সমূহ ও উদ্যান গৃহগুলির রাজসিকতা এবং বিলাসী ওমরাহদের আবাসগুলির শিল্প বৈচিত্র্যময় ঐশ্বর্য আগ্রাকে করেছিল পারসিক ও তুর্কী রাজধানীর চেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন।

পশ্চিম থেকে পূর্বগামী পথের ধারে, যমুনার তীরে ছিল শাহনশাহের বন্ধু স্থানীয় আমীর ওমরাহদের অট্টালিকাশ্রেণী। প্রায় চার পাঁচ মাইল দীর্ঘ এই রাজপথের ধারে যমুনামুখী হয়ে দণ্ডায়মান ছিল প্রাসাদের সারি। বহিরঙ্গে এদের পার্থক্য দর্শকদের কাছে ধরা পড়তো না। এক স্থানে ছিল লোহিত প্রস্তরময় বৃহৎ সিংহদ্বার এবং তাকে অতিক্রম করলেই পাওয়া যেত এক উপবন। এই উপবন যেন সরবে তার প্রভুর ক্ষমতা ও প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করতো। কৃত্রিম জলাশয়, ধারা যন্ত্র, লতাকুঞ্জ প্রভৃতি তার রমনীয়তার দিকটি পরিস্ফুট করার সঙ্গে সঙ্গে একথা ঘোষণা করছিল যে উদ্যানের এই বৈশিষ্ট্য থেকেই একালের প্রভুদের মান সম্ভ্রমের উচ্চতার পরিমাণ স্বীকৃত হয়। উপবনের পশ্চাৎভাগে ছিল বাসগৃহ।

সিংহদ্বারে সর্বদা থাকত রক্ষী ও সশস্ত্র অনুচরদের প্রহরা। প্রতি গৃহের সম্মুখে গৃহস্বামীর অনুচর ও দাসদের পাহারা থাকায় ঐ স্থানটি নানা জাতি ও বেশভূষার সশস্ত্র মানুষের রণভূমির মত দেখাত।

রাজপথের এক প্রধান প্রাসাদে বুঁদির মহারাজা ভোজসিংহ বাস করতেন। সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় সেখান থেকে দীর্ঘ সুগঠিত ও সুন্দর এক যুবা পুরুষ বেরিয়ে ক্রমে পদব্রজে নগরাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর বয়স মনে হয় পঁচিশের কাছাকাছি। বেশভূষায় ও মুখশ্রীতে তাঁকে একজন রাজপুত্র বলে মনে হচ্ছিল। অন্যান্য প্রাসাদদ্বারে দণ্ডায়মান সশস্ত্র সৈনিকদল তাঁর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিক্ষেপ করল কিন্তু তাঁর কোটিলগ্ন দোদুল্যমান কৃপাণ এবং মুখমণ্ডলের দীপ্ত তেজ তাদের অগ্রসর হওয়ার সাহস কেড়ে নিল। কোন দিকে দৃকপাত মাত্র না করে উক্ত যুবক সোজা নগরে প্রবেশ করলেন। প্রধান বাজারে পৌঁছে তিনি শষ্কিতের মত

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন এবং শেষে পার্শ্ববর্তী এক বিপনির কাছে গিয়ে শেঠ কল্যাণমলের বাসস্থান কোন দিকে জিজ্ঞাসা করলেন। কল্যাণমল ছিলেন নগরীর রত্নব্যবসায়ীদের প্রধান। সুতরাং তাঁর ঠিকানা নির্দেশ করা দোকানদারটির পক্ষে কঠিন হলো না। কল্যাণমল আগ্রার পুরাতন বাসিন্দা নন। দশ পনের বছর আগে সিন্ধু অথবা গুজরাট থেকে এখানে তাঁর আগমন ঘটেছিল। পণ্যের বৈশিষ্ট্য এবং মূল্যের ঔচিত্য তাঁকে তাঁর সমব্যবসায়ীদের অগ্রগণ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পদস্থ বহু ব্যক্তি এবং বাদশাহের ঘনিষ্ঠ অনেকেই তাঁর বন্ধু ছিলেন। স্বয়ং বাদশাহের কাছেও তাঁর যাতায়াত ছিল। বাদশাহের পাটরাণী যোধাবাঈও যে নিজ প্রয়োজনীয় রত্নাদি তাঁর কাছ থেকেই কিনতেন তা প্রচারিত ছিল।

নবাগত যুবকটি প্রধান বাজার থেকে একটি সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করে 'চাঁদীওয়ালী' নামক অপর একটি সঙ্কীর্ণ পথে পৌঁছলেন। সেখান থেকে একটি ছোট সিংহদ্বার ও ভিতরের অঙ্গন দেখা গেল। নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে তিনি উক্ত ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। দ্বারে দণ্ডায়-মান সেবক তাঁকে উঠানের অপরদিকে সম্মুখবর্তী একটি ঘরে নিয়ে গেল। ঘরের দেওয়াল ঘেঁসে শতরঞ্চি বিছান ছিল আর তার উপর ছিল পরিষ্কার সাদা চাদর। একদিকে বড় বড় তাকিয়া পড়ে ছিল। ভিতরে প্রবেশ করা মাত্র একজন মুন্সী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'আসুন, আসন গ্রহণ করুন। আপনার জন্য কি করতে পারি আদেশ করুন। এখানে কিন্তু অন্ধকার হয়ে এলে আর মণিমুক্তার ব্যবসা হয় না।'

'আমি শেঠ কল্যাণমলের সঙ্গে দেখা করতে চাই। উনি কি ভেতরে আছেন?' যুবক প্রশ্ন করেন।

'আছেন, কিন্তু উনি সাধারণত অপরিচিতদের সঙ্গে দেখা করেন না। আর এখন উনি এক বন্ধুর সঙ্গে বার্তালাপে রত আছেন। বিশেষ কাজ যদি থাকে আমাকে বলতে পারেন।' মুন্সী উত্তরে বলল।

'আমাকে ওঁর সঙ্গেই দেখা করতে হবে। দয়া করে খবর দিন।'

'আমার প্রভু বোধ হয় আপনার পরিচিত?'

'না। আমি এই দুদিন মাত্র হলো আগ্রায় এসেছি।'

'তাহলে ওঁর কোন বন্ধুর চিঠি নিয়ে এসেছেন বোধ হয় ?'

'তা-ও নয়। বুঁদির মহারাজার পরামর্শক্রমে এসেছি।'

বেশ, আমি এখনি শেঠজীকে জানাচ্ছি।' মুন্সী ভিতরে চলে গেল এবং তৎক্ষণাৎ ফিরে এসে জানাল যে শেঠজী তাঁর প্রতীক্ষায় রয়েছেন। দুজনে ভেতরের দিকে অগ্রসর হলেন।

বাইরে থেকে যেমন মনে হচ্ছিল গৃহের অভ্যন্তরভাগ তেমন ছিল না। ঘরটি রাজকায় ভাবে সজ্জিত ছিল। সজ্জার উপকরণ গুলি সম্পদ আর সমৃদ্ধির পরিচয় দিচ্ছিল। নিচের আস্তরণ এবং দেওয়ালের অলঙ্করণ ছিল মহার্ঘ ও শ্রেষ্ঠ। ফলে যুবক আশ্চর্য না হয়ে পারেননি কিন্তু তাঁর সেই মনোভাবের ছাপকে তিনি তাঁর মুখমণ্ডলে ব্যাপ্ত হতে দিলেন না। এইভাবে তিনি শেঠ কল্যাণমলের প্রকোষ্ঠে পৌঁছলেন।

শেঠজীর বয়স ষাট অতিক্রান্ত হলেও তাঁর মুখে বার্ধক্যের কোন ছাপই পড়েনি। শরীর ছিল দৃঢ় ও সুগঠিত। যুবকের ধারণা অনুযায়ী শেঠেরা হয় বিপুল উদরের ভারগ্রস্ত, স্থূলাঙ্গ, গোলাকার ও দুর্বলতায় কুব্জ। কল্যাণমল তাঁর কাছে একজন বড়দরের সামন্ত অথবা রাজবংশীয় বলে প্রতীয়মান হলো। গাত্রোত্থান করে শেঠজী সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে মহামূল্য জরীর আসনে তাঁকে বসালেন।

তিনি বললেন, 'মুন্সীর কাছে সব শুনেছি। বুঁদি মহারাজের নির্দেশে আপনার আগমনে আমি কৃতার্থ হয়েছি। কী আদেশ বলুন।'

'তিনি আমাকে বললেন যে আমি যদি আমার সমস্ত কথা আপনাকে বলি তাহলে আপনি আমাকে সব রকমের সাহায্য করবেন।' যুবক বললেন। কল্যাণমল মৃদু হাসলেন, কিছু বললেন না। যুবক বললেন, 'নিজের কথা আমি সংক্ষেপে বলব। তারপরে সাহায্য প্রার্থনা করাই সঙ্গত হবে।' কল্যাণমল স্বীকৃতিসূচকভাবে মাথা নাড়লেন।

যুবক আবার বলতে লাগলেন, 'আমি বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত রামগড়ের রাজপুত্র দলপতি সিংহ।'

'কোন্ রাজার ?' সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ করে শেঠজী প্রশ্ন করলেন।

'রাজা ভূপাল সিংহ এবং তাঁর রাজ্য রামগড়ের কথা আপনি

বোধহয় শোনেন নি। বাদশাহ আকবরের শক্তি যখন বুন্দেলখণ্ডের দিকে বিস্তার লাভ করতে লাগল তখন আমার পিতৃব্য মহাপরাক্রান্ত অজিত সিংহ ছিলেন মহারাজা। মোগলের অধীনতা স্বীকার করে একজন সামন্ত হিসাবে থাকার হীনতা তাঁর পক্ষে সহনীয় ছিল না। সেইজন্য মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য তিনি তাঁর দেহ-মন-ধন সবই নিয়োজিত করলেন। পারিবারিক দ্বন্দ্বের ফলে মোগলেরা সুবিধা না পাওয়া পর্য্যন্ত তিনি তাঁর চেষ্টায় সাফল্যলাভ করেছিলেন। আমার পিতৃদেবকে তিনি সিংহাসনের ভার অর্পণ করেছিলেন এবং আমার পিতাও কিছুদিন তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিলেন। কিন্তু মোগল সর্দারদের অসহ্য ধূর্ত্ততায় বিরক্ত হয়ে শেষ পর্য্যন্ত তিনি তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে বাধ্য হলেন। চার বছর আগে পিতৃদেব ইহলোক ত্যাগ করলেন। যৌবনে কৃত বিবেকহীন কাজগুলির যে কলঙ্ক আমাদের বংশের ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করেছিল তারই স্মৃতি তাঁর মনকে ভেঙে দিয়েছিল। মৃত্যুকালে রাজকীয় খড়্গ, মুদ্রা এবং রাজকোষের চাবি আমার হাতে দিয়ে তিনি আমাকে আদেশ করলেন যে আমি যেন মহারাজ অজিত সিংহের পুত্রদের হয়ে রাজ্যশাসন করি এবং তাঁদের অনুসন্ধানের পূর্ণ প্রচেষ্টা করি। কিন্তু বাদশাহের সুবেদার আমার রাজ্যাভিষেকে বাধা দিলেন এবং আমার নাবালক কনিষ্ঠ সহোদরকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করলেন। তাব সাবালক হওয়া পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনার জন্য আমার এক আত্মীয়কে, যিনি ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, নিযুক্ত করা হলো।

'তারপর?' শেঠ কল্যাণমল প্রশ্ন করলেন।

যুবক বললেন, 'এই ঘটনার পর আজ তিন বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। রাজ্য থেকে নির্বাসিত হয়ে আমি কিছু অনুচর সহ মহারাণা প্রতাপ সিংহের শরণাপন্ন হলাম। মোগলশক্তির আয়ত্তের বাইরে এখন তো একমাত্র চিতোরই আছে।'

'এখন মোগল সম্রাটের কাছে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে এলেন কেন?'

'এখন বুঝেছি যে যুদ্ধের মাধ্যমে রামগড়ের স্বাধীনতা লাভ সম্ভব

নয়। পিতৃ আজ্ঞা পালন করতেই হবে। সেইজন্য স্থির করেছি যে বাদশাহের কৃপায় যদি পৈতৃক রাজ্য ফেরত পাই তার চেষ্টা করে দেখি। বাদশাহের আশ্রয়ে থেকে উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভ করা আমার লক্ষ্য নয়।'

'প্রতাপ সিংহের সভায় অজিত সিংহের সন্ধান পেলেন না?'

'রামগড়ে শুনেছিলাম তিনি মহারাণার সঙ্গে রয়েছেন। সরাসরি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, চিতোরগড়ের যুদ্ধে আমার পিতৃব্য এবং তাঁর একমাত্র পুত্র বীরোচিত মৃত্যু বরণ করেছেন।'

'তাহলে রাজ্যের উত্তরাধিকারী এখন আপনিই?'

'এখন পর্যন্ত তা মনে করি না। তাঁর আর কোন সন্তান ছিল কিনা কি করে জানব? এ ব্যাপারে অনুসন্ধান করা আমার কর্তব্য।'

সব কথা শোনার পর শেঠজী বেশ কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থেকে বললেন, 'আপনার কাহিনী বড়ই দুঃখজনক। আমাদের ভারতের কী দুরবস্থাই না হয়েছে! আমাদের রাজাদের দিকে তাকান, হয় তাঁরা প্রতাপ সিংহের মত অরণ্যপর্বতে ঘুরছেন নয়ত বাদশাহের আশ্রয়ে স্বর্ণাবৃত হয়ে দাস্যবৃত্তি করছেন! কী দুঃখ জনক অবস্থা! আপনার কথাই বা কে শুনবে? কাবুল থেকে বীজাপুর পর্যন্ত বিস্তৃর্ণ ভূভাগের রাজা মহারাজার দল নিজের নিজের আবেদন নিয়ে এখানে এসে পড়ে আছেন। কালক্রমে এঁরা নিজেদের কর্তব্যের কথা ভুলে যাবেন। তারপর কোন ওমরাহকে খোশামোদ করে সৈন্যবাহিনীতে একটা চাকরি জুটিয়ে নেবেন এবং তাঁরাও যে বাদশাহের প্রিয়পাত্র এই ভাব জাহির করতে থাকবেন। বাদশাহের দরবারের হালচাল বোঝা সহজ নয়। শত্রুদমনে সহায়ক প্রত্যেকের সব কাজেই, তা সে ভুলই হোক, আর ঠিকই হোক, বাদশাহ সহায়ক হন। আপনি কি মনে করেন যে শুধু বন্ধুত্বের জন্যই বাদশাহ অম্বররাজ মান সিংহ বা বিকানীরের রায় সিংহের সাহায্যে এগিয়ে আসেন? মহারাণা প্রতাপ যে পর্যন্ত বাদশাহের বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকবেন সেই পর্যন্তই এঁদের সাহায্যের প্রয়োজন বাদশাহের থাকবে। ধূর্ত

মোগল সর্দারদের শক্তি হ্রাস করবার জন্যও কিছু হিন্দু রাজার প্রয়োজন রয়েছে। নীতি নিপুণ বাদশাহ এঁদের কারোর সুহৃদ ভাবেন না।'

দলপতি সিংহ বিস্ময়ান্বিত হলেন। সাম্রাজ্য ও রাজকীয় ক্রিয়া-কলাপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ যুবক, স্বীয় আকাঙ্খাগুলি দিবাস্বপ্নে পর্যবসিত হওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'এই অবস্থায় তা হলে রাজসভাস্থিত সর্দার বা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিবর্গের সাহচর্যে আসার অথবা তাঁদের মিত্রতা লাভের চেষ্টা কি ব্যর্থ হবে?' 'কথাটা ঠিক তা নয়।' শেঠজী বললেন, 'মানুষের ভাগ্যের কথা কে বলতে পারে! আপনারই মত সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এসে বীরবল এবং পৃথ্বী সিংহ আজ বাদশাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়েছেন। আমার বক্তব্য হল, এ কথা আপনি মনে রাখবেন, বাদশাহের বন্ধুত্ব লাভের ইচ্ছা নিয়ে যে হাজার হাজার লোক এখানে এসেছেন তাদের মধ্যে মাত্র তিন চারজনই সফল হয়েছেন। আপনিও এই ভাগ্যবানদের মধ্যে একজন হতে পারেন। সুতরাং নিরাশ হওয়ার দরকার নেই। তবুও একথা মনে করবেন না যে আপনার বক্তব্য যেহেতু ন্যায্য সেই কারণেই ন্যায় বিচার আপনি পাবেন। নিজেদের রাজাধিরাজ বলে প্রচারকারা অসংখ্য ব্যক্তি যেখানে দ্বারপাল হয়ে সুযোগের প্রতীক্ষায় রয়েছেন সেখানে রামগড়ের নামই বা কে শুনেছে? আর কেউ যদি শুনেও থাকে তা হলেও ঐ সাধারণ কথার ফেরে পড়ে কেবা নিজের পথে বাধা সৃষ্টি করা পছন্দ করবে?'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আপনার বক্তব্য আমার বোধগম্য হয়েছে। আমার আকাঙ্খা সহজসাধ্য নয়। সৌভাগ্যক্রমে যদি বাদশাহের বিশেষ কোন কাজ করার সুযোগ হয় তবে হয়ত কার্যোদ্ধারের আশা করা যায়। অন্যথায় সর্দারদের বন্ধুত্বে, মন্ত্রীদের সদিচ্ছায় অথবা বাদশাহের নজরে আসায় কোন লাভ নেই।'

শেঠজী বললেন, 'আমার কথার প্রকৃত অর্থই হল এই। আর একটা কথা আমি বলতে চাই। এ এক বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজধানী। নগর মাত্রেই ভালমন্দ লোক থাকে আর রাজধানী সম্বন্ধে একথা তো বিশেষ-

ভাবে প্রযোজ্য। তারপর বাদশাহের রাজধানীর কথা কি আর বলতে হয়? এই শহরের সঙ্গে অধিক ঘনিষ্টতা লাভের পর আমার কথার অর্থ আপনার সম্পূর্ণ বোধগম্য হবে। এখানে আগত যুবকদের মন নানাভাবে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়ে আর তারা তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা ভুলে যায়। কেউ কেউ রাজসেবার কাজকর্মে পটু হয়ে সেইদিকে চলে যায় এবং কিছু লোক বিলাসিতা ও বিষয়াসক্তির আবর্তে আবদ্ধ হয়। ভারতের হিন্দুদের বহু অপরিচিত বিলাস উপকরণে এই রাজধানী পরিপূর্ণ। বেশির ভাগ যুবকই ফরাসী মদের মোহে নিজেদের হারিয়ে ফেলে। যে মালিকের সেবক তারা হয় তাদের ব্যবহারও তাঁর অনুকূল হয়ে পড়ে। বাদশাহের ঘনিষ্টতম সামন্তবৃন্দ ও গোনাগুন্তি কিছু সর্দারদের বাদ দিলে বাকি সবাই এই ধরনের অনাচারে নিমজ্জিত হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। এদের মাঝ থেকে নিজের আদর্শ ও নিষ্ঠাকে সুরক্ষিত রাখা শক্ত। এর পরের কথা আর কি বলব?'

দলপতি সিংহ বললেন, 'এ আমিও বুঝেছি। এই সব সত্য হওয়ার পরও যদি আপনি মনে করেন যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমার অগ্রসর হওয়া কর্তব্য তবে অনুগ্রহ করে পথ নির্দেশের ভার আপনিই নিন।'

'বেশ! কিন্তু আপনার আর্থিক অবস্থা কেমন সেটা বলুন।'

দলপতি সিংহ নির্বাক রয়েছেন দেখে শেঠজী আবার বললেন, 'আপনার মৌনতা থেকেই আমি বুঝে নিয়েছি। কিন্তু আপনি এটা জানেন যে বিনা অর্থে এই রাজধানীতে কিছুই করা সম্ভব নয়।'

'পরমপ্রিয় ভোজ সিংহ মহারাজ এ বিষয়ে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল ভাল বেতনের সাধারণ কাজ সংগ্রহ।'

'এবং আপনি তাঁর বন্ধু তথা আত্মীয়ও বটে। বেশ তার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাদশাহের পরম মিত্র পৃথ্বী সিংহ, যাঁকে "পীথল" নামে ডাকা হয়ে থাকে, আমার প্রতি তাঁর দুর্বলতা আছে। তাঁর রাজপুত বাহিনীতে আপনার জন্য ভাল পদের ব্যবস্থা করে দেবো। এখন কোথায় আছেন!'

'এখন পর্যন্ত বুঁদি মহারাজের অতিথি হিসাবে আছি। কিন্তু এভাবে কতদিন চলতে পারে?

'এই নগরেরই কোথাও একটা ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা সঙ্গত হবে। রাজা পীথলের সেনাবাহিনীতে কাজ পাওয়ার পর বাদশাহের নজরে পড়ার মত অনেক সুযোগ মিলতে পারে। আর আমি জানি এই ধরনের সুযোগ আপনি নিজেই খুঁজে বার করবেন। আর একটা কথা, এই দরবারে অনেক দল উপদল আছে। আজ যাঁদের বন্ধু বলে মনে হবে কালই তাঁরা পরস্পরের গলা কাটতে উদ্যত দেখা যাবে। এজন্য সতর্ক থাকতে হবে যাতে আপনি কারো শত্রু হয়ে না পড়েন। যতটা সম্ভব বন্ধুত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করুন। দানিয়েল শাহের দরবারে মাঝে মাঝে যাবেন। বাদশাহ ওঁকে স্নেহ করেন।'

এরপর শেঠজী মুন্সীকে ডেকে রাজা পীথল এবং দানিয়েল শাহের দেওয়ান দীনদয়ালের নামে একখানি করে চিঠি লিখে আনার আদেশ দিলেন। দুটি চিঠিতেই তিনি মূলত এই কথা লেখালেন, পত্রবাহক এক খ্যাতনামা ও প্রাচীন রাজপরিবারের ব্যক্তি এবং এঁর উন্নতি করার আগ্রহ আছে, সুতরাং এঁর সহায়তা করলে তিনি কৃতজ্ঞ হবেন। রাজা পীথলের জন্য তিনি একটি পৃথক পত্র লেখালেন। তাতে দয়া করে তাঁর সেনাবাহিনীতে যুবককে একটি ভালপদ দেওয়ার অনুরোধ জানানো হলো। চিঠিগুলো নিয়ে মুন্সী না আসা পর্যন্ত তাঁদের কথাবার্তা চলল। এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দলপতি সিংহ কল্যাণমলের জ্ঞান, রাজকার্যের সঙ্গে পরিচয় এবং বাদশাহ ও অন্যান্য পদস্থ ব্যক্তিবর্গের সমাবেশে উচ্চ স্থান সম্বন্ধে ধারণা লাভ করলেন। মনে মনে এই কথাই তিনি চিন্তা করলেন যে মহারাজ ভোজ সিং তাঁকে অকারণে এঁর কাছে পাঠান নি। কিছুক্ষণের মধ্যেই মুন্সী চিঠি নিয়ে এলো। চিঠিতে স্বাক্ষরদান করে শেঠজী বললেন, 'দেরি হয়ে যাচ্ছে। এই নগরীতে আপনার পরিচিত কোন আত্মীয় বা মিত্র নেই। আমার বাড়িকে নিজের বাড়ি মনে করবেন। আপনার এখানে আসা যাওয়ার কোন বাধা থাকবে না।'

দলপতি সিংহ যথাযোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়ে যাত্রা করলেন।

শেঠ কল্যাণমলের সুপারিশের মূল্য কত বেশি, দলপতি সিংহ পরের

দিনই বুঝতে পারলেন। বুঁদি রাজের অশ্বশালা থেকে অশ্ব এবং সেনাদের মধ্য থেকে অনুচর গ্রহণ করার অনুমতি তাঁর ছিল। সুতরাং একটি অশ্ব এবং রামগড় থেকে আগত অনুচরটিকে নিয়ে তিনি রাজা পীথলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রওনা হলেন। বাদশাহ আকবর 'পীথল' নামে যাঁকে সস্নেহ সম্বোধন করতেন সেই পৃথ্বী সিংহ রাঠোর ছিলেন বিকানীরের মহারাজা রায় সিংহের ভাই এবং তৎকালীন বারপুরুষদের অগ্রগণ্য। সে সময় তার বয়স ছিল প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর। দীর্ঘ দেহ, তদুপযোগী সুসম রূপ, পৌরুষে ভরা সৌন্দর্য্য, আজানুলম্বিত বাহু, বিশাল বক্ষ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর উচ্চ পদমর্য্যাদা এবং গুণের প্রত্যক্ষ পরিচয় স্ফুরিত হচ্ছিল। তৎকালীন রাজপুতদের প্রথামত বড় আকারের গোঁফ দাড়ি তাঁর দুঃখের গাম্ভার্যকে আরও মূর্ত করে তুলেছিল। তাঁর পরাক্রম ও বীরত্বের কাহিনী ছিল প্রবাদবাক্যের মত। নিজের মতকে বাদশাহের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার ক্ষমতা রাজ দরবারের সকলের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। এই সাহসের নজীর হিসাবে একটি কাহিনী আজও সাধারণের মধ্যে প্রচলিত রয়েছে। আগ্রায় একবার একটি জনরব প্রচারিত হয় যে মোগল সাম্রাজ্যের আজন্ম শত্রু মহারাণা প্রতাপ সিংহ বাদশাহের অধীনতা স্বীকার করে নিয়েছেন। মহানন্দে আকবর এই কথা দরবারে প্রকাশ করলেন। পীথল তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বললেন যে প্রতাপ সিংহ কখনও পরাধীনতা স্বীকার করতে পারেন না। বাদশাহ সরবে হেসে উঠলেন। পরে পীথল পদ্যছন্দে নিচের চিঠিটি প্রতাপ-সিংহকে লিখে পাঠালেন ঃ

'বাদশাহ' এই শব্দ যদি আসে তোমার মুখে
সূর্যোদয়ও সেদিন হবে পশ্চিম আকাশে।
গোঁফ্ জোড়ার এই দৃপ্ততাকে মুছতে হবে নাকি ?
সত্য বলো, হে মহারাজ ! কি বলে প্রাণ রাখি ॥

দশদিনের মধ্যে প্রতাপ সিংহের যে জবাব এল তা নিম্নরূপ ঃ

শরীরে যতদিন থাকবে প্রাণ
আকবরকে তুর্কী বলেই করব সম্বোধন

তোমার গোঁফের দৃপ্ততা রাখো বজায়।
সূর্য পূর্বদিকেই উদিত হবে
তুমিও অমর থাকবে।'

নিজের চিঠি এবং তার উত্তর এই দুটিকেই রাজ সভায় পড়ে শোনাতে পৃথ্বী সিংহের কোন রকম ভয় বা সঙ্কোচ হয়নি।

সেকালের কবিদের অগ্রগণ্য ছিলেন পৃথ্বী সিংহ। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্য 'বেলি ক্রিসন রুক্মিণীরী' আজও রাজস্থানী সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করে রয়েছে। এইভাবে সবদিক থেকে সমাদর যোগ্য রাজা পীথলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার আশায় দলপতি সিংহের অত্যধিক আনন্দিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল। পীথল থাকতেন শহর থেকে অল্পদূরে একটি উদ্যানে বাদশাহের এক প্রাসাদে। দলপতি সিংহ যখন সেখানে উপস্থিত হলেন তখন বহুলোক সেই প্রাসাদের সামনে সমবেত হয়েছিল। একজন ভৃত্য একটি সুসজ্জিত শ্বেত অশ্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। দলপতি বুঝতে পারলেন যে রাজা কোন কাজে যাচ্ছেন সুতরাং আজ আর সাক্ষাৎ করা সম্ভব হবে না। যেকোন প্রকারেই হোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিত মনে করে তিনি অশ্ব থেকে অবতরণ না করেই রাস্তার পাশে একস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে পীথল বেরিয়ে এলেন এবং অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে অগ্রসর হলেন। ইতিমধ্যে তাঁর দৃষ্টি দলপতির উপর নিবদ্ধ হলো। সংস্কারে বিশ্বাসী রাজা এই নবাগতের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করার নির্দেশ দিলেন তাঁর এক অনুচরকে। দলপতি সিংহ সঙ্গে আনা পত্রটি অনুচরের হাতে দিতেই তাঁর কাছে যাওয়ার অনুমতি মিলল। রাজা তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি হেনে বললেন, 'নিজের বন্ধুর কথা তো আমি অমান্য করতে পারিনা আর আমার মনে হচ্ছে আমরা একে অপরের অনুকুল হবো। এখন আমি বাদশাহের সঙ্গে দেখা করার জন্য ককরালি যাচ্ছি। আমার সঙ্গে চলো। অনুচরের দরকার নেই।'

আজ্ঞানুসারে সঙ্গী ভৃত্যকে ফিরিয়ে দিয়ে দলপতি সিংহ রাজা পীথলের অনুগমন করলেন। তাঁরা এগোতে লাগলেন আগ্রা থেকে দক্ষিণদিকে যাওয়ার রাস্তা ধরে। পথে পীথল দলপতিকে অনেক প্রশ্ন করলেন।

তাঁকে সঙ্গে আনার উদ্দেশ্যই তাঁর এই ছিল। তিনি জানতেন যে শেঠ কল্যাণমল যোগ্য লোকের জন্যই সুপারিশ করেন, আর আজকেরটি তো ঠিক আদেশের মত। মনে হতে পারে যে মহারাজাধিরাজদেরও আদেশ অথবা অবশ্য পালনীয় সুপারিশ করার অধিকার একজন সাধারণ শেঠ কিভাবে পেল। রাজধানীর পরিপূর্ণ জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের মধ্যে বসবাসকারী পদস্থ ব্যক্তিদেরও আর্থিক সঙ্কটে পড়া একটা অসাধারণ ঘটনা নয়। শোনা যায় যে মাঝে মাঝে প্রয়োজনীয় সাহায্য তাঁরা শেঠ কল্যাণমলের কাছ থেকেই পেতেন। যে ভাবেই হোক একথা তো ঠিক যে আমীর-ওমরাহ্ এবং শাহজাদাও তাঁর কথা ফেলতে পারতেন না।

সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েও দলপতি নিজের সব কথা পীথলকে আগে বলেননি। তিনি কেবল এই কথাই বলেছিলেন যে তিনি রামগড়ের রাজকুমার এবং সেখানকার সুবেদারের অবিচারের ফলে তাঁর ছোট ভাইকে রাজপদ দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য বাদশাহ অথবা কোন হিন্দু রাজার সেবার মাধ্যমে সম্মানজনক জীবন যাপনের অভিলাষে তিনি এখানে এসেছেন।

সাধারণ রাজপুত যুবকদের আশ্রয় দানের মাধ্যমে নিজ সমাজে স্বীয় মর্যাদা বৃদ্ধিতে ইচ্ছুক রাজা পীথল দলপতির অভিলাষের কথা শুনে আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, 'শেঠজী আমার উপকারই করেছেন। আমার সৈন্যবাহিনীর একটি বিভাগে একজন সেনানায়কের পদ শূন্য আছে। উক্ত পদের জন্য তোমাকে পেয়ে আমি খুশী হয়েছি।'

রসসমৃদ্ধ বাক্যালাপে খ্যাত পীথল যখন মৃদুহাস্য সহকারে এবং মধুর কণ্ঠে এই কথাগুলি বললেন তখন আনন্দে দলপতি সিংহের হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। ইষ্টদেবের কাছ থেকে বরপ্রাপ্তির তুল্য প্রসন্নতায় তিনি তাঁর তরবারিকে প্রভুর চরণতলে সমর্পণ করতে গিয়ে বললেন, 'মহারাজ! আপনার আদেশকে আমি বরদান বলে মনে করি। আপনার মত মহান এবং হিন্দুকুলচূড়ামণি প্রভুর ভৃত্য হওয়ার সৌভাগ্য আমি কুলদেবতার অনুগ্রহেই লাভ করেছি। নতুবা আপনাকে সন্তুষ্ট করবার মত কোন গুণ আমার নেই। নিজের মহান পূর্বসূরীদের

সর্বজনবিদিত নামকে কলঙ্কিত না করে আপনার সেবা করবো এবং আপনার আদেশ আমার শিরোধার্য হবে। এটাই আমার প্রতিজ্ঞা।'

রাজা পীথল উত্তর দিলেন, 'তোমার উচ্চ বংশের যোগ্য কথাই তুমি বলেছ। আমার বিশ্বাস সব অবস্থায় তুমি ন্যায় অন্যায় বিচার করে কাজ করবে। একটা কথা তোমায় বলে দিতে চাই। আমার বেশির ভাগ সময় বাদশাহের কাছেই থাকতে হয়। সেইজন্য আমি স্বাধীনভাবে কিছু করতে পারি না। বাদশাহ যখন রাজধানীতে থাকেন তখন আমি হয় দরবারে অথবা মৃগয়াগৃহে নতুবা ফতহপুরীতে থাকি। তোমাকেও ঐসব রাজপ্রাসাদের বাইরের দালানে থাকতে হবে। ওখানে যারা সমবেত হবে তারা সবাই বাদশাহের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের অনুচর। তাদের ভাব দেখে অথবা ভাষা শুনে যদি খারাপ লাগে তবুও অসির শক্তিকে কাজে লাগাতে যেয়ো না। রাজ ভৃত্যদের মধ্যে এক বিশেষ জিনিস আছে. সেটা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা। সামনে স্নেহের ভাব প্রদর্শনকারা পিছন থেকে সুযোগমত আঘাত করতে ছাড়বে না। রাজপুরীর মধ্যে কোন বিবাদ বা দ্বন্দ্বের কারণ হয়ো না। তাতে তুমি বাদশাহের ক্রোধের পাত্রে পরিণত হবে।'

যদিও দলপতির মনে হলো যে কেউ কিছু বললে চুপচাপ শুনে যাওয়াটা বীরোচিত নয়, তবুও তিনি তাঁর প্রভুর নির্দেশ সাদরে স্বীকার করে নিলেন। তিনি জানেন যে রাজসেবা একটা কঠিন কাজ।

রাজা পীথল অন্য কথায় এলেন, 'এই পথের অদূরে ঐ যে বৃহৎ সিংহদ্বারওয়ালা প্রাসাদ দেখছ, ওটা নাসির খাঁর। নাসির খাঁ যে কে তা তোমায় সব সময় মনে রাখতে হবে। আজ বোধহয় তাঁকে মৃগয়াগৃহে পাওয়া যাবে। তিনি হচ্ছেন বাদশাহের হিন্দু-সুহৃদদের প্রধান শত্রু। বাদশাহের অন্যতম এক প্রধানা বেগমের পিতৃত্বের দাবীতে দরবারে ওঁর প্রবল প্রতাপ।

রাজা পীথল যে দিকে সঙ্কেত করলেন, দলপতি সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। এক রমনীয় উদ্যান এবং তার মাঝে এক বিশাল প্রাসাদ, যার সামনে বহু সংখ্যক সৈনিক সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান চোখে পড়ল।

পীথল আবার বললেন, 'মৃগয়াগৃহ, যেখানে এখন বাদশাহ বিরাজ করছেন, এখান থেকে বেশি দূর নয়। নাসির খাঁর প্রাসাদ আর ঐ সংরক্ষিত বনের মাঝখানে কয়েকজন সামন্তের প্রাসাদ। ঐ গুলির মধ্যে একটি ব্যতীত সব কটি-ই তুর্কী ওমরাহদের। তাদের একটি প্রাসাদের কথা তোমায় মনে রাখতে হবে। সেটি শাহজাদা দানিয়ালের প্রাসাদ। রাস্তায় পড়ে, যাওয়ার সময়, আমি তোমাকে দেখিয়ে দেবো।'

দানিয়াল শাহের সঙ্গে যে দেখা করা উচিত শেঠজীর এই পরামর্শের কথা সুযোগ পেয়ে দলপতি পৃথ্বি সিংহকে বললেন। শাহজাদার দেওয়ান দীনদয়ালের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রটির বিষয়েও তিনি আলোচনা করলেন। রাজা পীথল উত্তর দিলেন, 'শেঠজীর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতা আশ্চর্যজনক। দানিয়াল দাসীপুত্র হওয়ায় এবং ধূর্ত ও নীতিনিপুণ না হওয়া সত্বেও বাদশাহের স্নেহের পাত্র। লোকের ধারণা যে উনি সেলিমের উত্তরাধিকারের পথে বাধা হয়ে উঠতে পারেন। বাদশাহের অন্তরঙ্গরা একথা না মানলেও তাঁর সঙ্গে সদ্ভাব রাখা উচিত বলে মনে করেন। দানিয়েল পক্ষের একটি বড় দল রাজধানীতে রয়েছে। তাঁদের প্রধান হচ্ছেন বাদশাহের মুখ্যমন্ত্রী এবং সেলিমের শত্রু আবুল ফজল। নিজের শ্রেষ্ঠ সচিবের উপর যে বিশ্বাস রয়েছে তারই ফলে শাসনকার্যে দানিয়ালশাহের এত শক্তি। তুমি অবশ্য দীনদয়ালের সঙ্গে দেখা করো। সমবয়স্ক হওয়ায় দানিয়াল সম্ভবত তোমাকে ভালবাসতে পারেন।'

রাজকার্য সম্বন্ধে নিজের কর্মচারীর সঙ্গে এত কথা বলার পেছনে পীথলের বিশেষ এক উদ্দেশ্য ছিল। শত্রু এবং মিত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল না হলে অসাবধানতা বশত যুবক দলপতি তাঁকে কোন জটিল পরিস্থিতিতে ফেলে দিতে পারেন। দলপতিও এই কথাগুলিকে নিজের রাজনীতির প্রথম পাঠ মনে করে শুনলেন এবং বুঝলেন। নগরকেচ (আনন্দ-ভবন) নামক আকবরের মৃগয়া গৃহটি আগ্রা থেকে আট-দশ মাইল দূরবর্তী ককরালি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। বাদশাহের শিকারের সুবিধার জন্য মৃগয়া গৃহটির চারধারে বিশেষভাবে সুরক্ষিত বন ছিল।

শিকারে বহরামেরই মত সৌখিন আকবর শাসনকার্যে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এদিকে চলে আসতেন। তাঁর মনোরঞ্জনের জন্য সব মুখ্য নগরগুলির আশেপাশে জঙ্গল রেখে দেওয়া হয়েছিল। ফতেহপুরী নামক নতুন রাজধানীটি নির্মিত হওয়ার আগেই তাঁর সবচেয়ে প্রিয় বিশ্রামক্ষেত্র নগরকেচ (আনন্দভবন) ছিল। দূর দূরান্তর থেকে নানা প্রকারের জন্তু জানোয়ার এনে এর চারদিকের জঙ্গলে পোষা হয়েছিল এবং এই পশুগুলি যাতে নির্বিবাদে বাস করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিশনরায় নামক এক বৃদ্ধ ছিল এই বনের রক্ষক। শিকার বিভাগের আবাল্য কর্মচারী এই কিশনরায় একবার লাহোরে বাদশাহকে আক্রমণকারী একটি ব্যাঘ্রকে হত্যা করে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিল। সেই কারণেই সে বাদশাহের প্রিয়পাত্র হয়ে পড়েছিল। তাকে তাঁর নিজস্ব শিকারী দলে নিযুক্ত করা হয়েছিল। সেই সময় থেকে সে নগরকেচ আনন্দভবনের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলের সংরক্ষক হিসাবে সেখানেই থাকত।

শুধুমাত্র বনগৃহ হওয়া সত্ত্বেও নগরকেচ আনন্দভবন আকবরের রাজসিক বিলাসিতার অনুকূলই ছিল। সুউচ্চ মিনার বিশিষ্ট এর প্রবেশপথ দুটি পার হয়েই ছিল একটি বৃহৎ অঙ্গন। আর একদিকে রাজকর্মচারীদের অশ্বগুলি ও অনুচরবৃন্দ দণ্ডায়মান থাকত আর অপর দিকে থাকত বাদশাহের দেহরক্ষী সেনাদল এবং এই দিকে স্বর্ণসাজে সজ্জিত হস্তী অশ্ব প্রভৃতিকে দাঁড় করানো হতো। অঙ্গনের শেষ প্রান্তে ছিল শ্বেত প্রস্তর নির্মিত একটি বিরাট দালান। উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, ওমরাহ্ রাজন্যবর্গের সঙ্গী ও সেনানায়করা ঐখানে প্রতীক্ষায় থাকতেন। এর পরই বিচিত্র শিল্পকলায় অলঙ্কৃত, সুন্দর স্তম্ভ বিশিষ্ট রক্ত প্রস্তর নির্মিত একটি বিশাল কক্ষ ছিল। এটি ছিল বড় বড় রাজামহারাজাদের প্রতীক্ষালয়। রাজা পৃথ্বী সিংহ ও দলপতি সিংহ চত্বরে অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে দালানে প্রবেশ করলেন। তাঁদের দেখে নাসির খাঁ দ্রুতবেগে এসে বললেন, 'রাজা পীথল, মহামান্য বাদশাহ আজ দু-তিন বার আপনাকে স্মরণ করেছেন। তাঁর আদেশ রয়েছে, আসামাত্রই আপনি দেওয়ানখানায় হাজির হবেন।'

পীথল বললেন, 'মহামান্য বাদশাহ কোথায় আছেন? তাঁর কাছে আর কে আছেন?'

নাসির খাঁ বললেন, 'নদীতীরবর্তী প্রস্তর মণ্ডপে রয়েছেন তিনি। রাজা বীরবল এবং খানখানা তাঁর সঙ্গে আছেন।'

দলপতিকে ঐখানেই অপেক্ষা করতে বলে রাজা পীথল ভেতরে চলে গেলেন। দলপতি বসার উপযুক্ত জায়গা খুঁজছেন এমন সময় পাশে দণ্ডায়মান একটি তুর্কী যোদ্ধা বলে উঠল, 'বাঃ রে বাঃ! এই কাফের কুত্তার অহঙ্কারের বহরটা একবার দেখো! মুসলমানদের পদলেহনের যোগ্যতাও যার নেই, তবু তার বড়াই দেখো!' এই অসভ্য প্রলাপ শুনে দলপতির সারাদেহে যেন আগুন জ্বলে উঠল। তরবারির উপর হাত রেখে প্রভুর নিন্দাকারীর দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ক্রুদ্ধকণ্ঠে বললেন, 'কী বললে?' প্রতিপক্ষও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে তরবারি খাপমুক্ত করে গর্জে উঠল, 'কী! শুনবে, কী বললাম!' ভীমকায় সেই মুস্লিম যোদ্ধার সামনে দলপতিও সিংহসদৃশ দৃঢ়তায় দণ্ডায়মান হলেন। যুদ্ধ শুরু হওয়ার মুখেই নাসির খাঁর কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হলো, 'দুনিয়ার বাদশাহের মহলে ঢুকে যুদ্ধ করার দুঃসাহস কার হয়েছে?'

রাজার শ্বশুর সমীপবর্তী হয়ে প্রশ্ন করলেন, 'বিবাদের কারণটা কী, কাশিম বেগ? রাজ প্রাসাদে এতদিন এসেও এখানকার ধরন ধারণ কিছুই বুঝতে পারনি? তলোয়ারটা কোষবদ্ধ কর।' তারপর তিনি দলপতি সিংহের দিকে ঘুরে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে? কার সঙ্গে এসেছ? বাদশহের মহলে স্থানকাল বিবেচনা না করে লড়াই শুরু করতে গেলে কেন?'

প্রশ্নকর্তা পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও দলপতি সিংহ ঘটনার সত্য বিবরণ দিলেন। নাসির খাঁর মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা। তিনি বললেন, 'তুমি নিজেকে পৃথ্বী সিংহের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বলছ। সুতরাং তোমাকে নিবৃত্ত করার অধিকার আমার নেই। তবুও একথা আমাকে বলতেই হবে যে রাজপুরীর আদব কায়দা এখনও তোমার শেখা হয়নি।' এই কথা বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন।

পথে আসতে আসতেই প্রভুর দেওয়া পরামর্শ এত অল্প সময়ে ভুলে যাওয়ায় দলপতি সিংহ অনুতপ্ত হলেন। মীমাংসাকারী ব্যক্তি সমস্ত কথা শুনেও কেন যে তাঁকে এত কড়া কথা শুনিয়ে গেলেন তাও তাঁর ঠিক বোধগম্য হলো না। এইভাবে তিনি যখন কিছুটা নিরুৎসাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন, সেই সময় একজন তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

সে বলল, 'আমি সব দেখছিলাম। নাসির খাঁ রাজা পীথলের শত্রু। এই জন্য তাঁর দেহরক্ষী কাশিম বেগ এই ধরনের অশিষ্ট কথা বলতে সাহসী হয়েছে। নাসির খাঁ তাকে তিরস্কার পর্যন্ত করলেন না।'

এই কথা শুনে দলপতি সিংহ বুঝতে পারলেন যে উক্ত ব্যক্তিটিই রাজা পীথলের শত্রু নাসির খাঁ। তিনি মনে মনে ভাবলেন, ঠিক আছে, নাসির খাঁকে তো দেখে নিলাম; কাশিম বেগের ব্যবহারের প্রতিকার পরে হবে। এর মধ্যে সদ্য পরিচিত লোকটি বলেই চলেছে, 'এই ধরনের সংঘর্ষ এড়াবার জন্য আমরা আমাদের মালিকদের মতই নিজ নিজ পক্ষভুক্ত লোকেদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকি। এই সারিতে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা সব মানসিংহ, বীরবল, আবুলফজল প্রমুখের পক্ষভুক্ত। আপনি রাজা পীথলের সঙ্গে এসেছেন, সুতরাং আপনি আমার সঙ্গে আসুন!' দলপতি সিংহ এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। তবু সাথীটির নাম, পদ ইত্যাদি জানার জন্য তিনি নম্রতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন।

'আমার নাম মহাবত রায়। রাজা বীরবলের সঙ্গে এসেছি, ওঁর দেওয়ান। আপনার নাম কী?'

'আমার নাম দলপতি সিংহ। রাজা পীথলের সেনাদলে একটি বিভাগের আজই উপনায় নিযুক্ত হয়েছি।'

মহাবত রায়ের সঙ্গে তিনিও গিয়ে অপরদিকে দাঁড়ালেন ঐ দলের সকলেই ছিল হিন্দু। কথাবার্তায় কত সময় অতিক্রান্ত হলো বোঝা গেল না। পাঁচটার সময় রাজপুরী থেকে লোকেরা বাইরে আসতে লাগল। নাসির খাঁ এবং পীথলকে পাশাপাশি হাতে হাত রেখে বন্ধু-ভাবে আসতে দেখে দলপতি সিংহ আশ্চর্যান্বিত হলেন। তিনি

ভাবতে লাগলেন, রাজসেবার পাঠ অনেক কিছুই শিখতে হবে, দু'এক দিনে হবে না। খাঁ-সাহেব এবং রাজা হাস্যমুখে বহির্গত হলেও রাজার প্রসন্নতা সুপ্রত্যক্ষ এবং খাঁ-এর মৃদু হাসির আড়ালে লুকিয়ে ছিল বিষাদ এবং বিদ্বেষভাব। তার কারণও শীঘ্রই বোঝা গেল। রাজার পিছনে দুটি স্বর্ণ থালাতে জরীর-বস্ত্র ও আভরণ নিয়ে আসছিল চোবদার। সকলেই অনুমানে বুঝলো যে বাদঁশাহ রাজা পীথলকে কোন উচ্চতর পদ দিয়েছেন এবং এগুলি তারই প্রতীক-পুরস্কার।

সকলকে শুনিয়ে নাসির খাঁ বললেন, 'মহারাজ, আপনি খুবই ভাগ্যবান। কামনা করি, বাদশাহ সর্বদা আপনাকে যেন এই রকম প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখেন।' এর উত্তরে রাজা পীথল বললেন, 'হে বন্ধু! আপনার এই শুভেচ্ছাকে আমি আশীর্বাদ বলে মনে করি।' ততক্ষণে আরও অনেকে এসে তাঁকে সম্বর্ধিত করল। পীথল দলপতি সিংহের সঙ্গে নিজের ভবনের দিকে যাত্রা করলেন।

এতক্ষণ আমরা ছিলাম রাজপুরী এবং সামন্ত ও উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিবর্গের প্রাসাদে অভিজাত শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে। এবার গরীবের কুটীরটাও একটু ঘুরে আসা যাক। আগ্রাকে যদি রাজপুরুষ, ধনিক এবং অভিজাতদের সুখের স্বর্গ ধরা হয় তবে গরীবদুঃখীদের কাছে সে ছিল সাক্ষাৎ নরক। রাজপথ ছাড়া বাকী সব রাস্তাই ছিল নোংরা, ঘিঞ্জি এবং দুর্গন্ধপূর্ণ। সেগুলিকে পথ না বলে গলি বলাই ভাল। ঐসব গলির দুপাশে বাড়িগুলি এমনই ঘেঁষা-ঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকত যে হাওয়া বাতাস আসতে পারত না। সংক্রামক রোগের আড্ডা হয়ে গিয়েছিল নগরটি। প্রধান পথে সশস্ত্র সৈনিক এবং মালিকগোষ্ঠীর অনুচরদের আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তির শিকার হওয়ার ভয় সব সময়ই ছিল। সেইজন্য জনসাধারণ আর ধনী ব্যবসায়ী প্রভৃতি এইসব গলিতে ছোট এবং বড় বাড়ি তৈরী করে বাস করত। নগরের সর্বত্র ভিক্ষুকেরা ঘুরে বেড়াত। তাদের মধ্যে শত শত জনকে বাদশাহের কর্মচারীরা গুপ্তচর হিসাবে নিযুক্ত করে রেখেছিল। সেইজন্য শহরের পথে-ঘাটে খোলাখুলি

কথা বলতে সকলে ভয় পেত। নগরের কোতয়াল পুলিশের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতেন। মহল্লার চৌধুরীরা চোর প্রভৃতিকে দমন করার জন্য সদা তৎপর ছিলেন কিন্তু এদের মধ্যে এমন শক্তি ছিল না যে ধূর্ত প্রভুদের অনুচরবৃন্দের দুষ্প্রবৃত্তিগুলিকে সংযত করতে পারে। সংক্ষেপে এ কথা বলতেই হবে যে দরিদ্রের অবস্থা ছিল বড়ই ক্লেশকর।

যে কোন কষ্টকে সহ্য করার ক্ষমতা মানব প্রকৃতিতে রয়েছে। বেশি কষ্টকে রোধ করার এবং কম কষ্টকে এড়িয়ে যাওয়ার স্বাভাবিক বুদ্ধি মানুষের মধ্যে আছে। এইজন্য গরীব লোকেরা কোন শক্তিবানের ছত্রচ্ছায়ায় আশ্রিত হয়ে জীবন কাটাত। ধনী ব্যবসায়ীদের পক্ষে রাজদরবারে এবং মন্ত্রীদের কাছে পৌঁছানো সহজ থাকায় মহল্লার ভিতরে প্রবেশ করে উপদ্রব করার সাহস কারো হতো না।

নগরীর অবস্থা এই ধরনের হওয়ায় হিন্দু রমণীরা মহল্লার বাইরে যেতেন না। তা সত্ত্বেও অমাবস্যা ও পূর্ণিমা প্রভৃতি বিশেষ তিথিতে সকলে যমুনায় স্নান করে নদীর অপর পারে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে দেব দর্শনে যেত। এইসব ক্ষেত্রে স্নানঘাটে বিশেষ ব্যবস্থা করার জন্য বাদশাহ কোতয়ালকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন।

নদীর ওপারে মন্দিরের কাছে, বাদশাহ বাবরের স্মারক হিসাবে রচিত চারবাগ নামক একটি উদ্যান ছিল। আজকাল এর নাম হয়েছে রামবাগ। পর্বের সময় ঐখানে হিন্দুরা আবালবৃদ্ধ সমবেত হতো মেলার ক্ষেত্রে। বাদশাহের আদেশে ঐ সময় সৈনিকদের এবং মুসলমানদের ঐ স্থানে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। সেইজন্য হিন্দু মহিলারা সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করতে পারতেন।

উপবনের বাইরে, কাছেই ছিল একটা ছোট কুটীর। বাইরে থেকে দেখলে সেটিকে জনহীন বলে মনে হতো। কিন্তু সেটা ঠিক নয়। ঐ কুটীরের মধ্যে দড়ির খাটিয়ায় শুয়ে একটি লোক তার অন্তিম শ্বাস গুনছিল। দীর্ঘদিন রোগভোগের ফলে সে অস্থি-চর্ম-সার হয়ে পড়েছিল। বয়স পঞ্চাশ বছরের উপর না হলেও সেবাশুশ্রূষার অভাবে তার এই অবস্থা হয়েছিল।

লোকটি ব্যাকুলভাবে আপনমনে বলছিল, 'আমার মা পদ্মিনী, তুমি এখনও এলে না। কতক্ষণ আমি এভাবে পড়ে থাকব। হে ঈশ্বর, আজ এই দুগ্ধপোষ্য শিশুরা ছাড়া আমার আর কে আছে? এ জীবনে আমার লাভ কী?…' মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আবার সে কাৎরে ওঠে, 'কোন প্রকারে মরে গেলে…!' কিন্তু মুখ থেকে এই কথা বহির্গত হওয়া মাত্র তার শরীরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো এবং সে ঈশ্বরকে স্মরণ করে বলতে লাগল, 'ভগবান! ভূতেশ্বর! আমাকে ক্ষমা করো। নিজের কর্তব্য অপূর্ণ রেখে মৃত্যুবরণ ভীরুদের কাজ। যদি আমি এই মুহূর্তে মরি তা হলে আমার সন্তানেরা কী করবে? আমার দুঃখের প্রতিকার কে করবে? না, আমি ভাল হয়ে উঠবো। হে ঈশ্বর, হে ভূতনাথ, আমার সহায় হোন…!'

প্রলাপ বকে যে লোকটি পড়ে রয়েছে, এ কে? এই কুটীরে এ ব্যক্তি এলো কি করে? লোকটির জীবন কাহিনী এইরূপ: লাহোর থেকে আগ্রার যে রাজপথ, তার থেকে অল্প দূরে বানূর নামে একটি গ্রাম আছে। যারা নিজেদের চন্দ্রবংশোদ্ভূত বলে সৌভাগ্যের গর্ব করে ঐ গ্রামটি সেই ভাটীদের বাসস্থান ছিল। গজরাজ নামক এক ধনী ব্যক্তি তার সুন্দরী পত্নী এবং দুটি কন্যাসহ এই গ্রামে বাস করত। একদিন এই প্রভাবশালী ও সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়িতে তিনচারজন অনুচরসহ এক মুসলমান সর্দারের আগমন ঘটলো। সে বললো যে লাহোর থেকে আগ্রা আসার পথে দস্যুরা তার সবকিছু লুণ্ঠন করেছে। অনুচরদের মধ্যেও অনেকে প্রাণ হারিয়েছে। একরাত্রি থাকার সুবিধা তার চাই। গজরাজ তার ক্ষমতা অনুসারে সমস্ত রকম ব্যবস্থা করে দিল। অনুচরসহ মুসলমান সর্দারটি খুব আরামেই সেখানে রাত্রিযাপন করলো। পরদিন বিদায় দেবার জন্য গজরাজ যখন সর্দারের কাছে গেল তখন যে দৃশ্য তার চোখে পড়লো তাতে তার হৃদয় বিদীর্ণ হলো। মুসলমানের অনুচররা ক্রন্দমানা ধনিক পত্নীকে এক অশ্বপৃষ্ঠে বেঁধে নিয়েছিল এবং ক্ষমতামত্ত প্রভুর সঙ্গে তারা তার চোখের উপর দিয়েই রাস্তায় গিয়ে উঠল। গজরাজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ সেখানে

দাঁড়িয়ে রইল। পরে সে তার বন্ধু সরহিন্দের সুবেদারের কাছে অভিযোগ দায়ের করল। তার পত্নীকে রক্ষা করার জন্য সুবেদার অবিলম্বে তাঁর সৈন্যদের পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সৈনিকেরা ফিরে আসার পর অন্য মূর্তিতে তিনি দেখা দিলেন। তিনি বললেন, 'আপনি একজন সম্মানিত আমীরের অপমান করে খুব বড় অপরাধ করেছেন। নেহাৎ বন্ধু বলে আজ আপনাকে ছেড়ে দিলাম।' এই কথায় গজরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে সুবেদারকে কতকগুলি কড়া কথা শোনালো। পরিণামে তাকে তিন মাসের জন্য কারারুদ্ধ থাকতে হলো। কারাবাস গজরাজের শারীরিক সক্ষমতাকে নষ্ট করে দিলেও পত্নীর অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার আকাঙ্খায় তার হৃদয় জ্বলতে থাকলো।' কারামুক্ত হয়ে এসে সে দেখল যে রাজদ্রোহের অপরাধে তার সমস্ত জমি জায়গা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এবং তার সন্তানেরা কোন এক আত্মীয়ের আশ্রয়ে রয়েছে। সর্বনাশের পরও সে কিন্তু নিরাশ হলো না। যে ব্যক্তি তার এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে তার প্রতিশোধ না নেওয়া পর্যন্ত তার ক্ষান্তি নেই, এই প্রতিজ্ঞাই সে করেছিল। এরপর সে তার সন্তানদের নিয়ে আগ্রার পথে পা বাড়াল। পদ্মিনী আর সুলোচনা নামে তার দুই কন্যা ছিল। তাদের বয়স যথাক্রমে তের বছর এবং দশ বছর। ধর্মশালায় খেয়ে সাধামত কাজ করতে করতে সে মেয়ে দুটিকে নিয়ে মথুরায় পৌঁছাল। পথেরশ্রমে ক্লান্ত গজরাজ প্রায় এক মাস সেখানেই রয়ে গেল। পরে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে আগ্রার উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ায় অতিকষ্টে আগ্রায় এসে উপস্থিত হলো। রাজধানীর বিশাল অট্টালিকা ও নদীতীরবর্তী সুবিশাল প্রাসাদগুলির দিকে তাকিয়ে তার ব্যাকুলতা আরও বেড়ে গেল। সম্ভবত শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ার ফলেই সে পূর্বোক্ত চারবাগ নামক উপবনের কাছে মূর্ছিত হয়ে পড়ল। অজ্ঞাত কোন হৃদয়বান পথিক তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এই কুটীরে শুইয়ে দিয়েছে।

প্রায় একমাস ঐ হতভাগা মানুষটি এই কুটীরে পড়েছিল। যমুনায় স্নানার্থীদের কাছ থেকে ভিক্ষা করে এনে পদ্মিনী ও সুলোচনা

নিজেদের এবং পিতার ক্ষুণ্ণিবৃত্তি করত আর পিতার সেবা করত। ময়লা শতছিন্ন বসন পরিহিতা হলেও যৌবনের স্পর্শ-পাওয়া পদ্মিনীর সৌন্দর্য এবং তুই বোনের মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত কৌলিন্যের শ্রীর প্রভাবে লোকদের হৃদয় সহজেই দয়ালু হয়ে উঠতো। এই জন্য বেশির ভাগ লোক তাদের সাধ্যমত ভিক্ষা দিত। পদ্মিনী ধীরে ধীরে বুঝতে পারল যে তার হাসিতে মাধুর্য রয়েছে এবং দিন দিন প্রস্ফুটিত তার অঙ্গ-লাবণ্যে মানুষকে আকৃষ্ট করার শক্তি বাড়ছে। ছোট্ট সুলোচনা দিদির পিছু পিছু থাকে। সে কখনও ভিক্ষা চাইতো না আর কারও সঙ্গে ঠাট্টা রসিকতাও করত না। এক অমাবস্যার দিন দেবতার আরাধনা হতে প্রত্যাগত লোকেদের প্রতীক্ষায় তুই বোন চারবাগের পথের ধারে দাঁড়িয়েছিল। সেদিন রাজধানী থেকে অনেক লোক এসেছিল বলে এক সপ্তাহ চলে যাওয়ার মত ভিক্ষা লাভের আশা ছিল। সেই সময় সুলোচনা দেখলো তার দিদি পদ্মিনী একটি সুন্দর যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। যুবকটি ঐ স্থানে মাঝে মাঝে আসত এবং এলে পদ্মিনীর হাতে কমপক্ষে একটি টাকা অবশ্যই দিত। সেইজন্য এর মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য সুলোচনার কাছে ধরা পড়ল না। ইতিমধ্যে জপমালা হাতে এক বৃদ্ধাকে আসতে দেখে সুলোচনা তার কাছে গিয়ে চাইতে আরম্ভ করল, 'মা কিছু ভিক্ষা দিন, তুদিন খাইনি।' তার স্বরমাধুর্য এবং দীনতা বৃদ্ধার মনকে দ্রবীভূত করে দিল। সে রুপোর একটি মুদ্রা তার হাতে দিয়ে বেশ ভালভাবে তাকে দেখল এবং 'বাছা, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন' বলে অন্তর থেকে আশীর্বাদ করলো। পদ্মিনী যেখানে যুবকটির সঙ্গে কথা বলছিল, নিজের উপার্জন দিদিকে দেখানোর উৎসাহে সুলোচনা সেখানে দৌড়ে গিয়ে দেখল, সে ওখানে নেই। চারদিকে সে ভাল করে চেয়ে দেখল কিন্তু কোন দিকে পদ্মিনীর কোন চিহ্নই দেখা গেল না। তখন সে 'ওহো! আমার দিদিকে কেউ নিয়ে গেছে।' বলে চিৎকার করে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে সেখানে বহু লোক জমে গেল। প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়েই সে যখন এক নাগাড়ে কাঁদছিল তখন এক বৃদ্ধ অগ্রসর হয়ে তার মাথায় হাত দিয়ে আদর

করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে বলত মা? তুমি বললে তবে আমরা কিছু করতে পারব।' কিছুটা শান্ত হওয়ার পর সুলোচনা তার পিতার অসুস্থতার এবং ভগ্নীর নিরুদ্দেশ হওয়ার কাহিনী বৃদ্ধকে বলল। তার ভাষা, কথা বলার কায়দা এবং বিনয় প্রভৃতি দেখে বৃদ্ধের মনে হলো যে এ কোন ছোট বংশের মেয়ে নয়। সে বলল, 'মা, চল আমি তোমার সঙ্গে তোমার বাবার কাছে যাব। তুমি কেঁদো না। তোমার বাবা ভাল হয়ে যাবেন।'

বৃদ্ধ তাকে সঙ্গে নিয়ে কুটীরের দিকে অগ্রসর হলো। তার সঙ্গে একজন ভৃত্য ও পনের বছর বয়সের একটি কন্যাও ছিল। উর্ধমুখী গুম্ফ এবং গলায় তলোয়ারের আঘাতের চিহ্ন থেকে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল যে বৃদ্ধ একজন অবসরপ্রাপ্ত যোদ্ধা। দেব-আরাধনার উপযুক্ত পোশাক পরিধানে থাকায় তার পদ প্রভৃতির অনুমান করা সম্ভব ছিল না। তবুও দর্শকরা এই অনুমানই করল যে সে একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। ফলে অন্যেরা যে যার পথে চলে গেল। কন্যা, সেবক ও সুলোচনাকে সঙ্গে নিয়ে লোকটি কুটীরে উপস্থিত হলো। সুলোচনার ক্রন্দন বেগ কিছুটা কমেছিল। তারপর সে চুপচাপ পা-টিপে টিপে ঘরে ঢুকল। বৃদ্ধ ব্যক্তিটি এবং তার কন্যাও তাকে অনুসরণ করল।

কাছেই পদশব্দ শুনে রোগী বলে উঠলো, 'মা পদ্মিনী, এসেছিস্? আমার বড্ড তেষ্টা পেয়েছে রে, কিছু এনে দে। এ কথা শোনামাত্র সুলোচনার অশ্রুর বাঁধ ভেঙ্গে পড়ল। পিতা ব্যাকুলতার সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে? পদ্মিনী কোথায়? তার কী হয়েছে?'

সুলোচনা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে বলল, 'ও বাবা গো, দিদিকে কেউ নিয়ে গেছে!'

এ কথা শুনে মর্মান্তিক পীড়ায় গজরাজ চিৎকার করে উঠলো, 'হে বিশ্বনাথ! এ-ও আমাকে দেখতে হলো? এ প্রাণ আর কিসের জন্য?' দুঃখে আবেগে সে উঠে বসার চেষ্টা করতে গিয়ে শক্তিহীনতার দরুণ তৎক্ষণাৎ খাটের উপরেই পড়ে গেল।

সুলোচনার সঙ্গে যে লোকটি এসেছিল সে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাছে

গিয়ে তার বুক এবং নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল। দেখা গেল রোগী মূর্ছিত হয়েছে মাত্র। তখন জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্য জলের ঝাপটা এবং বাতাস দেওয়া হল। চাকরকে ডেকে লোকটি কিছু দুধ এবং ফল আনার আদেশ দিল। পিতার মূর্ছা যাওয়ার ফলে ব্যাকুল সুলোচনাকে পিতা পুত্রী সান্ত্বনার কথা বলে তাকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করল।

মূর্ছা ভঙ্গের পর পাশে উপবিষ্ট বৃদ্ধকে এবং সুলোচনাকে প্রবোধ দান রত তার কন্যাকে দেখে গজরাজ বিস্ময়ান্বিত হলো। তার অসংখ্য প্রশ্নের উত্তরে বৃদ্ধ কেবল, 'একটু দুধ খেয়ে নাও। দু চারটে আঙুর খাও। একটু ভাল হয়ে উঠলেই সব কথা বলব।' এই কটি কথা বলল। গজরাজ কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে রইল এবং আগন্তুকের অনুরোধে একটু দুধ এবং কয়েক টুকরো ফল খেল। তারপর ঈশ্বর প্রেরিত সাহায্যকারী ঐ বৃদ্ধকে বলল, 'সবকিছু বলার মত শক্তি এখন আমার নেই। তবুও এই দারুণ দুর্বিপাকে সাহায্য করার জন্য আপনি যখন এসেছেন তখন সেটা ঈশ্বরেরই কৃপা বলতে হবে। আপনার এই সাহায্যের কথা আমি জীবনে ভুলব না।'

গজরাজের কথায় বৃদ্ধ বুঝতে পারলো যে, সে যা অনুমান করেছে তা মিথ্যা নয়। ভিখারী বা নিম্নশ্রেণীর মানুষ এ নয়। সব কথা জানার ঔৎসুক্য থাকা সত্ত্বেও ধৈর্যধারণ করাই সঙ্গত বলে সে মনে করল। গজরাজ যখন আবার বলতে আরম্ভ করল, তখন তাকে থামিয়ে দিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'তুমি এখন অসুস্থ। এ সময় বেশি পরিশ্রম ভাল নয়। আগে ভাল হয়ে নাও, তখন সব শুনব।'

'এখন আমি আর কি করে ভাল হবো?' নিরাশার সুরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে গজরাজ বলল, 'এখন যা হলো তা হচ্ছে ক্ষতে কাঁটা বিদ্ধ হওয়ার সমান। এ-ও কি ঈশ্বরেরই ইচ্ছা? যদি মরি তবেই ভাল; সব কষ্টের শেষ হয়ে যাবে।' বৃদ্ধ বলল, 'ও কথা বলো না। মানুষের জীবনে বিপদ বারবার এসে থাকে। সব বিপত্তিকে অতিক্রম করে নিজের উদ্দেশ্য সাধনই মানুষের ধর্ম।' গজরাজ বলল, 'সত্যি কথা। আমার মরলে চলবে না। যে নিদারুণ অত্যাচার আমার উপর হয়েছে তার

প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আমায় বেঁচে থাকতে হবে।' রোগীর ক্রোধ এবং অন্তর্জ্বালাকে উপলব্ধি করে বৃদ্ধ বলল, 'আমার কথা শোন। তুমি তোমার মেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে চল। কোন কষ্ট হবে না। তোমাকে পালকিতে নিয়ে যাবো। সুস্থ হওয়ার পর যা ভাল বুঝবে তাই করবে।'

তার মেয়েটিও বলল, 'বাবা, এঁদের আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলো। এতটুকু ছোট্ট মেয়ে একলা এখানে কি করে থাকবে?'

গজরাজ উত্তর দিল, 'আমি রোগে পড়ে আছি এবং এ হলো ছোট একটি শিশু। আমাদের নিয়ে গেলে, আপনাদের কষ্ট বাড়বে।'

আগন্তুক বলল, 'ওসব কথা তুমি ভেবো না। আমি শহর থেকে প্রায় সাত মাইল দূরে থাকি। বাদশাহের মৃগয়া ক্ষেত্রের আমি রক্ষক! আমার নাম কিশনরায়। বাদশাহের অসীম কৃপায় আমার ওখানে কোন কষ্টই হবে না। আর জায়গাটাও স্বাস্থ্যকর।'

গজরাজের মনে হলো বক্তা যেন দেবদূত। তা না হলে এমন অবস্থায় এই ধরনের সাহায্য কিভাবে আসে। মহা বিপদের মধ্য দিয়েই হয় সৌভাগ্যের উদয়। সবচেয়ে কষ্টকর মৃত্যু থেকে নিজেকে এবং ভীষণ বিপদ থেকে নিজ কন্যাকে উদ্ধার করলেন যে পরমেশ্বর, মনে মনে সে তাঁকে প্রণাম জানালো। মুখের ভাবে সম্মতি আছে বুঝে নিয়ে কিশানরায় শহর থেকে পালকি আনতে ভৃত্যকে আদেশ দিল।

আগেই জানানো হয়েছে যে রাজা পীথল আকবরের কাছ থেকে আনন্দিত মনে ফিরেছিলেন। তাঁর মনসবদারী এক হাজার থেকে বর্দ্ধিত করে দু হাজার করা হয়েছিল। তাঁকে সাম্রাজ্যের প্রধান ওমরাহদের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। একথা যখন তিনি স্বয়ং বাদশাহের মুখ থেকে শুনলেন তখন তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী ভারত সম্রাটের স্নেহের পাত্র হয়ে কার না গর্ব এবং আনন্দ হয়? তার উপর আবার মহান আকবরের বিশেষ স্নেহ ভাজন হওয়া কি কম গৌরবের কথা! কিন্তু রাজা পীথলের আনন্দের কারণ শুধু এইটুকুই ছিল না। তিনি জানতেন যে বাদশাহের

নিকটতম গোষ্ঠীর মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধবাদী একটি চক্র ছিল যাদের নায়ক নাসির খাঁ। ঐ চক্রটি নানা ধরনের ফন্দিফিকির এবং ষড়-যন্ত্রের মাধ্যমে পীথলের প্রতি বাদশাহের স্নেহকে মুছে দেবার চেষ্টা করত। তাঁর বন্ধু মান সিংহ বাংলায় সুবেদার নিযুক্ত হওয়ায় দূরে চলে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, একথাও শোনা যাচ্ছিল যে বাদশাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট নন। শাহজাদা দানিয়ালের প্রতি বাদশাহের বিশেষ বাৎসল্যকেও শাহজাদা সেলিম এবং মহারাজা মান সিংহের প্রতি তাঁর বিরূপতার লক্ষণ বলে মনে করা হচ্ছিল। লোকে সন্দেহ করেছিল যে রাজা পীথলও ঐ বিরূপতার ভাগী হয়েছেন। এদিকে কয়েকটি দরবারে পীথলকে ডাকাও হলো না। পীথলের বাক্-বৈদগ্ধ যে সভায় অনুপস্থিত সে-সভা সভাই নয়—এ কথা যে বাদশাহ বলতেন তিনি নিজেই যখন কয়েকটি দরবারে তাঁকে ডাকলেন না তখন জনসাধারণ ধরে নিল যে এর একমাত্র কারণ হচ্ছে বাদশাহের অসন্তোষ। এই নতুন পদ এবং সম্মান থেকে প্রমাণিত হলো যে ঐ সমস্ত আশঙ্কাগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং রাজা পীথল আগের মত বাদশাহের অনন্য মিত্রই আছেন। এ ছাড়াও তখন সাধারণ অমরাহদের আগেকার মত বড় বড় মনসবদারী দেওয়ার প্রথা ছিল না। পাঁচ হাজারী মনসবদারী কেবল শাহাজাদাদেরই দেওয়া হত। বড় বড় রাজা মহা-রাজাদের তিন-হাজারী এবং প্রধান প্রধান মন্ত্রীদের আর ওমরাহদের দেওয়া হত দু-হাজারী মনসবদারী। এই রকম পরিস্থিতিতে বিনা কারণে এমন একটি বৃহৎ ও আকস্মিক সম্মান লাভ করে স্বয়ং পীথল পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত না হয়ে পারেন নি। তিনি ধরে নিলেন যে এ হচ্ছে কোন বড় দায়িত্ব অর্পণের অথবা উচ্চতর পদে নিযুক্ত করার ভূমিকা মাত্র। যা-ই হোক, তিনি মনে মনে মেনে নিলেন যে দলপতির আগমন শুভ লক্ষণের সূচক এবং তার ফল স্বরূপ তিনি এই সম্মান লাভ করেছেন। ফেরার সময় তাঁর মন বাদশাহের চিন্তা, উদ্দেশ্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে ভাবনায় ব্যস্ত ছিল তাই দলপতির সঙ্গে কোন কথাই তিনি বললেন না। অবশেষে আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন

বিষয়ে মাথা ঘামানো বৃথা ভেবে তিনি নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সঙ্কেতে দলপতিকে কাছে ডেকে বললেন, 'হে বন্ধু! মনে হচ্ছে যে তুমি আসায় আমার সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। খুশী হয়ে বাদশাহ আজ আমার মনসবদারী এবং পদ আশাতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য আমিও তোমাকে উচ্চতর পদ দিতে চাই।'

তার আগমন শুভ ঘটনার সূচক শুনে দলপতি বললেন, 'মহারাজ! ঈশ্বরের করুণা এবং বাদশাহের প্রসন্নতার ফলেই আপনার উন্নতি হয়েছে। এরজন্য আমি অতিমাত্রায় আনন্দিত। কিন্তু আপনার কাছ থেকে বেশি সম্মান পাওয়ার মত যোগ্যতা আমি এখনও দেখাইনি। সেইজন্য আপনি আমাকে যেখানে নিযুক্ত করেছেন সেখানে থেকেই আপনার সেবা করা আমার সঙ্গত হবে।'

পীথল বললেন, 'এই কথা তোমার বিশ্বস্ততার পরিচায়ক। কাজের খোঁজে যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে তখন আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর পদাধিকারী। সে সময় আমি তোমাকে নিজের বাহিনীতে উপনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম। এখন আমি সাম্রাজ্যের প্রধান ওমরাহদের একজন হয়েছি। সেইজন্য তোমার পদ উচ্চতর হওয়ায়ও কোন ভুল থাকবে না। আমার উন্নতিতে আমার আশ্রিতজনেরও উন্নতি হবে—এটাই ঠিক নয় কি? সকালে আমিতো স্থিরও করিনি যে তোমায় কোন পদে নিযুক্ত করা উচিত।'

দলপতি আর কোন বাধা দিলেন না। রাজা পীথল বললেন, 'পরশু শাহাজাদা দানিয়ালের প্রাসাদে একটি উৎসব আছে। আমি নিমন্ত্রিত এবং যাওয়ার জন্য বাদশাহের আদেশও হয়েছে। তুমিও আমার সঙ্গে এসো। শেঠজীও তো বলেছিলেন যে ওঁর সখ্যতা লাভেরও চেষ্টা করা উচিত?'

দলপতি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আগেই উৎসবে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

পীথল বললেন, 'সাধারণভাবে তো অনুচিত। কিন্তু তুমি যখন আমার সঙ্গে যাচ্ছ তখন কোন দোষণীয় নয়। আর যেহেতু তুমি

রামগড়ের রাজকুমার সেইহেতু শাহজাদা প্রথাগত প্রশ্ন মনে আনবেন না। সম্রাটের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারদের দলপাকানোও বেড়ে চলেছে। কোন দলভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই—বরং সবার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলাই ভাল।'

দলপতি বললেন, 'এসব আপনিই ভাল জানেন। আগে থেকে কিছু অনুমান করা যায় কি?'

পীথল বললেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা খুব সাবধানতার সঙ্গে বলা উচিত। রাজার চার চক্ষু থাকে। এই তত্ত্ব বাস্তবে এখানে যত প্রকট অন্যত্র তত নয়। তবুও গোপন কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে রাজপথ। এখানে আমরা দেখতে পারি কাছে কে কে আছে।'

উত্তরাধিকার প্রভৃতির বিষয়ে পীথল কিছুই বললেন না। তিনি বোধ হয় এই ভেবেই মৌন রয়ে গেলেন যে নতুন সেবককে সবকথা বলে দিলে তার অনভিজ্ঞতার দরুণ কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। দলপতিও এ ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখালেন না। পীথলের বাসস্থানে দুজনে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় রাজা তাঁর প্রধান কার্যনির্বাহককে ডেকে বলে দিলেন যে তিনি দলপতিকে নিজ সেনা-বাহিনীর উপনায়ক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বেতন হবে সাড়ে সাত শত মুদ্রা এবং অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজার দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর সঙ্গে থাকবেন। তাঁর পদমর্যাদার উপযোগী পোশাক, অস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্য আলাদা দু হাজার মুদ্রা দেওয়ার আদেশও তিনি দিলেন। এরপর তিনি দলপতি সিংহকে বললেন, 'শহরে নতুন এসেছ, নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য পরশু সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি অবসর পাবে। এখন যেতে পার।' এইভাবে দরজা থেকেই দলপতি সিংহকে বিদায় দিয়ে রাজা পীথল গৃহে প্রবেশ করলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ কর্মচারী এসে জানাল যে শেখ মুবারক তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য গোপনে এসে ভিতরে বসে আছেন। আবুলফজল এবং ফৈজীর পিতা শেখ মুবারক ছিলেন বাদশাহের সম্মানিত গুরুদেব। তিনি বাল্যকালেই পারস্যদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে নিজ মনীষা এবং

বিষয়ে মাথা ঘামানো বৃথা ভেবে তিনি নিজের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করে সঙ্কেতে দলপতিকে কাছে ডেকে বললেন, 'হে বন্ধু! মনে হচ্ছে যে তুমি আসায় আমার সৌভাগ্যের উদয় হয়েছে। খুশী হয়ে বাদশাহ আজ আমার মনসবদারী এবং পদ আশাতিরিক্ত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেইজন্য আমিও তোমাকে উচ্চতর পদ দিতে চাই।'

তার আগমন শুভ ঘটনার সূচক শুনে দলপতি বললেন, 'মহারাজ! ঈশ্বরের করুণা এবং বাদশাহের প্রসন্নতার ফলেই আপনার উন্নতি হয়েছে। এরজন্য আমি অতিমাত্রায় আনন্দিত। কিন্তু আপনার কাছ থেকে বেশি সম্মান পাওয়ার মত যোগ্যতা আমি এখনও দেখাইনি। সেইজন্য আপনি আমাকে যেখানে নিযুক্ত করেছেন সেখানে থেকেই আপনার সেবা করা আমার সঙ্গত হবে।'

পীথল বললেন, 'এই কথা তোমার বিশ্বস্ততার পরিচায়ক। কাজের খোঁজে যখন তুমি আমার কাছে এসেছিলে তখন আমি ছিলাম দ্বিতীয় শ্রেণীর পদাধিকারী। সে সময় আমি তোমাকে নিজের বাহিনীতে উপনায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেছিলাম। এখন আমি সাম্রাজ্যের প্রধান ওমরাহদের একজন হয়েছি। সেইজন্য তোমার পদ উচ্চতর হওয়ায়ও কোন ভুল থাকবে না। আমার উন্নতিতে আমার আশ্রিতজনেরও উন্নতি হবে—এটাই ঠিক নয় কি? সকালে আমিতো স্থিরও করিনি যে তোমায় কোন পদে নিযুক্ত করা উচিত।'

দলপতি আর কোন বাধা দিলেন না। রাজা পীথল বললেন, 'পরশু শাহাজাদা দানিয়ালের প্রাসাদে একটি উৎসব আছে। আমি নিমন্ত্রিত এবং যাওয়ার জন্য বাদশাহের আদেশও হয়েছে। তুমিও আমার সঙ্গে এসো। শেঠজীও তো বলেছিলেন যে ওঁর সখ্যতা লাভেরও চেষ্টা করা উচিত?'

দলপতি বললেন, 'তাঁর সঙ্গে দেখা না করে আগেই উৎসবে যাওয়া কি ঠিক হবে?'

পীথল বললেন, 'সাধারণভাবে তো অনুচিত। কিন্তু তুমি যখন আমার সঙ্গে যাচ্ছ তখন কোন দোষনীয় নয়। আর যেহেতু তুমি

রামগড়ের রাজকুমার সেইহেতু শাহজাদা প্রথাগত প্রশ্ন মনে আনবেন না। সম্রাটের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজকুমারদের দলপাকানোও বেড়ে চলেছে। কোন দলভুক্ত হওয়ার প্রয়োজন নেই—বরং সবার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলাই ভাল।'

দলপতি বললেন, 'এসব আপনিই ভাল জানেন। আগে থেকে কিছু অনুমান করা যায় কি?'

পীথল বললেন, 'এই ধরনের কথাবার্তা খুব সাবধানতার সঙ্গে বলা উচিত। রাজার চার চক্ষু থাকে। এই তত্ত্ব বাস্তবে এখানে যত প্রকট অন্যত্র তত নয়। তবুও গোপন কথা বলার সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান হচ্ছে রাজপথ। এখানে আমরা দেখতে পারি কাছে কে কে আছে।'

উত্তরাধিকার প্রভৃতির বিষয়ে পীথল কিছুই বললেন না। তিনি বোধ হয় এই ভেবেই মৌন রয়ে গেলেন যে নতুন সেবককে সবকথা বলে দিলে তার অনভিজ্ঞতার দরুণ কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। দলপতিও এ ব্যাপারে বিশেষ ঔৎসুক্য দেখালেন না। পীথলের বাসস্থানে দুজনে এসে পৌঁছলেন। সেই সময় রাজা তাঁর প্রধান কার্যনির্বাহককে ডেকে বলে দিলেন যে তিনি দলপতিকে নিজ সেনা-বাহিনীর উপনায়ক নিযুক্ত করেছেন। তাঁর বেতন হবে সাড়ে সাত শত মুদ্রা এবং অন্য ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাজার দেহরক্ষী হিসাবে তাঁর সঙ্গে থাকবেন। তাঁর পদমর্যাদার উপযোগী পোশাক, অস্ত্র এবং অলঙ্কারের জন্য আলাদা দু হাজার মুদ্রা দেওয়ার আদেশও তিনি দিলেন। এরপর তিনি দলপতি সিংহকে বললেন, 'শহরে নতুন এসেছ, নিজের থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। এর জন্য পরশু সন্ধ্যা পর্যন্ত তুমি অবসর পাবে। এখন যেতে পার।' এইভাবে দরজা থেকেই দলপতি সিংহকে বিদায় দিয়ে রাজা পীথল গৃহে প্রবেশ করলেন। ঠিক সেই সময় তাঁর এক ঘনিষ্ঠ কর্মচারী এসে জানাল যে শেখ মুবারক তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য গোপনে এসে ভিতরে বসে আছেন। আবুলফজল এবং ফৈজীর পিতা শেখ মুবারক ছিলেন বাদশাহের সম্মানিত গুরুদেব। তিনি বাল্যকালেই পারস্যদেশ থেকে ভারতবর্ষে এসে নিজ মনীষা এবং

প্রতিভার দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। সুফিদের ইনি ছিলেন একজন প্রধান পুরোহিত। এই সাধনমার্গ অনেকটা বেদান্তের অনুরূপ। অন্য ধর্ম এবং মতের প্রতি সুফিদের বিদ্বেষ অথবা ঘৃণা থাকে না। এই মহাপুরুষের উপদেশ অনুসারেই বাদশাহ খৃষ্টীয়, পারসিক, জৈন, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মাবলম্বীদের আমন্ত্রণ করে রাজসভায় ধর্মচর্চা করাতেন। কিন্তু এ সমস্ত গোঁড়া মুসলমানদের কাছে কতটা অপ্রিয় হতে পারে কল্পনা করা যায়। মুসলমান বাদশাহের রাজসভায় খৃষ্টধর্মাবলম্বীরা যখন ইসলামের ত্রুটি সম্বন্ধে আক্ষেপ করতে সুরু করল তখন মুসলিমদের মধ্যে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলমান ওমরাহ এবং মোল্লাদের এই বিশ্বাসই হয়েছিল যে এই সমস্ত ভ্রষ্টাচারের মূলে রয়েছেন শেখ মুবারক এবং তাঁর কাফের পুত্র। হিন্দু, খৃষ্টান প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় শেখ মুবারকের প্রতি তাদের বিদ্বেষ ছিল বেশি।

মোবারকের মনেও ক্রমশ ইসলামের কদর কমে এলো। তাঁর ধারণা হলো যে মুগল সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং ভারতবাসীকে একসূত্রে বাঁধবার জন্য এমন একটি ধর্মের প্রয়োজন যা সকলের কাছে সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হবে। তাঁর বার্ধক্যের এই নতুন প্রেরণার ফলেই আকবর 'দীন ইলাহি' নামক একটি নবধর্মের প্রচার আরম্ভ করলেন। বহু সদ্‌গুণের আধার ছিলেন আকবর। সম্রাটের যোগ্য সব গুণই তাঁর মধ্যেও ছিল। প্রশংসায় খুশী হওয়ার বড় দোষটি কিন্তু তাঁর মধ্যে ছিল। চাটুকারিতায় বিশ্বাস স্থাপন রাজন্যবর্গের একটি সার্বজনীন এবং বিখ্যাত দোষ। আকবরের মধ্যে এই ত্রুটি তাঁর স্বাভাবিক সীমাকে অতিক্রম করেছিল। শেখ মুবারক বলতেন, 'রাজা হচ্ছেন ঈশ্বরের দূত আর আকবর তো সাক্ষাৎ আল্লাহর অবতার। আকবর ধীরে ধীরে একথা বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলেন। সেইজন্য নিজের প্রতিষ্ঠিত 'দৈবিক-ধর্ম' দীন-ইলাহিতে তিনি সম্রাটকেই ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে মান্য করার বিধান দিয়েছেন।

বহু ধর্মের উত্থান পতনের অভ্যস্ত দর্শক হিন্দু সমাজ এই নতুন ধর্মের মধ্যে বিশেষ কোন গুরুত্বের সন্ধান পায়নি। মুসলমানরা আবার ভাবল

যে ইসলামের শক্তিকে নষ্ট করার জন্য কেউ বাদশাহকে এই পদ্ধতিতে অগ্রসর হতে বলেছে। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী শাহজাদা সেলিম তাদের অনুকূল থাকায় তারা সাহসের সঙ্গে এই নতুন ধর্মকে বিনষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু শাসনকার্যে সদাসতর্ক এবং বিবেকবান আকবরের প্রভাবে তাদের সমস্ত অপচেষ্টা বিফল হলো।

শেখ মুবারকের বয়স এই সময় হয়েছিল পঁচাশির উপর। তথাপি তাঁর শারীরিক ও মানসিক শক্তির কিছুমাত্র হানি হয়নি। দীর্ঘ শ্বেত-শ্মশ্রু, শ্বেত-ভ্রূ-যুগল, আজানুলম্বিত বাহু বিশিষ্ট দেহ এবং ঐ দেহের আবরণ কৃষ্ণবর্ণ লম্বা আলখাল্লা—এইরূপে রূপবান শেখ সাহেবকে দেখে মানুষ মাত্রেই স্বীকার করত যে মানব-মনের উপর স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে শাসন চালাবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার তাঁর আছে।

তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে রাজা পীথল প্রণাম করলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে বাদশাহের বিশেষ কোন প্রয়োজনেই এ সময় তাঁর আগমন ঘটেছে। সেইজন্য তিনি খুব সাবধানতার সঙ্গে চলার কথাও ভেবে নিলেন।

পীথল যখন ঐ প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করলেন তখন শেখ মুবারক চক্ষু মুদ্রিত করে ধ্যানমগ্নের মত বসে ছিলেন। পদশব্দে চকিত হয়ে চক্ষু উম্মিলিত করে পীথলকে দেখে তিনি বললেন, 'আপনি এসে পড়েছেন? এ সময় আমার আগমনের ফলে কোন অসুবিধা হয়নি ত?'

পীথল উত্তর দিলেন, 'আপনার মত মহাপুরুষের দর্শনেই পুণ্যলাভ হয়। সুতরাং আমার অসুবিধা কিভাবে হওয়া সম্ভব? আপনি যখন পদার্পন করেছিলেন, তখন এখানে ছিলাম না। কোন কষ্ট হয়নি ত?'

শেখ বললেন, 'না না!'

পীথল বললেন, 'কিছু খাবার আনাই? কাবুলের সুবেদার কিছু ফল পাঠিয়েছে। কাশ্মীর থেকে এক বিশেষ রকমের আঙুরও এসেছে। আপনি যদি অল্প কিছু নেন তো অনুগৃহীত হই। আপনার তুল্য মহানুভবদের দর্শন সব সময় তো পাওয়া যায় না।'

শেখ বললেন, 'আমাদের মধ্যে এ ধরনের শিষ্টাচারে কী প্রয়োজন?

আপনি জানেন, আমি আপনাকে নিজের পুত্রের মত স্নেহ করি।'

পীথল বললেন, 'অমন কথা বলবেন না। বন্ধুদের মধ্যেও শিষ্টাচারের আদান-প্রদান আবশ্যক হয়। তারপর আপনার মত দেবতুল্য মানুষ যখন পদধূলি দিয়েছেন তখন......'

শেখ বললেন, 'বেশ। আপনার যা ইচ্ছা। অল্প দুধ এবং আঙুর আনতে বলে দিন। বয়সের জন্য আমি খাদ্যের মাত্রা হ্রাস করে দিয়েছি।'

ফল ও দুধ এসে গেল এবং রাজা পীথল বিনয়াবনতভাবে শেখ সাহেবের কাছে বসে পড়লেন। শেখ বলতে লাগলেন, 'আপনি জানেন বোধহয় যে মহামান্য বাদশাহ শীঘ্রই দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করবেন বলে স্থির করেছেন।'

'না—উনি আমাকে কিছু বলেন নি।'

'হ্যাঁ, আজই এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন। কাল আবুলফজলের চিঠি এসেছে। সে বলেছে যে বাদশাহ স্বয়ং এলে শীঘ্রই জয়লাভ হবে। সব কিছুই খুব গোপন রাখা হয়েছে।'

'আবুলফজলের চিঠি এসেছে একথা তো মহামান্য বাদশাহ বলেছিলেন। মহানুভব আবুলফজল কুশলে আছেন তো?'

'আল্লার কৃপায় সব ভাল আছে। অলহমদুলিল্লাহ! বাদশাহের উদ্দেশ্য হচ্ছে রওনা হওয়ার আগে রাজধানীর রক্ষাকার্যে কিছু বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করে যাওয়া।

পীথল আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'এর আগে তো কখনও এমন হয়নি। বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেছে নাকি?' শেখ সাহেব রাজার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললেন, 'বাদশাহ এখন তো আর তরুণ নন। শাহজাদা সেলিম গেছেন আজমীর। আর আপনি ত জানেন যে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পিতা-পুত্রে কিছুটা মনোমালিন্যও রয়েছে।'

'কিছু কিছু শুনেছি। কিন্তু সঠিক কিছুই জানি না।'

'বাদশাহের প্রতি বাৎসল্যের আধিক্য থাকায় নিজ অধিকার হানির ভয়ে সেলিম ভীত হয়ে পড়েছে। সেই জন্য বাদশাহের কাছে সে প্রার্থনা জানিয়েছিল যে অবিলম্বে তাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা

হোক। অন্তঃপুরে এবং ধর্মান্ধ মুসলমান ওমরাহদের মধ্যে সেলিমের যে বেশ প্রভাব রয়েছে একথা তো আপনি জানেন। বাদশাহ কিছু স্থির করেননি। কিন্তু মান সিংহকে পাঠিয়েছেন বাংলায় এবং সেলিমকে আজমীরে। এখন বাদশাহ দূরে চলে গেলে রাজধানীর অধিকার নিয়ে ভাইদের সংঘষ বাধতে পারে।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ! তাহলে উত্তরাধিকারের ব্যাপারে কিছু ঠিক হয়নি?'

'সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়নি। তবু আমি যতদূর জানি তাতে মনে হয় বাদশাহ দানিয়ালকেই উত্তরাধিকারী করতে চাইছেন।'

এই কথা পীথলের বিশ্বাস হলো না। তা সত্ত্বেও সন্দেহ প্রকাশ করার স্থান ও কাল এটা নয় ভেবে নিয়ে তিনি কেবল বললেন, 'তাই নাকি?' শেখ বলে গেলেন, 'আমার পরামর্শও তা-ই। আপনি জানেন বোধ হয়। এর কারণও আমি বলছি। সেলিম যে বাদশাহের প্রধান বেগমের পুত্র এটা সত্যি কিন্তু সে যদি সিংহাসনে আসীন হয় তবে ভারতবর্ষে আবার ধর্মীয় বিরোধ দেখা দেবে এবং তার ফল স্বরূপ যুদ্ধে ছারখার হয়ে যাবে এই দেশ। 'দীন-ইলাহি'র সে বিরোধী। বিদ্বেষ পরায়ণ ও অজ্ঞ মৌলবীদের হাতের ক্রীড়নক সে। ঐ সমস্ত মৌলবী মোল্লা এবং সেলিমের হাতে যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ন্যস্ত হয় তবে মোগল সম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য এটা আপনি জেনে রাখবেন। নবধর্মের প্রচারের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য অর্জনের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যাবে। সেইজন্য সেলিমকে রাজ্যভার না দেওয়ার পরামর্শ বাদশাহকে সব সময় দিয়ে থাকি। কিছুদিন আগে তিনি এটা স্বীকারও করেছেন।'

'শাহজাদা দানিয়াল তাঁর পিতার অনুসৃত নীতিকেই বহাল রাখবেন এবং তাঁর বয়সও কম।'

'দানিয়াল পাটরাণীর পুত্র নয়। বয়সে নবীন। খুব ক্ষমতাবানও নয়। এইসব কারণে শাসনকার্যে তাকে মন্ত্রীদের উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আপনি, আবুলফজল প্রভৃতি সহায়ক হলে বাদশাহের নীতি থেকে সে বিচ্যুত হবে না।'

এই কথাগুলি থেকে শেখ সাহেবের চিন্তাধারা ও চাতুর্য পীথলের

বোধগম্য হলো। তিনি বুঝে নিলেন যে বৃদ্ধ তাঁকেও দানিয়ালের পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা করছেন এবং তাঁর উদ্দেশ্য হচ্ছে আবুলফজল প্রমুখকে আকবরের মৃত্যুর পরও ক্ষমতারূঢ় করে রাখা। ফলে কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর তিনি বললেন, 'বাদশাহ যা চাইবেন তাই করা হচ্ছে আমার কর্তব্য। গৃহবিবাদে কোন পক্ষ নেওয়ার না আছে আমার অধিকার আর না আছে তেমন শক্তি। বাদশাহ যাঁকে উত্তরাধিকার অর্পণ করবেন তাঁকেই ভবিষ্যৎ বাদশাহ বলে আমাকে মানতে হবে। তিনি যদি দানিয়ালকেই সে অধিকার দেন তবে আমি আনুগত্যের সঙ্গে তাঁরই সেবা করতে থাকবো।'

একথা শুনে শেখ মুবারক প্রসন্ন হলেন। তিনি বললেন, 'বাদশাহও এই কথাই বললেন। সেইজন্যই তো তিনি দক্ষিণে যাত্রা করার আগে রাজকোষের দায়িত্ব নাসির খাঁকে, সেনাধিপত্য আপনাকে এবং অন্তঃপুর রক্ষার ভার শাহজাদা দানিয়ালকে দিয়ে যাবেন স্থির করেছেন। এটা যে অসীম আস্থার দ্যোতক তা আপনি স্বীকার করবেন। আমি যখন বললাম যে রাজনীতির ব্যাপারে একমাত্র আপনার মতামত জানার পরই আদেশ দেওয়া ঠিক হবে তখন তিনি কি উত্তর দিলেন জানেন? তিনি বললেন, 'আমার পীথলকে আমি চিনি। যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে আপনি গিয়ে আপনার নিজের আশঙ্কা দূরীভূত করতে পারেন।' কালই গোপন নির্দেশ জারী হবে।'

রাজা পীথল নিজের হর্ষ ও কৃতজ্ঞতা যথোচিত ভাবে প্রকাশ করলেন এবং নিজের আশঙ্কার কথা প্রকট হতে না দিয়ে বললেন, 'বাদশাহের প্রতি আমার ভক্তি অটল এবং কোন কারণেই তা হ্রাস হতে পারেনা। তিনি আমার উপরে যে বিশ্বাস দেখিয়েছেন, আমাকে যে সম্মান দিয়েছেন তা যথাযোগ্য হলেও আমি সর্বদা তার মর্যদা রক্ষার চেষ্টা করবো।' এই কাজে সহায়ক শেখ সাহেবকেও তিনি কৃতজ্ঞতা জানালেন।

অত্যন্ত আনন্দিত মনে শেখ মুবারক রাজাকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বললেন, 'মহারাজ! আপনার বুদ্ধি ও রাজভক্তি যে আশানুরূপ তার প্রমাণ পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। তবে একটা ব্যাপার

আমি কিছুতেই বুঝতে পারিনা, ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উদ্দেশ্যে বাদশাহের জ্ঞান-জাত নতুনধর্মকে আপনি স্বীকার করেন না কেন ? ঐ ধর্মের বেশিরভাগ তত্ত্বই যেহেতু হিন্দুধর্ম থেকে নেওয়া হয়েছে সেইহেতু এটা আপনার বিশ্বাসের প্রতিকূলও নয়। তা হলে আপনার মত সদাশয় ব্যক্তি উদাসীন রয়েছেন কেন ? আট-দশজন লোক এই ধর্মকে নিজের করে নিয়েছে। তারমধ্যে একজন মাত্র হিন্দু এবং ব্যক্তি হিসাবে লোকটি এমনই যে বুদ্ধি নামক বস্তুটি যাকে স্পর্শও করেনি।' পীথল এই প্রশ্নেরই অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি উত্তর দিলেন, 'মহাত্মন্! বাদশাহের এই ধর্ম অতি উচ্চশ্রেণীর এবং হিন্দুদের পক্ষে খুবই উপযুক্তও বটে। এর গভীর তত্ত্বগুলি এখন আমি অধ্যয়ন করছি। ধর্মীয় ব্যাপারে হালকা মনোভাব মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।'

শেখ বললেন, 'বেশ, বেশ! বেশ ভালভাবে ভেবে নিন। এর তত্ত্ব আমি আপনাকে বুঝিয়ে দেবো।'

তিনি হিন্দু এবং মুসলমানদের ধর্মীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। এই ভাষণ থেকে পরিত্রাণ লাভের অন্য উপায় না দেখে পীথলও সব শোনার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁর ধৈর্যের পরীক্ষা আর দিতে হলো না। শেখ সাহেবের কী মনে হলো তাই তিনি বললেন, 'একটা কথা আমি ভুলেই গেছি। আপনার সম্মতির কথা জ্ঞাত হওয়ার পর খবরটা বাদশাহকে জানানোর কথা আছে। পরে আবার দেখা হবে।' এই কথা বলে তিনি রাজপুরীর দিকে রওনা হলেন।

গুপ্তদ্বার দিয়ে তাঁকে বিদায় করে পীথল নিজকক্ষে ফিরে এলেন এবং সমস্ত বিষয়টা পর্যালোচনা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর বিশ্বাসই হলো না যে উত্তরাধিকারের বিষয়টি বাদশাহ শেখ মুবারকের কথা অনুসারে স্থির করেছেন। যে যাই বলুক তিনি একথা মানতে প্রস্তুত ছিলেন না যে একজন দাসীপুত্রকে ভারতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করার মত মূর্খতা আকবরের হবে। শুধু তাই নয়, তিনি এও বুঝেছিলেন যে দানিয়াল পিতার প্রিয় পাত্র হওয়া সত্ত্বেও তৈমুরের বংশধর সেলিমকেই

তিনি সিংহাসনারূঢ় দেখতে চান। যদিও মোল্লা-মৌলবীরা আকবরের বিরুদ্ধাচারী সেলিমের পক্ষাবলম্বন করছিল তবু পীথল জানতেন সেলিম কখনও অন্যধর্মের প্রতি অসহিষ্ণু হতে পারেন না। এছাড়াও আকবরের সমস্ত রাজপুত সাহায্যকারীই যোধাবাই-এর সন্তান সেলিমের পক্ষভুক্ত ছিল। এই সমস্ত চিন্তা করে পীথল সিদ্ধান্তে এলেন যে শেখের কথা-গুলি তাঁর নিজ মনোবাসনারই প্রতিচ্ছবি মাত্র। তাঁর মনে হলো বাদশাহের কর্মধারা তাঁর ধারণারই পরিপোষক। দানিয়ালের প্রধান সহায় নাসির খাঁ কেবল মাত্র রাজকোষের সংরক্ষণে নিযুক্ত হয়েছে এবং দানিয়াল স্বয়ং পেয়েছে অন্তঃপুর রক্ষার কাজ। রাজধানী রক্ষার দায়িত্ব আমার হাতে ন্যস্ত হওয়ার অর্থ হচ্ছে এই যে দানিয়াল আশঙ্কিতও না হয় আবার তার শক্তিও না বৃদ্ধি পায়। যথা সময়ে সব বোঝা যাবে, এখন থেকে কেন মাথা ঘামাই, এই কথা ভেবে তিনি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উঠানে বন্ধু এবং ভৃত্যদের মধ্যে গিয়ে পড়লেন।

শেঠ কল্যাণমলের ভবনে অনেক দরিদ্রের সমাবেশ হয়েছিল। উঠানে এবং আশপাশের রাস্তায় মেলা বসেছে মনে হচ্ছিল। পশ্চাদ্‌বর্তী দ্বার দিয়ে চন্দন লিপ্ত, পট্টবস্ত্র হাতে ভোজনে তৃপ্ত মানুষের দল বেরিয়ে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় দ্বার দিয়ে নতুন লোকেদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল গরীবদের অন্নবস্ত্র দান করা হচ্ছে।

শেঠজীর বাড়িতে সেদিন ছিল এক মহোৎসব। তাঁর দত্তপৌত্রী সুরজমোহিনীর ষোড়শ জন্মোৎসব পালিত হচ্ছিল। দানশীলতার জন্য শেঠজীর খ্যাতির ফলে নগরীর সমস্ত গরীবের সমাবেশ হয়েছিল। সকল লোককে অন্ন ও বস্ত্র দানের আদেশ তিনি দিয়েছিলেন। সুতরাং অন্ন-বস্ত্রের যে দান-ক্রিয়ার সূচনা প্রভাতে হয়েছিল এই সন্ধ্যার সময়ও তার সমাপ্তি হয়নি।

সুরজমোহিনীর মাতামহী দুর্গাদেবীই শেঠজীর বাড়ির সবকাজ দেখা শোনা করছিলেন। বয়স পঁয়ষট্টির উপর হলেও স্বাস্থ্যে এবং কর্ম-ক্ষমতায় তিনি কম নন।

কল্যাণমল ভবনে তাঁর ছিল একচ্ছত্র আধিপত্য। দাসদাসীদের

নিয়োগ-বরখাস্ত, আয়-ব্যয় এবং অন্যান্য কাজের ব্যাপারে শেঠজীর পরামর্শ নেওয়ার দরকারও তাঁর হতো না। এই মহাসমারোহের খবরও শেঠজী প্রস্তুতি পর্বের অনেক পরে পেয়েছিলেন।

মহামান্য বাদশাহের প্রিয়পাত্র, রাজামহারাজাদের পরমবন্ধু মহা-প্রভাবশালী শেঠজীর পরিবারের সবকিছু একজন স্ত্রীলোকের করতলগত দেখে প্রতিবেশীরা বিস্ময়ান্বিত হতো। কিন্তু এটা সকলেই জানত যে দুর্গাদেবীকে অসন্তুষ্ট করে শেঠজীকে সন্তুষ্ট করতে পারলেও কোন লাভের সম্ভাবনা ছিল না। এই কারণে গৃহকর্ত্রীকে অসন্তুষ্ট না করার ব্যাপারে সকলে সতর্ক থাকত।

এই বয়সেও দেখলে স্পষ্ট বোঝা যেত যৌবনে দুর্গাদেবী কী অপরূপ রূপবতী ছিলেন। বার্ধক্যের দরুন দেহ মাংসল হতে আরম্ভ করেছিল এবং মুখেও জরার আক্রমণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তা সত্ত্বেও তাঁর উজ্জ্বল চক্ষু দুটি শালীনতা ও শাসন-ক্ষমতার দ্যোতক ছিল। সহজেই এ-ও অনুমিত হতো যে অসহ্য যাতনার অনুভব এবং সংসারের সব ভাবনার অনুভূতিসিদ্ধ এই মহিলা ক্রোধ রিপুটিকে জয় করেছিলেন।

সুরজমোহিনা এবং দুর্গাদেবীকে শেঠজীর আশ্রয়ে থাকতে দেখে প্রথমদিকে অনেকে অনেকরকম কথাবার্তা বলা-কওয়া করত। কিন্তু তাঁদের স্বভাবের পরিচয় পাওয়ার পর ধীরে ধীরে সে অপবাদ দূর হয়েছিল। লোকমুখে শোনা তাদের কাহিনীটি হচ্ছে এইরকম: চিতোরে শেঠ কল্যাণমলের বন্ধু ও অগ্রজতুল্য একজন জহুরী ছিলেন যাঁর নাম বাবুমল। মহারাণা প্রতাপ সিংহের পিতা উদয় সিংহ আকবরের নিকট পরাস্ত হয়ে যখন চিতোর ছেড়ে চলে যান বাবুমল সেই সময় তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। কিন্তু বাবুমল ও তার পুত্র পথে মোগল সৈন্যের হাতে ধৃত ও নিহত হন। তাঁদের ধনসম্পদও বাদশাহের হস্তগত হয়েছিল। বাবুমলের পত্নী দুর্গাদেবী এবং তাঁর এক কন্যা এই ভাবে অনাথ হয়ে পড়েন। কল্যাণমল তাঁদের নিজ আশ্রয়ে এনে স্বজনের মত পালন করতে লাগলেন। তাঁদের ব্যবসাপত্তরও কল্যাণমলই দেখাশোনা করতেন। এর মধ্যে কল্যাণমলকেও বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হলো।

তাঁর প্রেমময়ী পত্নী পরলোক গমন করলেন এবং ব্যবসায়ে মন্দা দেখা দিল। দুর্গাদেবীর সাহায্যেই তিনি আগ্রায় এসে নিজের ব্যবসাকে আবার জমিয়ে তুললেন। এইভাবে কল্যাণমল্ল এবং দুর্গাদেবী একে অন্যের কাছে ঋণী ছিলেন।

দুর্গাদেবীর দৌহিত্রী তাঁর কন্যা এক বছরের শিশু সুরজমোহিনীকে রেখে স্বর্গবাসী হলেন। সেইজন্য সুরজমোহিনী তার মাতামহীর কাছে থেকে লালিত পালিত হতে থাকল। এখন তার বয়স ষোল বছর। কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণের এই সময়টা কি সুন্দর! অপরূপ ছিল তার রূপ। দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশদাম, অষ্টমীর চন্দ্রকলা সদৃশ তার ললাটদেশ, নীল কমলকে হার মানানো আঁখি দুটি, নির্মল হৃদয়ের দ্যোতক মৃদুহাস্যে মাধুরী, রক্তপদ্মোপম করতল এবং ক্ষীণ কটি বিশিষ্টা ঐ বালিকা যেন ভারতীয় নারীর মোহিনী প্রতিমূর্তি। নাসিকাগ্র কিঞ্চিৎ উন্নত, গতিমন্দালস নয়, এই সমস্ত ছোট খাট দোষ—অবশ্য ছিদ্রান্বেষীদের চোখে পড়তে পারে। আর একথাও সত্য যে তার নাসিকাটি সৌন্দর্যের পূজারীদের মানদণ্ডের কাছে পরাভূত হবে কিন্তু শেঠজী বলতেন যে এই একটি ত্রুটির ফলেই তাব মুখ নিষ্প্রাণ ছবিতে পরিণত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। আর দুর্গাদেবী বলতেন যে এই উচ্চ নাসিকা তার চোখের দুষ্টামির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেছে। কৈশোর যৌবনের মিলন লগ্ন তার দেহে এক নতুন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছিল। চোখ দুটিতে রসের স্পর্শ লেগেছিল বটে কিন্তু কৈশোরের লীলা চাপল্য মেয়ের যায়নি। মৃদু হাসির মাধুর্যে আকর্ষণ বেড়েছে কিন্তু শিশুসুলভ পবিত্রতা ফুটে উঠছে। সমস্ত শরীরে, বিশেষ করে কতকগুলি অঙ্গে রূপ বদলের যে পালা শুরু হয়েছিল তা বাধার সীমাকে এখনও অতিক্রম করতে পারেনি।

সুরজমোহিনী প্রকাশ্যেই ঘরের মধ্যে বিনা বাধায় নৃত্য করার উচ্ছলতায় এদিক ওদিক করে বেড়াচ্ছিল। রাজধানীর কুলীন হিন্দু-নারীরা মুসলিম নারীদের মত মুখাবরণের প্রথাটি গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। ঐ সময়, যখন সুন্দরী তরুণীদের স্বাধীনতা এবং চরিত্র

সুরক্ষিত ছিলনা, তখন এর আবশ্যকতাও ছিল। সুরজমোহিনী যখন বারো বছরের মেয়ে তখন থেকে শেঠজীর ইচ্ছা যে সে মুখাবরণী ব্যবহার করুক এবং পুরুষের দৃষ্টি বাঁচিয়ে চলুক। কিন্তু একথা দুর্গাদেবী অথবা তাঁর কন্যা কেউ স্বীকার করলেন না। 'আমাদের দেশে এমন হয় না, যখন বাইরে যাবে তখন পর্দানশীন হবে' এই ছিল দুর্গাদেবীর কথা। আর সুরজমোহিনী বলে 'রূপবতী মহারানীরা এবং দুর্গাদেবী নিজে যখন মুখাবরণ লাগান না তখন আমি কেন লাগাবো?' কল্যাণমলও খুব বেশি জোর দেননি। ফলে ঐ বালিকা মুসলিম রীতির দাস না হয়ে অন্তঃপুরে স্বাধীন ভাবেই বিচরণ করতো।

সুরজমোহিনীর শিক্ষা দীক্ষাও এখন পূর্ণতার পথে। সংস্কৃতে কাব্য, নাটক, অলঙ্কার প্রভৃতি এবং ব্রজ বুলিতে কবিকৃতিগুলি অধ্যয়ন করে সে নিজের সাহিত্য জ্ঞানকে বর্দ্ধিত করেছে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্র চালনা ও অশ্বারোহণে দক্ষতাও সে অর্জন করেছে।

বিশেষ বস্ত্রাভরণে ভূষিতা হয়ে সেদিন সে তার মাতামহীর সঙ্গে গৃহকর্মে লিপ্ত ছিল। শেঠজীর বিশ্রামের সময় হয়েছে কিনা একথা জানার জন্য অপরাহ্ণে যখন সে তাঁর কক্ষের দিকে যাচ্ছিল তখন পিছনে সিঁড়ির উপর একজনের পদশব্দ তার শ্রুতিগোচর হলো। মুখ ফিরিয়ে দেখতে গিয়ে এক গম্ভীর এবং সুন্দর অপরিচিত যুবককে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখল। শেঠজীর সাক্ষাৎ প্রার্থীদের মধ্যে এ পর্যন্ত সে তাঁর সমবয়স্ক বা মধ্য বয়সী লোকদেরই দেখেছে। সেইজন্য নিঃসঙ্কোচে অগ্রসরমান সেই যুবককে দেখে সে দাঁড়িয়ে গেল এবং প্রশ্ন করল, 'আপনি কে? এখানে কিভাবে এলেন?'

নিজের চিন্তায় নিমজ্জমান আনতশির যুবক হঠাৎ এই কথা শুনে চমকে উঠল। তারপর একটু নির্বাক থেকে বলল, 'মাফ করবেন, আমি আপনাকে দেখিনি। শেঠজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। অসঙ্কোচে আসার অনুমতি তিনিই আমাকে দিয়েছেন। সেইজন্য উপরে উঠে এসেছি। সামনে যে কেউ আছেন, এটা আমি ভাবিনি।'

সুরজমোহিনীর ভয় হলো হয়তো বা তার প্রশ্ন ঠিক হয়নি। সেই

জন্য সে মুখ নীচু করে রইল এবং অবশেষে বেশ কিছুটা সাহস সঞ্চয় করে বলল, 'তাহলে আসুন! বসুন! দাদু বোধ হয় বিশ্রাম করছেন। আমি দেখছি।' পাশের একটি ঘরে যুবককে অপেক্ষারত রেখে সে শেঠজীর ঘরের দিকে গেল।

যুবকটি দলপতি সিংহ ব্যতীত অপর কেউ নয়। রাজাপীথলের আদেশমত নিজের বাসস্থান, বেশভূষা অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদির আয়োজন করতে তাঁর সারাদিন কেটে গেল। অবকাশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর হিতৈষী বুঁদি মহারাজে ওখানে গিয়েছিলেন এবং তাঁর সেনাবাহিনীতে কার্যরত রামগড়ের দুজন সৈনিককে নিয়ে নিজের অনুচর নিযুক্ত করলেন। নিজেদের রাজকুমারের অনুচর হতে পেরে তারা খুব খুশী হলো। তারা বংশ পরম্পরা রামগড় রাজ বংশের সেবা করে আসছে এবং গুপ্তচরে ছেয়ে যাওয়া এই শহরে ঘরের অনুচর বিশ্বস্ত হওয়া প্রয়োজন। এই কথা ভেবেই দলপতি সিংহ এই যুবক দুটিকে বেছে নিয়েছিলেন। এরপর নিজের জন্য একটা উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজন ছিল। রাজপুরীর কাছে, কাছারী দ্বারের পিছনের একটা গলিতে একজন বস্ত্রব্যবসায়ীর প্রতিবেশীর একটি ছোট বাসা মিলে গেল। সেখানে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করার জন্য গোলাপ নামধারী নবনিযুক্ত অনুচরদের একজনকে পাহারায় রেখে তিনি নিজে দ্বিতীয় অনুচর সুচেতকে সঙ্গে নিয়ে বস্ত্রাদি ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন। সৈনিকদের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজারটিতে থাকায় শীঘ্রই কর্তব্য সমাপ্ত হলো।

এইভাবে নিজে করণীয় সবকিছুই সেরে সন্ধ্যা হয় হয় এমন সময় শেঠজীর সঙ্গে তিনি দেখা করতে এসেছিলেন। ঐ ঘরটিতে তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ বসতে হলো। তাঁর সব চিন্তা তখন সামনে আসা মেয়েটিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকল। যেহেতু শেঠজীকে সে দাদু বলেছে সুতরাং তার জাতিকুল সম্বন্ধে ভাবার কোন দরকার ছিলনা। যদিও তিনি জানতেন যে বণিক কন্যাকে রাজপুতরা ধর্মপত্নী হিসাবে গ্রহণ করেনা তবুও তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। তার কণ্ঠস্বরের গভীরতা, নির্দেশদায়ক শক্তি এদের সঙ্গে একীভূত মাধুর্য তাঁর হৃদয়কে

পীড়িত করতে লাগল। সর্বাভরণ ভূষিতা, বিশিষ্টভাবে সজ্জিতা তার মধুক্ষরা রূপ তাঁর মানশ্চক্ষুকে আচ্ছন্ন করে দিল। কয়েকবার নিজের মনের বিরুদ্ধে জয়ী হওয়ার বাসনায় তিনি ভাবলেন 'ছি, এই বণিক-বালিকার সম্বন্ধে এসব চিন্তা পোষণ করা অনুচিত।' কিন্তু কোনরকমেই যখন ঐ চিন্তাকে দূর করা গেলনা তখন দুষ্মন্তের অনুরূপ সমাধানের পথে বালিকাটির চিন্তায় এমনই মগ্ন হয়ে গেল যে—

'সতাং হি সন্দেহপদেযু বস্তুবু
প্রমাণমন্তঃ করণ প্রবৃত্তয়ঃ'

অর্থাৎ আশঙ্কার কথা সৎ-ব্যক্তিদের অন্তঃকরণের প্রেরণাই প্রমাণ করে।

সুরজমোহিনী দাতুর ঘরে গিয়ে দেখল যে তিনি বিশ্রামের পরিবর্তে কি এক চিন্তায় ডুবে রয়েছেন। তাকে দেখে প্রসন্নতার সঙ্গে তিনি বললেন, 'কি ? খাওয়া হয়েছে ? এদিকে কি ভাবে এসে পড়লি ?'

'বিশ্রামের জন্য আসতে আপনার খুব দেরী হয়েছে বলে দেখতে এসেছিলাম। সিঁড়িতে একজন যুবককে দেখলাম। সে কে দাতু ?'

'জেনে তুই কী করবি ?' মৃদুহেসে তিনি বললেন।

'আমি কী করব ? কিছুই না। আপনার অতিথি তো সবসময় দাড়িওলা বুড়ো হয়। সেইজন্য জোয়ান লোক দেখে অবাক হয়েছি।'

'ও আমার এক আত্মীয়। রামগড়ের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ঐ ছেলেটি। কিন্তু মোগলরা সেখান থেকে ওকে বহিষ্কৃত করেছে। সেইজন্য সে এখানে এসেছে। যুবকটির সঙ্গে আমার অনেক দরকার আছে। একবারই দেখা হয়েছে, কিন্তু ঐ সাক্ষাতের পর তার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস এসে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে দেখেছ, সে কোথায় ?'

'ঐ ঘরে রয়েছে। আমি বলে এসেছি, দাতু বিশ্রাম করছেন এখানে একটু বসুন। আপনি কাপড় বদলে নিন। আমি যাচ্ছি।'

হাত-পা ধুয়ে এবং কাপড় বদলে দলপতি সিংহের সঙ্গে দেখা করার জন্য তৈরী হতে শেঠজীর দশ-পনের মিনিট লাগল। তারপর তিনি নিজেই দলপতি সিংহ যে কক্ষে প্রতীক্ষারত ছিলেন সেখানে গিয়ে হাজির হলেন। তিনি বললেন, 'আপনাকে এতক্ষণ বসে থাকতে হলো

এর জন্য আমি দুঃখিত। চলুন ভেতরে যাওয়া যাক।'

'অসময়ে এসে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি।'

আমিতো আপনাকে বলেছি যে এ বাড়িকে আপনি আপনার নিজের বাড়ী বলে মনে করবেন। যে কোন সময় এখানে আসার স্বাধীনতা আপনার আছে। আজ আমার দত্তক পৌত্রীর জন্মদিন। সেইজন্য কিছুটা অব্যবস্থা রয়েছে।'

'দত্তক-পৌত্রী' শুনেই দলপতির মন আবার চঞ্চল হয়ে উঠল। শেঠজীর পরিবারের নয় যখন আর এই উপদ্রবের দিনে······! তাঁর চিন্তা পূর্ণতা পাওয়ার আগেই শেঠজী আবার বললেন, 'চলুন, ভিতরে চলুন। সেখানে আরামে কথাবার্তা হবে।'

যথাস্থানে দুজনে আসন গ্রহণ করার পর দলপতি সিংহ গত দুদিনের সব কথা সবিস্তারে শেঠজীকে বলার পর বললেন, 'আমি জানি যে এই সমস্তই আপনার অসাধারণ প্রভাবের প্রত্যক্ষ ফল। আপনার হৃদয়ে আমার জন্য যে এতখানি সহানুভূতি জাগ্রত হয়েছে তার জন্য আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। এর জন্য আমি আজীবন আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

'এতে কি হয়েছে?' শেঠজী বললেন, 'রামগড়ের রাজাদের কাছ থেকে আমাদের পরিবার শতাব্দীর পর শতাব্দী সাহায্য পেয়ে এসেছে। তাঁদের সমস্ত কথা আমি জানি। স্থানচ্যুত এবং নির্বাসিত আপনার জ্যেষ্ঠতাত বাদশাহ আকবরের সময়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমার প্রতি কৃপাশীল ছিলেন। আর আপনি তো জানেনই যে জহুরীদের শক্তির উৎস হচ্ছে রাজ পরিবার। আপনার বোধ হয় মনে আছে, প্রথম দিনই আমি রামগড়ের কথা জানার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলাম।'

'আমাদের ছোট্ট রাজ্যটির কথা যে আপনি জানেন, তা আপনি একটি প্রশ্নের দ্বারাই বলে দিয়েছিলেন। আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। আপনি যখন আমার জ্যেষ্ঠতাতের বন্ধু ছিলেন তখন আমাকে অন্তত পক্ষে তাঁর লোকজনেরা এখন কোথায় থাকতে পারেন সে সম্বন্ধে একটা অনুমানও অনুগ্রহ করে দিন না।'

'তাঁর লোক বলতে কেউতো ছিলই না। একটি মাত্র পুত্র ছিল। তিনিও বেঁচে নেই। সে সমস্ত চিন্তা করে আপনার দুঃখ পাওয়া উচিত হবেনা। আর প্রথম দর্শনেই আপনার প্রতি বিশ্বাস এবং ভালবাসার উদ্রেক হওয়ার অপর একটি কারণ রয়েছে। সেটা হচ্ছে ভোজসিংহ আমার পরম বন্ধু। তিনি আপনার আত্মীয় এবং আপনার উন্নতির চেষ্টায় তৎপর। এদিক থেকেও আপনাকে সাহায্য করা আমার কর্তব্য।'

'যা-ই হোক। আপনাদের কৃপায় আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ না করেই জীবিকার্জনের একটা পথ পাওয়া গেছে। পৃথ্বী সিংহ মহারাজের মত প্রভু পাওয়া খুব সহজ নয়।'

'রাজা পীথল খুবই ভাল লোক এবং বাদশাহও তাঁর প্রতি কৃপাশীল। তিনি যে এত বড় একটা পদ লাভ করেছেন এতে আমি একটুও আশ্চর্য হইনি। তিনি সবকথাই আমাকে বলেছেন।'

'আপনি কি তা হলে আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন?'

'হ্যাঁ কাল শাহজাদা দানিয়ালের গৃহে উৎসব রয়েছে। সেখানে যাওয়ার জন্য নিজপদের উপযুক্ত কিছু রত্নাভরণ সংগ্রহের উদ্দেশে আজ প্রাতে তিনি এখানে এসেছিলেন। তখনই আপনার কথাও বললেন।'

শেঠজী সত্য কথাই বললেন। কিন্তু রাজার আগমনের উদ্দেশ্য রত্নাভরণ ক্রয় ছিল না। শেখসাহেবের সঙ্গে তাঁর যে কথা হয়েছিল তাতে তাঁর মনে খানিকটা আশঙ্কার উদয় হয়েছিল। ঐ বিষয়েই শেঠজীর সঙ্গে কিছুটা যুক্তি পরামর্শ করার জন্য তিনি এসেছিলেন। শেঠজী যে শুধু তাঁর বন্ধু তা-ই নয় রাজকার্য তাঁর পরামর্শদাতাও ছিলেন। একথা আকবর ছাড়া কেউ জানত না। বাদশাহ নিজেও অনেক সময় পীথলের মাধ্যমে শেঠজীর পরামর্শ নিতেন। বহু জটিল প্রশ্নে তাঁর পরামর্শ গ্রহণের জন্য বাদশাহ নিজে পীথলকে তাঁর কাছে পাঠাতেন। একথাও এই দুজনের জানা ছিল। বণিক প্রধানদের রাজ্যের সর্বত্রই প্রবেশাধিকার ছিল তাই এঁরা সব জায়গার কথা সুক্ষ্মভাবে জানতে পারতেন। সুতরাং বণিককুলের অন্যতম প্রধানের কাছ থেকে পরামর্শ নেওয়ার মধ্যে অনৌচিত্য কোথায়? শেঠজীর

উপদেশ, গভীর বিচারশক্তি এবং অসাধারণ লোকচরিত্রের জ্ঞানের ফল সব সময় ভালই হতো। সে কারণে জটিল প্রশ্নগুলির ক্ষেত্রে পীথল তাঁর প্রদর্শিত পথ ধরেই অগ্রসর হতেন।

দলপতি সিংহ এসবের কিছুই জানতেন না। তবু তিনি যখন জানলেন যে তাঁর প্রভুর মারফৎ সমস্ত কথাই শেঠজী জেনেছেন, তখন তিনি এও অনুমান করলেন যে তাঁর নিজের সম্বন্ধেও নিশ্চয়ই কিছু কথাবার্তা উভয়ের মধ্যে হয়েছে। আর যদি তা-ই হয়ে থাকে তা হলে নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে পরামর্শও এঁর কাছ থেকে নেওয়া উচিত হবে এই কথা ভেবে তিনি বললেন, 'আমি জানি যে এখানকার প্রধান প্রধান ব্যক্তি সম্বন্ধে আপনি সবচেয়ে ওয়াকিবহাল। সেই জন্য জিজ্ঞেস করছি যে বর্তমান অবস্থায় আমার কী করা উচিত? আর কোন কোন কাজ কোন অবস্থায়ই করনীয় নয়? আমি জানি যে আমার উপরওয়ালা প্রত্যেকটি কাজ সম্বন্ধে আদেশ দিতে পারেন না এবং বলার আগেই প্রভুর ইচ্ছা জ্ঞাত হয়ে তদনুসারে কাজ করাই সেবকের উপযুক্ত পদ্ধতি।'

'আপনার প্রশ্ন খুবই সঠিক। রাজা পীথলের ন্যায় প্রভুর সেবার ব্যাপারে খুবই সতর্ক হওয়া দরকার। প্রথমত রাজকর্মচারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হওয়ায় তার শত্রুর সংখ্যা গণনাতীত। উৎকৃষ্ট সেবক তৎ-নির্দিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ভিন্ন অপর কোন ব্যক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে না। দ্বিতীয়ত তাঁকে দোষী করার জন্য এবং বাদশাহের কাছে তাঁর অপরাধ প্রমাণ করার জন্য অনেকে তোমার সঙ্গে সংঘর্ষ বাধাবার চেষ্টা করবে। আজকের ঘটনা, কাশিম বেগের ঝগড়ার কথা, উনি আমাকে বললেন। সেটা বাদশাহের কানে পর্যন্ত গেছে।'

'দলপতি সিংহের মুখ বিষণ্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, আশাকরি প্রভু আমাকে দোষী বলে মনে করেন না। সত্য ঘটনা......'

'সত্যকারের ঘটনা অনুসন্ধান করে রাজা বাদশাহকে বলেছেন। তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা থেকে ভীষণ বিপদ, কেবল আপনার উপরই নয়, আসতে পারে। রাজা

আপনার উপর মোটেই অসন্তুষ্ট নন। আপনার প্রভুভক্তিতে উনি সন্তুষ্টই হয়েছেন।' একথা শুনে যুবকের মুখে প্রসন্নতার ভাব ফিরে এলো, শেঠজী বলতে থাকলেন, 'একটি উপদেশই আমি আপনাকে দিতে চাই; তা-ও এই জন্য যে আপনি জানতে চেয়েছেন এবং আমি এই সমস্ত পরিস্থিতির বিষয়ে ওয়াকিবহাল। ভুল ভাববেন না। আকবর একজন অসাধারণ বাদশাহ। তাঁর অনেক কাজই হয়ত আপনার ভাল লাগবে না। তার মধ্যে অনেক গুলিতে প্রথম দৃষ্টিতে মূর্খতার পরিচায়ক বা ভুল বলে মনে হতে পারে। সেগুলির বিষয়ে চিন্তা করার অথবা আলোচনার প্রয়োজন নেই। ঐ সকলের অর্থ আপনি বুঝতে পারবেন না। এক বিশাল সাম্রাজ্যের শাসক কোন উদ্দেশ্যে কি করছেন বা কি করবেন তা জনসাধারণের বোধ শক্তির বাইরের জিনিস। সেই জন্য এ ব্যাপারে সাবধান থাকবেন। বাদশাহের কার্যকলাপের ঔচিত্য অনৌচিত্য নিয়ে আলোচনার লোক আপনি অনেক পাবেন।'

এই উপদেশের জন্য দলপতি সিংহ তাঁকে ধন্যবাদ দিতে গিয়ে বললেন, 'এই বার অন্ধকার হয়ে আসছে। শীঘ্রই আবার আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

'যখনই সময় পাবেন, আসতে সঙ্কোচ বোধ করবেন না। কাল দানিয়ালের ওখানে গিয়ে তাঁর ব্যবস্থাপক দীনদয়ালের সঙ্গে দেখা করতে ভুলবেন না। তিনি আমার বন্ধু। প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা এবং নীতিনিষ্ঠা তাঁর আছে। তিনি বিদ্বানও। তাঁর বন্ধুত্ব ভবিষ্যতে আপনার কাজে লাগতে পারে। আর, আপনার বিষয়ে পূর্বাহ্নে তাঁকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেইজন্য যে কোন সময় আপনি দানিয়াল শাহের প্রাসাদে অথবা তাঁর আবাসে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।'

বিদায় নিয়ে দলপতি সিংহ ফিরলেন। প্রথম প্রথম তিনি শেঠজীর গোপন প্রভাব এবং ভালবাসা প্রভৃতির বিষয়ে ভাবতে লাগলেন কিন্তু শীঘ্রই তাঁর চিন্তাধারা গিয়ে পড়ল সুরজমোহিনীর উপর। তার প্রতিটি অঙ্গের ছায়া তাঁর মনোমুকুরে প্রতিফলিত হতে থাকল। সীমন্ত সিঁদুর লিপ্ত না থাকায় তিনি বুঝেছিলেন যে সে অবিবাহিতা। যুবা

পুরুষের সঙ্গে যেরকম ধীরতা ও চাতুর্যপূর্ণ বাক্যালাপ সে করেছে, তাতে মনে হয়েছে সে শিক্ষিতা। শেঠজীর দত্তক পৌত্রী হওয়ায় রাজ্য ভ্রষ্ট এবং যুদ্ধে নিহত অসংখ্য রাজপুত্রের মধ্যে কারো একজনের কন্যা হতে পারে এই মেয়েটি। তাই যদি হয় তা হলে সে ক্ষত্রিয় কন্যাই হবে। কত ছোট ছোট ব্যাপারে যুবজনের হৃদয় বড় বড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে! মোটকথা, উক্ত কুমারীর রূপ দলপতি সিংহের হৃদয়ে নিজের অধিকার পাকা করে নিয়েছিল।

রাজধানীর প্রধান বাজারের পশ্চিমদিকে একটি বড় পথ ছিল যাকে বলা হত 'দিল পসন্দ'। এই রাস্তার দুধারে অনেকগুলি সুবৃহৎ ও সুসজ্জিত অট্টালিকা ছিল। প্রায় প্রতিটি প্রাসাদের সম্মুখে ছিল একতল বা দ্বিতল সিংহদ্বার যেগুলিকে বিচিত্র বর্ণের নানা রকমের শিল্পকলায় অলঙ্কৃত করা হয়েছিল। সারা দিনমান নির্বাক ঐ পথ সন্ধ্যায় অবর্ণনীয় কোলাহলে মুখর হয়ে উঠতো। সঙ্গীত-মৃদঙ্গ ঘুঙুরের মধুর সুরে, বীণার ঝঙ্কারে, কুসুমের সর্বব্যাপী সৌরভে এবং উচ্ছলিত জনসমাবেশে ঐ স্থানে 'দিল-পসন্দ' নামটি সার্থক হয়ে উঠতো। সিংহদ্বারে প্রজ্জ্বলিত বিবিধবর্ণের দীপমালা প্রতিটি গৃহকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করে তুলত। ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এবং সৈনিক যুবাপুরুষদের বাহক তথা অশ্বগুলির জাঁকজমক ঐপথটিকে উৎসব-সমাবেশের রূপদান করতো। কুবের তুল্য বণিকবর, প্রতাপশালী অভিজাত, যক্ষরাজ কুবের নন্দনের ন্যায় তারুণ্যের গর্বে গর্বিত সৈনিক যুবা প্রভৃতিরা এই পথে যেরূপ নিঃশঙ্কভাবে বিচরণ করতেন।

নিজেদের সৌন্দর্যকে শতগুণ বাড়িয়ে দেওয়ার মত অলঙ্কারে সুসজ্জিতা এবং আকারে-ইঙ্গিতে দর্শককুলকে অতি সহজে আকৃষ্ট করতে সক্ষম স্ত্রীলোকদের অলিন্দে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখার পর আর এ প্রশ্ন থাকে না যে কেন এই রাস্তার নাম হয়েছে 'দিল পসন্দ' আর কী কারবারই বা এখানে হয়। রূপোপজীবিনী নারীদের আবাসস্থল ছিল এই অঞ্চল। বিলাসী ব্যক্তিরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করত যে ঐটিই ছিল

রাজধানীর শ্রেষ্ঠতম আকর্ষণীয় মনোরম স্থান।

সঙ্গীত এবং নৃত্যে ভারতখ্যাতা বহু মোহিনী নারী এখানে বাস করত। তাদের বিদূষী ও সুসংস্কৃতা প্রমদারও অভাব ছিল না। ললিতকলা এবং শিষ্টাচারের পাঠ গ্রহণের জন্য রাজকুমারদের এদের কাছে পাঠানোর প্রথা সে সময় প্রচলিত ছিল। এই ঘটনা থেকেই স্পষ্ট হয় যে সমাজে এদের স্থান কোথায় ছিল। মাননীয়া এবং যোগ্যতাসম্পন্ন নারীরাও এদের মধ্যে ছিল, কিন্তু অল্প সংখ্যক। বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে জীবিকার্জনকারী এই সুন্দরীদের কাছে সঙ্গীত-নৃত্যাদি কলা পুরুষদের আকর্ষণ করার উপকরণ-মাত্র ছিল।

রাস্তার এক পাশের প্রায় মাঝামাঝি একটি বিশাল প্রাসাদ ছিল। পার্শ্ববর্তী অন্য ভবনগুলির মত শিল্প নৈপুণ্য অথবা জাঁকজমক ঐ প্রাসাদে ছিল অনুপস্থিত। তথাপি দ্বারে দণ্ডায়মান সেবকদের ব্যবহার ও সাজসজ্জায় স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে এটি হচ্ছে একজন ধনবতী গণিকার বাড়ি। আগ্রার প্রসিদ্ধ গণিকা হীরাজান ঐ প্রাসাদে বাস করত। চার পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত সে ছিল শহরের বহু বিখ্যাত লোকের প্রেয়সী। তার সঙ্গীত আর নৃত্যের প্রশংসা সকলের মুখে মুখে ফিরত। শাহজাদা সেলিমও হীরাজানের আয়ত্বাধীন ছিলেন বলে শোনা যায়। রাশি রাশি মণি-মাণিক্য আর সোনা তখন সে প্রতিদিন উপার্জন করত। রাজধানী গণিকাদের মধ্যে সে-ই ছিল প্রধান। কিন্তু কেন কে জানে, অল্প দিনের মধ্যেই তার পসার-প্রতিপত্তি কমতে লাগল। আর দেহ বল্লরীর পূর্ণ-বিকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কামার্ত ভ্রমরের দল বিকাশোন্মুখ কুসুমগুলিকে খুঁজে নিয়ে তাদের ঘিরেই গুঞ্জরণ শুরু করলো। কেউ কেউ বলে যে সেলিমশাহের মতে হীরাজানের সঙ্গীত আর তেমন নেই। এখন সে বিগত দিনের প্রখ্যাত গণিকাদের মতই সাধারণ জীবনযাপন করছে।

হীরাজানের একটি ইচ্ছা ছিল। সে জানত যে পুরানো দিনকে আর ফেরানো যাবে না। কিন্তু সে ভাবল যে যদি কোন একজন প্রবল ক্ষমতাবান ব্যক্তির বন্ধুত্ব অর্জন করা যায় তবে প্রতিদিনের

অপমান থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এই অভীষ্টকে পূরণ করার জন্য সে চতুরতাপূর্ণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

দলপতি সিংহ যেদিন শেঠজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিল প্রত্যহের মত সেদিনও 'দিল-পসন্দ' অঞ্চল সমান গুলজার ছিল। হীরাজানের প্রাসাদের ভিতর থেকে আনন্দদায়ক সংগীতের সুর ভেসে আসছিল। চিত্তাকর্ষকভাবে সজ্জিত তার বৈঠকখানায় বসে তিন চারটি যুবক তার গায়কীর প্রশংসা করছিল। তাদের সম্মুখস্থিত তাম্বুল-সামগ্রীর আধার হীরক-পাত্রটি এবং ফরাসী-মদিরার স্ফটিক পেয়ালাশ্রেণী গৃহস্বামিনীর ঐশ্বর্য ও বিলাসবাহুল্যের পরিচয় দিচ্ছিল। অতিথি-সংকারে নিযুক্তা স্ত্রী-লোকটি হীরাজানের দাসীদের অন্যতমা। আরাধকদের মধ্যে একজন একবার এই কাশ্মীরী বালিকাটিকে উপ-ঢৌকন হিসাবে হীরাজানকে দিয়েছিল। সঙ্গীত-নৃত্য-নিপুণ ও সম্ভাষণপটু দেখে সে এই মেয়েটিকে নিজের সখী হিসাবে রেখেছিল। এই ধরনের যুবতী যে গৃহের আড়ম্বরের সহায়ক তা হীরাজান জানত।

হীরাজান সেদিন তার সান্ধ্য-বিহারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। স্নান, পোষাক, অলঙ্কার প্রভৃতি বিষয়ে দাসীরা খুব সাবধানতার সঙ্গে তাকে সাহায্য করছিল। সমস্যা হচ্ছে কোন কোন অলঙ্কার পরা যায়? পাশের দাসীটিকে সে বলল, 'কেতকী, বৈঠকখানায় কে কে আছে দেখে এসো তো।' দাসী দেখে এসে বলল, 'মির্জা সাহেব এবং তাঁর দু-তিন জন বন্ধু রয়েছেন।' তখন হীরাজান বলল, 'বেশ, তাহলে সেই মরকত মালাটা এনে পরিয়ে দাও। সে আমায় এইরকম একটা মালা এনে দেবে বলেছিল না?' সমস্ত দিক থেকে সুসজ্জিত হয়ে সে দাসীদের বলল, 'মির্জা সাহেবকে আমার অনেক কিছু বলার আছে। তাই আমি না ডাকা পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে কেউ ওখানে যেও না। আমি রঙমহলে যাচ্ছি। কেতকী, তুমি ওঁদের ওখানে নিয়ে এসো।' হীরাজান ধীরে ধীরে রঙমহলে হাজির হলো। বৈঠকখানায় উপবিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধানকে কেতকী সাদরে সেখানে পৌঁছে দিল। অবশ্য এই ব্যক্তি আমাদের পূর্ব পরিচিত কাশিম বেগ। তাদের পরস্পর

অভিনন্দনের' মধ্যে কামুকতার লক্ষণ মাত্র ছিল না। হীরা জানে সৌন্দর্য ও বেশ-বিন্যাস সম্বন্ধে দু একটি মামুলী কথা বলার পর কাশিম বেগ কিছু কাজের কথায় এলো। হীরাজানও তার আগমনে প্রসন্নতা ব্যক্ত করে বলল, 'সাহেব, সেদিনের হীরা বেচে দেবার পর আপনি এই রকম একটা মালা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। সেটি বিক্রি করে অনেকদিন হলো দাম দিয়ে দিয়েছি। আপনি কিন্তু এখনও মালা এনে দিলেন না।'

কাশিম বেগ বললেন, 'তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? শুধু মালাই নয়, যা চাও তাই পাওয়ার সুযোগ আসছে।'

হীরার আগ্রহ বর্ধিত হলো। সে প্রশ্ন করলো, 'কি ভাবে?'

'তুমি শোননি? বাদশাহ-সালামত দক্ষিণদেশে যাচ্ছেন। তিনি আমার মালিক নাসির খাঁকেই রাজপ্রতিনিধি করে রাজধানীর ভার তাঁর উপর দিয়ে যাবেন। তখন তুমি আমার ক্ষমতা দেখো। এইসব কাফেরদের আমি মজা দেখিয়ে দেবো।'

'মির্জা সাহেব, নাসির খাঁ এককালে আমাকে খুবই চাইতেন। এখন আপনি একবার তাঁকে এখানে আনতে পারেন না?'

'এ-কি একটা কঠিন কাজ? তিনি আমার কোন কথা ফেলেন না। কিন্তু তুমি এসব কেন ভাবছ? এর চেয়ে বড় শিকারের কথা তোমার জন্য আমি ভেবে রেখেছি।'

'নাসির খাঁ সাহেবের চেয়ে আমাকে বেশি ভালবাসবার লোক কে আছে? আমার এই দুর্দশা সেদিন থেকে শুরু হয়েছে যেদিন থেকে শাহজাদা সেলিমশাহ আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন।'

'তুমি মূর্খ! সেলিমশাহের কী ক্ষমতা আছে? বাদশাহ সালামত তাঁর বিরুদ্ধে। সব উত্তরাধিকার পাবেন দানিয়াল শাহ। সেইজন্যই তো আমার প্রভুকে রাজ-প্রতিনিধি করা হচ্ছে। দানিয়াল শাহকে আমি আমার হাতের মুঠোয় করে নিয়েছি। সেই বন্ধুত্বকে পাকা করার জন্যই আমি ঐ মেয়েটিকে নিজের না করে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি যাতে সে কলাকৌশল ঠিকমত আয়ত্ব করতে পারে।'

দানিয়াল শাহের ওমরাহদের মধ্যে প্রধান নাসির খাঁ কাশিম বেগ মারফত তার প্রেমের কথা জানতে পারবে ভেবে হীরাজান তার উদাস ভাব ত্যাগ করে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। এক মুহূর্তে কল্পনার দৌড়ে সে তার নষ্ট-সম্মানের প্রতিবিধান করল, আবার রাজকুমার ও অভিজাতদের আরাধ্য হয়ে গেল এবং গণিকাকুল সাম্রাজ্ঞীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রাজধানী শাসন করার স্বপ্ন দেখতে লাগল। সেলিমশাহকৃত অপরাধের প্রতিকারের সুযোগ পাওয়া যাবে একথা ভেবে তার আরও আনন্দ হলো। কাশিমবেগের সঙ্গে স্থায়ী এবং লাভজনক পরিচয়ের মাধ্যমে নিজের যে এত উন্নতি হবে তা সে ভাবেনি। তার হৃদয়স্থিত পূর্ণ-আনন্দ যখন একটি স্মিত হাস্যে প্রকাশ পেলো তখন সে সত্যি-সত্যিই 'সর্বানঙ্গাগং সংক্রীড়ারংগ' শৃঙ্গারাধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপেই যেন আত্মপ্রকাশ করলো। সে বলল, 'আপনি তো জানেনই যে আমি আপনার অনুগত। আমি আপনার বান্ধবী নই, দাসী। আমার প্রেম কি আজকের? পারস্পরিক প্রেমের দ্বারা আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হবে।'

কথার স্বর, ব্যক্ত করার অনুকূল ভঙ্গিমা, আর সবার উপরে সেই ভঙ্গীর মধ্যে যে আত্মসমর্পণে ভাষা প্রকাশ পেল তা কাশিম বেগকে যেন সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে দিল। কিছুদিন থেকে তার প্রতি হীরার দিক থেকে যে উপেক্ষার ভাব দেখা যাচ্ছিল সেটা অকস্মাৎ তিরোহিত হওয়ায় সে আনন্দোৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং বলল, 'তোমার জন্য আমার খুবই উন্নতি হবে। আমার সমস্ত ভবিষ্যতটাই ঐ মেয়েটার উপর নির্ভর করছে। যেদিন আমি দানিয়ালশাহকে তার কথা বলেছি, সেদিন থেকে তিনি পাগল হয়ে আছেন। সেইজন্য ওর বিষয়ে খুব মনোযোগী হও। যতশীঘ্র সম্ভব ওকে নাচে ওস্তাদ করে ফেলো—আগের মত যেন না হয়।'

'সাহেব, মেয়েটি বড্ড জেদী। সবরকমের চেষ্টা করে দেখেছি কিন্তু সে কিছু খায়ও না আর আমার কথাও শোনে না। সে বলছে একজন রাজপুত বিয়ে করার জন্য তাকে সঙ্গে করে এনেছে। যদি সে এসে বিয়ে করে তা হলে সে অনশনে প্রাণত্যাগ করবে। মেয়েটি ক্ষত্রিয়।

সেইজন্য আমার হাতের জলও খায় না। বাইরে থেকে কোন ব্রাহ্মণ নিয়ে এলে তবে খায়। আমি চাবুক দিয়ে মেরেও দেখেছি। বাদশাহের উত্তরাধিকারী মহলে পৌঁছানোর পরই ঠিক হয়ে যাবে।'

'না, না, ওকথা ঠিক নয়। বাদশাহ সালামত যদি জানতে পারেন তাহলে তৈরী জিনিস মাটি হয়ে যাবে। তাঁর পক্ষে জানতে না পারাটাই অসম্ভব। সেইজন্য তাঁর দক্ষিণদেশ না যাওয়া পর্যন্ত বুঝিয়ে সুঝিয়ে যেমন করে হোক ঠিক রেখো। তার সব কথা শুনে তাকে খুশী রাখাই আগের চেয়ে ভাল হবে। তাকে বিয়ে করার কথা যে রাজপুত দিয়েছিল, সে আমিই। সুতরাং আমার কথা সে বোধ হয় মানবে। তাকে এখানে ডেকে আনো।'

হীরাজান তার দাসী কেতকীকে ডেকে হালফিল যে মেয়েটিকে আনা হয়েছে তাকে হাজির করার আদেশ দিল। কিন্তু কেতকী ফিরে এসে যে খবর দিল তাতে দুজনেই উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। সে বলল, 'এইতো দশ মিনিট আগেই সে ঘরে ছিল, কিন্তু এখন কোথাও তাকে দেখা যাচ্ছে না।'

'হায় রে! এটাও পালালো! এ কিরকম কথা? এক মাসের মধ্যে তিনটে মেয়ে এই ভাবে পালিয়ে গেল!' হীরাজান এবং কাশিম-বেগের হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হলো। তৎক্ষণাৎ আদেশ শোনা গেল, 'চারদিকে খোঁজ!' সন্ধান শুরু হতেই দেখা গেল নারায়ণদাস নামধারী চাকরটিও নিখোঁজ। কাশিম বেগের ধারণা তারা বেশি দূর যেতে পারেনি সুতরাং সব জায়গা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হোক। সে নিজেই চার-পাঁচজন ভৃত্যকে সঙ্গে নিয়ে মেয়েটির সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

খুব শীঘ্রই তারা সফল হলো। বোরখা পরিহিত চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক দুজন চাকরের সঙ্গে 'দিল-পসন্দ' পথ ধরে বাজারের দিকের গলি দিয়ে বেরুচ্ছিল। প্রথমে তাদের প্রতি কাশিম বেগের কোন সন্দেহ হয়নি। কিন্তু হীরার চাকরদের মধ্যে একজনকে দেখে তাদের মধ্যে একটি বালিকা, 'হায়! ওরা এসে পড়েছে!' বলে চিৎকার করে উঠলো। কাশিম বেগ সব বুঝতে পারল। তলোয়ার কোষমুক্ত করে নিজেকে

অনুচরদের নিয়ে সে যখন স্ত্রীলোকদের কাছে পৌঁছাল, তখন সে দেখল তারা খোলা তলোয়ার হাতে যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে আছে। রণ-কৌশল ও সাহসের ক্ষেত্রে কাশিম বেগ কারো চেয়ে কম ছিল না। সে সেই বালিকার দিকেই ছুটলো। বালিকার করুণ আর্তনাদ এবং অনুচরদের যুদ্ধের আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে লোকের ভীড় জমে গেল। ইতিমধ্যে একজন অশ্বারোহী যুবক অনুচরসহ সেখানে উপস্থিত হলো। সে লোকেদের জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কী হচ্ছে?' এই কথা শুনে কাশিম বেগ মুখ তুলে দেখল সামনে দলপতি সিংহ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। নিজের দুষ্কৃতির কথা উপর মহলে ছড়িয়ে পড়ার ভয়ে সে বলল, 'বন্ধু এরা একটি মেয়েকে চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। গোলমাল শুনে আমি এখানে এসেছি।' দলপতি সিংহ নিজের ভাষায় তাঁর অনুচর বৃন্দকে কি যেন বলে কাশিম বেগকে বললেন, 'বেশ, তাহলে চলুন আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি। বাদশাহের রাজধানীতে এই রকম দুর্নীতি!' এই কথা বলতে বলতে তিনি তাঁর তরবারি কোষমুক্ত করলেন। কাশিম বেগ খুব সন্তুষ্ট হলো কিন্তু ততক্ষণে মেয়েটি এবং তার স্ত্রী-সৈনিকরাও অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষের ভীড়ে।

দলপতি সিংহ বললেন, 'চলুন, এদের ছেড়ে দেওয়া অনুচিত।'

কথাটা কাশিম বেগেরও ভাল লাগল। দুজনে মিলে পার্শ্ববর্তী পথ এবং গলি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসন্ধান করেও কোন ফল পেলেন না।

হতাশা ও ক্রোধে কাশিম বেগ চঞ্চল হয়ে উঠল, 'রাজধানীর প্রধান পথের উপরই এই অবস্থা! এর প্রতিকার করতেই হবে।' দলপতি সিংহ তার সঙ্গে রইলেন। শেষ পর্যন্ত অনেক রাত অবধি খুঁজেও যখন কোন লাভ হলো না তখন কাশিম বেগ বলল, 'বন্ধুবর, আপনার সাহায্যের কথা আমি কখনও ভুলব না। ভবিষ্যতে আমরা বন্ধু ভাবেই থাকব।' দলপতি সিংহও নিজের স্বীকৃতির কথা জানালেন। তারপর যে-যার বাসস্থানের দিকে রওনা হলেন। কাশিম বেগের মুখ হতাশা ও ক্রোধে বিকৃত ছিল এবং দলপতি সিংহ ফিরলেন প্রসন্ন মুখে।

এখানে যে সময় এই সব ঘটনা সংঘটিত হচ্ছিল, সেইসময় নগরের

অন্য অংশে এক দেবী মন্দিরের নিকটবর্ত্তী ধর্মশালাটিতে চারজন লোক কোন এক গোপন পরামর্শ করছিল। তারা সকলেই মধ্য-বয়সী এবং চেহারায় প্রকাশ পাচ্ছিল যে ভদ্র বংশীয়। কিন্তু তাদের বেশবাস ছিল অতি সাধারণ। সতর্কতার সঙ্গে দেখলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে তারা ছদ্মবেশী। তাদের মধ্যে একজন বলল, 'আশা করা যায়, আজকের কাজ ঠিকমত হয়েছে। কোথাও কোন ভুল হয়নি ত?' চারজনের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী লোকটি উত্তর দিল, 'না, কোন ভুলই হবে না। হীরা জানে ভৃত্যদের মধ্যে একজন আমাদের দলের লোক আছে। আর যারা গেছে তারা সকলেই বিশ্বস্ত।'

'আর খবর পাওয়া গেছে?' একজন প্রশ্ন করলো।

যুবক বলল, 'সেলিমশাহের দালাল রমজান খাঁ কনোজ থেকে তিনটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে ধরে এনেছে।'

'তাদের কি রাজকুমারের কাছে পাঠান হয়েছে?'

'না, তারা ঘরেই আছে।'

'তাদের ধর্মান্তরিত করা হয়েছে কি?'

'যতদূর জানা গেছে এখনও হয়নি।'

'তাহলে তাদের জন্য কী করেছ?'

'কাঁচের চুড়ি বেচতে শঙ্করনাথকে পাঠানো হয়েছিল আর অর্থ দিয়ে সেখানকার একটি দাসীকে বশীভূত করা হয়েছে। সে নিজেও মুসলমান ধর্মে-ধর্মান্তরিত বিধবা ব্রাহ্মণী। আমাদের সব রকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।'

'তাহলে আর দেরি নয়। ঈশ্বরেচ্ছায় অর্থাভাব হবে না, কারণ সমস্ত খরচের দায়িত্ব বল্লভাচার্য স্বামী নিয়েছেন।'

একটি লোক তখন পর্যন্ত চুপচাপ বসেছিল। সব কথা শুনতে শুনতে হঠাৎ ক্রোধান্বিত হয়ে উঠে অবশেষে সে বলল, 'কতদিন আর এই অত্যাচার সহ্য করবো? আমাদের মধ্যে পুরুষত্ব যদি থেকে থাকে তাহলে ঝাড়ে-বংশে এদের নির্মূল করতে হবে। চণ্ড-মুণ্ড-বিনাশিনী এই চণ্ডিকা দেবীর সামনে আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে........'

দলের নেতা তার শপথ পূর্ণ হতে দিলেন না। তিনি বললেন, 'প্রতিজ্ঞা করোনা। আমাদের ইচ্ছা এক, তবু বিবেকহীনতার কাজ হবে না। সমস্ত কিছুই ভেবে-চিন্তে ধীরে ধীরে করতে হবে।' বক্তার কণ্ঠস্বরে একাধারে অনুরোধ এবং আজ্ঞা সম্মিলিতভাবে প্রকাশ পেল। তাঁর নির্দেশকে শপথকারী মেনে নিল।

এরা সকলেই 'হিন্দু রক্ষক সঙ্ঘের' কর্মকর্তা। ভারতে মোগল শাসন স্থায়ী হওয়ার পর তুর্কীস্থান, পারস্য প্রভৃতি দেশের বহু অত্যাচারী আমীর এদেশে এসে বাদশাহের সৈন্যবাহিনীর বড় বড় পদে উন্নীত হয়েছিল। তাদের অন্তঃপুর পূর্ণ করার জন্য গ্রাম, শহর এবং রাজপথ থেকে যেন-তেন-প্রকারেণ সুন্দরী হিন্দু যুবতীদের বলপূর্বক অপহরণ করা একটি সাধারণ নিয়মে পরিণত হয়েছিল। শাহজাদারাও এই ধরনের অপরাধ করা থেকে বিরত থাকতেন না। গরীব, অনাথ ও দুর্বল ছাড়াও যখন অভিজাতদের অন্তঃপুরে পর্যন্ত এই ধরনের আক্রমণ শুরু হলো তখন হিন্দুরা জেগে উঠল। রাজা মানসিংহ এবং রাজা ভগবানদাস প্রভৃতি সরাসরি বাদশাহের কাছে নালিশ জানালেন। বাদশাহ অপরাধীদের কঠোর দণ্ডদানের কথা দিয়েছিলেন এবং সে সম্পর্কে ঘোষণা নগরে নগরে প্রচার করে দেওয়া হয়েছিল আর কিছু লোককে শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। তবু এই অত্যাচারের শেষ হলো না। মুসলমান অভিজাতদের অন্তঃপুরে পর্দাপ্রথা চালু থাকায় অপহৃত যুবতীদের সন্ধান পাওয়া অসম্ভব ছিল। এই ভীষণ অবস্থা যখন চরম সীমায় পৌঁছাল তখনই আবির্ভাব হলো এই গুপ্ত সংগঠনের। এর কর্মকর্তা কে, এর কর্ম কেন্দ্রই বা কোথায় আর কাজই বা কিভাবে হয়--এইসব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানত না। তবে এটাই দেখা যেত যে মুসলমান অভিজাত দালালদের হস্তগত হিন্দু মেয়েদের কোন-না-কোন ভাবে উদ্ধার করা হতো এবং তাদের অন্তঃপুরে পৌঁছে যাওয়ার পরও আবার বের করে আনা হতো। তাদের কী হয়, তারা কোথায় যায় প্রভৃতি প্রশ্নের জবাব মিলতো না। দু-একটি মেয়ে স্বগৃহে ফিরেছে বটে তবে তাদের কাছ থেকেও কিছু জানা যায়নি।

এই দলের নেতা যেই হোক, ধন ও জনশক্তি তার পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল। প্রায় সব মুসলমান অভিজাত ব্যক্তির অন্তঃপুরেই এই দলের সাহায্যকারী ছিল। অর্থের বিনিময়ে মেয়েদের বের করে আনা এবং ক্রুদ্ধ মালিক কর্তৃক বরখাস্ত ভৃত্যদের রক্ষা প্রভৃতি করার সব ব্যবস্থাই এর ছিল। দিল্লী এবং আগ্রা পর্যন্তই এর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল না, এর সুদূর প্রসারী বাহু ভারতের যে কোন প্রান্তে পৌঁছবার ক্ষমতা রাখত। মেলায়, বাজারে আর মন্দির প্রভৃতি স্থানে এই দলের লোকেরা সব সময় তৈরী থাকত। এই ঘটনা বহুবারই প্রত্যক্ষ করা গেছে। কুরুক্ষেত্রে দেব দর্শনার্থী কয়েকজন ব্রাহ্মণ রমণীকে হরণকারী মুসলমান সরদার দু মাইল অগ্রসর হওয়ার আগেই যমলোকে পৌঁছে গেছে এবং উক্ত রমণীরা স্বাভাবিকভাবেই স্বগৃহে ফিরেছে। রাজধানীর লোকেরা জানত, একাজ ঐ দলের লোকরাই করেছে। বাদশাহ এই দলের সন্ধান করার জন্য স্বয়ং মান সিংহকে আদেশ করেছিলেন কিন্তু মান সিংহের প্রচেষ্টা বিফল হয়েছিল।

কালীমন্দিরে আলোচনারত ব্যক্তিরাই ছিলেন এই দলের নায়ক। উল্লিখিত বার্তালাপের পরও প্রায় এক ঘণ্টা তাঁরা ঐখানে বসে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে ছিলেন। তাঁদের উৎকণ্ঠা ক্রমাগত বর্দ্ধিত হতে থাকল এবং মুখ্য ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, 'যারা হীরাজানের গৃহে গিয়েছিল, তারা এখন ফিরে এলো না?' যে যুবকটি উত্তর দিচ্ছিল সে উঠে বাইরে গেল এবং এক ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলো। প্রধানের মুখ থেকে হঠাৎ প্রশ্নের ঝড় বয়ে গেল।

'কি হলো? সেই স্ত্রীলোকটি কোথায়? তোমার সঙ্গের অবশিষ্ট ব্যক্তি কোথায়?' আগন্তুক উত্তর দিল, 'আমার সঙ্গীদের কোন বিপদ হয়নি। একসঙ্গে আসা ঠিক হবে না বলেই আলাদা আলাদা আসছে। এর পর সে বালিকাটির উদ্ধার এবং কাশিম বেগের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ প্রভৃতি সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করল।

প্রধান প্রশ্ন করলেন, 'বালিকাটির কী হলো?'

'কোলাহলের মধ্যে সকলের চোখ এড়িয়ে বালিকাটিকে তার বাড়িতে

পৌঁছে দেওয়ার আদেশ সেই রাজপুত তার ভৃত্যদের দিয়েছিলেন। অর এবং আমাদের রক্ষার সর্বোত্তম উপায় ভেবে আমি মেয়েটিকে ভীড়ের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলাম। ভৃত্যটি মুহূর্তের মধ্যে তাকে নিয়ে উধাও হয়ে গেল।'

'সে কোন অঞ্চলে ছিল?'

স্থান, পথ ইত্যাদি সবই আগন্তুক বর্ণনা করল।

'তারপর রাজপুত কী করল?' প্রধান প্রশ্ন করলেন।

'কাশিম বেগ তাঁর প্রতি খুব স্নেহ-ভাব দেখাল। সে তাকে সাহায্য করার ভাণ করে আমাদের দূরে রেখে মেয়েটির সন্ধানে তার সঙ্গে সারা শহর ঘুরে বেড়াল।'

প্রথম ব্যক্তি বলল, 'সে রাজপুতটি যেই হোন, খুব বুদ্ধিমান বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি হাতছাড়া হয়ে গেছে কাশিম বেগকে এইকথা বলার জন্য এবং তার আশঙ্কাকে পরিবর্তিত করার জন্য তিনি যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তা খুব উৎকৃষ্ট। এখন আর ঐ বালিকাটি সম্বন্ধে চিন্তার তেমন কোন কারণ নেই।'

এরপর তাঁদের সভা ভঙ্গ হতে বিলম্ব হলো না। তাঁরা একে একে বিভিন্ন পথে নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলেন।

দানিয়াল শাহের প্রাসাদে সেদিন রাত্রের উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছিল। সন্ধ্যা সমাগমের সঙ্গে সঙ্গে নগরের প্রধান নর্তকীরা নিজ নিজ গায়ক-বাদক প্রভৃতি সমভিব্যাহারে অঙ্গনে এসে একত্রিত হতে লাগল। তাদের চালচলন আর চাকচিক্যের কী বর্ণনা দেব! নিজের ঐশ্বর্য, রূপ এবং কলাবৈদগ্ধের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের সর্বোত্তম সুযোগ উপস্থিত হয়েছে দেখে সব বারাঙ্গনাই প্রথম স্থান অধিকারের আকাঙ্খায় সেখানে হাজির হয়েছিল। যারা স্বল্পখ্যাত তারা পূর্বাহ্ণেই স্থান সংরক্ষণের জন্য উপস্থিত হয়েছিল। অভ্যাগতদের অভ্যর্থনায় নিযুক্ত ভৃত্যেরা সকলকে যথোচিত স্থানে বসিয়ে পান ও ভোজনের দ্বারা পরিতৃপ্ত করছিল। প্রায় সাড়ে সাতটার সময় রত্নখচিত স্বর্ণময় বস্ত্রালঙ্কার পরিধান

করে শিরস্ত্রাণে নিজ পদমর্যাদার স্মারক লাগিয়ে এক তেজস্বী ও সুন্দর ব্যক্তি প্রবেশ করলেন। তাঁকে দর্শনমাত্রেই নারী মণ্ডলী দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে সাদর অভিবাদন জানালো। এই ব্যক্তি কাশিম বেগ। দাসী বর্গের নেতৃস্থানীয় এক কর্মচারী যখন অগ্রসর হয়ে তাকে সেলাম জানাল তখন কাশিম বেগ গাম্ভীর্যের সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'আলিখাঁ, আর কে কে আসতে বাকি ?'

আলি খাঁ মাথা নত করে সেলাম জানিয়ে বলল, 'হুজুর! গুলআনারা, চঞ্চল, হীরা, কালদার আর মুরাদ আসতে বাকি আছে।'

'আটটার আগে এখানে পৌছে যাওয়ার আদেশ ছিল না? তবে কেন এখনও অসেনি ?'

'সময় হয়নি। এখনও আধঘন্টা দেরি আছে।'

'সবাই এসে গেলে আমায় জানিও।'

'যে আজ্ঞে, হুজুর।'

আলিখাঁর উত্তরকে উপেক্ষা করে কাশিম বেগ মুখে মৃদু হাসি মাখিয়ে অভ্যাগতদের দেখতে দেখতে ভিতরে চলে গেল।

যাদের আসার কথা ছিল সেই সব নর্তকী একে একে আসতে লাগল। চঞ্চল জান নাম্নী মোহিনী সবার আগে এল। সঙ্গীতশাস্ত্রে সে ছিল সারাভারতে অনন্যা। সরস্বতীর বরপুত্র গায়কপ্রবর তানসেন ছিলেন তার গুরু। বাদশাহের কাছ থেকে সে বহু পারিতোষিক লাভ করেছিল। তার সঙ্গীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের ফলে তাঁর আদেশ ছিল, যেখানেই সে যাবে বাদশাহেরও সেখানে যাওয়া চাই। এই আদর ও সম্মানের যথাযোগ্য ও উপযুক্ত ছিল তার আগমন। বাদশাহের কাছ থেকে পাওয়া একটি মরকত মণি, যার তুল্য রত্ন রাজা মহারাজাদের মুকুটশীর্ষেও দুষ্প্রাপ্য ছিল। হীরক-হারে গ্রথিত হয়ে তার কণ্ঠ দেশের শোভাবর্দ্ধন করছিল। তার অন্যান্য আভরণ, যা বিভিন্ন সময় রাজপুরী থেকেই পাওয়া গিয়েছিল, খুবই মূল্যবান ছিল। নবরত্নে গড়া একটি বুন্দা সে পরেছিল। কোন এক রাজকুমারের জন্মদিনে যোধাবাই সেটি তাকে দিয়েছিলেন। ছ-নরীর একটি মোতির মালা,

হাতে হীরক-খচিত চুড়ি, বস্ত্রপরিশোভিত মেখলা এবং পায়ের নূপুরগুলি তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে দশগুণ বর্দ্ধিত করেছিল। তার দাসীবৃন্দ ও বাদকদলও রাজকীয় বেশভূষায় সজ্জিত ছিল। তার দর্শন মাত্রেই সকলে স্বাগত জানালেন এবং সেও যথা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে উপবেশন করল।

চঞ্চলের আগমনজাত কোলাহল তখনও শান্ত হয়নি এমন সময় অপর দুটি রমনী প্রবেশ করল। প্রথম জন হল হীরাজন। সময়ের গুরুত্ব অনুধাবন করে সে-ও খুব সাজ-সজ্জা করেছিল। মুখমণ্ডলকে কমনীয় করার জন্য ব্যবহৃত রঞ্জক, তাম্বুল চর্বনজনিত অধরোষ্ঠের লালিমা, ঘনকৃষ্ণ ভ্রূ যুগল, অঞ্জন লিপ্ত নয়নের কৃত্রিম রমনীয়তা প্রভৃতি সুরসিক অভিজাতদের মনোহরণের পথে যথেষ্ট বলেই হীরাজান জানত। কিন্তু তার বেশবিন্যাস দর্শনের অবকাশ পর্যন্ত দর্শকবৃন্দের ছিলনা। তাকে প্রদীপের মত নিষ্প্রভ করে দিয়ে সৌন্দর্যের উজ্জ্বল জ্যোতি স্বরূপিনী এক নারী রঙ্গ মঞ্চে প্রবেশ করল। তার নাম গুলআনারা। স্বীয় রূপলাবণ্য, নৃত্য-নৈপুণ্য প্রভৃতির দ্বারা এই রমনী বাদশাহসহ সমগ্র সভাসদ মণ্ডলীর প্রীতিভাজন হয়েছিল। তার আগমন ঠিক এই ভাবেই বর্ণিত হতে পারে :

নীলোৎপলাক্ষি তদনন্তর মুক্তবাশা
বঙ্কারবে চোটি কলন্নুর্চবপ্লেরিক্ষু।
কাণায়িতুজ্জ্বল বিভূষণ রত্ন শোভা
দীপাবলী কবলিতা নয়নাভিরামা॥

অর্থাৎ উত্তর দিকে রক্তিম আভা বিচ্ছুরিত করে, উজ্জ্বল রত্নালঙ্কারের শোভায় দীপাবলীকে নিষ্প্রভ করে, সে নয়নাভিরাম—

সঙ্কারমায় মণমুলাবিন নকলং পু—
বকক্ষীণ কান্তি নিরবে পুয়তোনযন্তী
ভূষা মণিত্তেলিম কোণ্টোর কাল সন্ধ্যা—
শঙ্কাং জনস্য হৃদয়ে বিনিবেশয়ন্তী॥

অর্থাৎ আগমন সংবাদ নিবেদনের জন্য পুরোভাগে নিজের

জ্যোতির্ময়তাকে চলমান করে, রত্ন-বিভূষণের বিশিষ্ট আলোয় মানুষের হৃদয়ে অকাল সন্ধ্যার আশঙ্কা সৃষ্টি করতে করতে—

নালং চুপত্তুধনিভিঃ সমুপাস্যমানা
মন্দার-সুন্দর মৃদুস্মিত নন্দনীয়া
নানাজনং জয়জয়েত্যনুবেলমাশী
বদিঙল চৈতু তেলিযুং মুখচন্দ্রবিম্বং।

অর্থাৎ চার পাঁচ-দশ জন ধনী ব্যক্তি দ্বারা আরাধিত হয়ে, মন্দার পুষ্পের তুল্য মৃদুহাস্যে নিজেকে যোগ্য প্রতিপন্ন করে, বহুজনের জয়ধ্বনি ও আশীর্বাদের শক্তিতে আরও দীপ্যমান মুখ বিম্বের সঙ্গে-

বৈমনিকৈরপিগণৈঃ পরিগীয়মান--
রূপামৃতং, মকর কেতন বৈজয়ন্তী
আলোলনীল নয়নোৎপল মালিকাভি- -
রাশা। নুসান্দ্র জনতাসু বিনিক্ষিপন্তী॥

অর্থাৎ আকাশ রথে বিচরণকারী দেবতাদের দ্বারা আস্বাদিত রূপামৃতের অধিকারিণী সে কামদেবের বিজয় পতাকা সদৃশ নিজের চঞ্চল নীল-নয়নোৎপল মালার দ্বারা উপস্থিত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে আশার কিরণের সঞ্চার করতে করতে উপস্থিত হলো।

গুলআনারা সভা মধ্যে প্রবেশ করায় অন্যদিকে দেখার মত চোখ আর যেন কারো রইল না। চঞ্চল জান তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে তাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাল এবং মৃদু হেসে সস্নেহে তাকে এনে নিজের পাশে বসালো। হীরাজানের ক্রোধের সীমা রইল না। সাজ পোশাকের জোরে এদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেওয়ার আশা তার ছিল। কিন্তু গুলআনারার আগমনের পর সে যখন দেখল যে তারদিকে চোখ তুলে দেখতে কেউ রাজী নয় তখন সে একাধারে ক্রুদ্ধ এবং দুঃখিত হলো। মনে মনে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে সে এক জায়গায় বসে পড়ল।

ভিতরে দরবারগৃহও খুব জমজমাট হয়ে উঠেছিল। ভোজন প্রভৃতি সেরে শাহজাদা তখনও অন্তঃপুর থেকে আসেননি। কিন্তু বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসে পৌঁছে ছিলেন। কক্ষটির অলঙ্করণ দানিয়াল শাহের ক্ষমতার

অনুরূপই ছিল। ফরাসের উপর বিস্তৃত পারস্যদেশীয় গালিচার সৌন্দর্য উপরের দীপাধার গুলির জন্য দ্বিগুণ হয়েছিল। বিশাল এই কক্ষটির অর্ধাংশ খালি রাখা হয়েছিল এবং বাকি অর্ধাংশে বিছানো ছিল রেশম ও জরির গালিচা। মধ্যখানে ছিল একটি সিংহাসন—যেটিকে সব চেয়ে বেশি সাজানো হয়েছিল। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে সেটি শাহজাদার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

অতিথিরা ধীরে ধীরে আসছিলেন। অনেকে এসেও গিয়েছিলেন। বিশ্ব-বিশ্রুত নূরজাহানের ভ্রাতা ইব্রাহিম খাঁ, বাদশাহ আকবরের অশ্বপাল রাজা কিশনদাস এবং জামাতা মুজফফর হুসেন মির্জা প্রমুখ আগে থেকে সেখানে হাজির ছিলেন। দানিয়াল শাহের দেওয়ান পণ্ডিত দীনদয়াল শাহজাদার প্রতিনিধি হিসাবে এঁদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সে সময় ইব্রাহিম খাঁ দানিয়ালের একজন আশ্রিত মাত্র ছিল। এই অতি সুন্দর যুবকটি ফার্সী ভাষার খ্যাতিমান কবি, বিলাসপ্রিয় ও সুরসিক ছিল। দানিয়াল শাহের পানোৎসব গুলির পরিচালক ছিল সে। রাজধানীতে সকলে তাকে শাহজাদাকে বিপথে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে প্রেরিত শয়তানের দূত বলে মনে করত। কিন্তু বাদশাহ তাকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখতেন। সেই জন্য তার বিরোধিতা করার সাহস কারো হতো না। যে পদ্ধতি অনুসরণ করে সে নিজে শাহজাদার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠেছিল ঠিক সেই পদ্ধতিতেই প্রিয় পাত্র হওয়ার এবং ইব্রাহিম খাঁকে দূর করবার চেষ্টা কাশিম বেগ সব সময় করত। তবু সে তখনও সফল হয় নি। রাজা কিশনদাস ছিলেন সবারই বন্ধু। যে কোন প্রাসাদেই উৎসব আয়োজন হোক না কেন তিনি সেখানে হাজির থাকতেন। প্রথম সারিতে তাঁর আসন নির্দিষ্ট ছিল। এই সব স্থানে যা যা ঘটত তার বিবরণ বাদশাহকে দেওয়াই যে তাঁর কাজ ছিল একথা রাজা পীথল, নাসির খাঁ প্রমুখেরা স্বীকার করতেন। হুসেন মির্জা ছিলেন অন্য ধরনের লোক। দানিয়াল শাহের সঙ্গে তাঁর এক ভগ্নীর বিবাহ হওয়ার ফলে এই ধরনের সমাবেশে তাঁর প্রবেশ ঘটত। রাজকুমারের নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন তুর্কী ও

পারসিক। হিন্দু মাত্র চার পাঁচ জনই ছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন রাজা পীথল, গঙ্গাধর রায় এবং নগর কোটের সম্ভোগ সিংহ। রাজা পীথলের সঙ্গে দলপতি সিংহও ছিলেন। প্রত্যেকেই রাজকীয় বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত। মুসলমান অভিজাতদের কণ্ঠহার ও শিরস্ত্রাণস্থিত মণি রাজপুতদের কুন্তল, সকলের স্বর্ণময় পরিচ্ছদ, হীরা মণি মুক্ত খচিত কোমরবন্ধ প্রভৃতি সেকালের দরবারী পোশাকের অনিবার্য অঙ্গ ছিল। অভ্যাগতদের স্বাগত জানানো এবং তাঁদের কুশল প্রশ্নাদি করার জন্য দ্বার দেশে পণ্ডিত দীনদয়াল উপস্থিত ছিলেন। দলপতি সিংহ সহ রাজা পীথল দ্বার দেশে উপনীত হওয়া মাত্র পণ্ডিত দীন দয়াল তাঁদের কাছে এগিয়ে গেলেন। তিনি তাঁদের সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'মহারাজ! আপনি এসেছেন? আপনার সব কুশল ত? হুজুরে আলা আপনার সাক্ষাৎ লাভের আগ্রহে অধীর হয়ে রয়েছেন। ইনি কে?'

'এই পুরুষ প্রবর হলেন দলপতি সিংহ'। রাজা পীথল পরিচয় দিলেন। 'ইনি রামগড়ের যুবরাজ, বর্তমানে আমার দেহরক্ষী এবং সেনাবাহিনীর যোগ্য উপনায়ক।'

'ওহো! বুঝেছি! শেঠজী আপনার সম্বন্ধে আমার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি।'

দলপতি সিংহও যথোচিত উত্তর দিলেন।

পণ্ডিত দীনদয়াল আবার বললেন, 'আমায় লেখা একটা চিঠিও আছে না? এখন তো মহারাজা নিজেই আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন; চিঠির আর কী গুরুত্ব রইল? আমার কোন সাহায্যের আপনার প্রয়োজন আছে? আপনার আদেশ মাত্র করতেই যা বাকি।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'বর্তমানে আপনার আশীর্বাদটুকুই আমার চাই। আমার মহানুভব প্রভুর কৃপায় এ সময় আমার আর কোন কিছুর আবশ্যকতা নেই।'

'আমার স্নেহ ও বন্ধুত্ব শেঠজী এবং মহারাজের বন্ধু মিত্রদের সব সময় লভ্য।'

এঁরা যখন এইভাবে বার্তালাপে করছিলেন প্রসন্নভাবে এসে কাশিম বেগ সেই সময় রাজা পীথলকে অভিবাদন জানালো। তারপর দলপতি সিংহকে দেখে সে বলল, 'আসুন, আসুন! আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে বড়ই আনন্দিত হলাম। আমার ইচ্ছা, আমার প্রভু নাসির খাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিই।' এই আহ্বানের উত্তর দিলেন রাজা পীথল, 'বেশ তো ওঁকে নিয়ে যাও, আর তোমার প্রভুকে আমার নমস্কার দিও।'

দুজনে নাসির খাঁর কাছে চলে গেলেন। রাজা পীথল ও দীনদয়াল একে অপরের দিকে বিস্ময়াভিভূত জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। প্রথমদিন কাশিম বেগ এবং এবং দলপতি সিংহের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়েছিলে তার কথা এঁরা উভয়েই জানতেন। সেদিক থেকে ঐ দুজনের মধ্যে এখন যে সৌহার্দ দেখা গেল তা আশ্চর্যজনক। কিন্তু এ বিষয়ে দুজনের কোন কথা হলো না।

এর মধ্যে এক দ্বাররক্ষী পণ্ডিত দীনদয়ালকে জানাল যে শাহাজাদা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়েছেন। এই কথাটি দু একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে জানিয়ে দীনদয়াল ইব্রাহিম খাঁর সঙ্গে শাহজাদাকে আনাতে গেলেন।

দানিয়াল শাহের বয়স সে সময় প্রায় বাইশ বছর হয়েছিল। তিনি ছিলেন কোমল কাঠামোর মানুষ। তৈমুর-বংশের উপযোগী গাম্ভীর্য এবং পৌরুষ যেন তাঁকে স্পর্শই করেনি। দাসীর ঔরসজাত সন্তান হওয়ায় ভ্রাতৃবৃন্দের অথবা মোগল সরদারদের কাছে তাঁর কোন সমাদর ছিল না। কিন্তু যেহেতু আকবর তাঁকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখতেন এবং তিনি সম্ভবত উত্তরাধিকারী হবেন এই জনশ্রুতি ছিল, সেই কারণে সকলেই তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিনয়ের ভান করত। দানিয়ালের গর্ভধারিণী প্রসবকালেই প্রাণ হারিয়েছিলেন বলে যোধা-বাই-ই তাঁকে লালন-পালন করেছিলেন। বালিকাদের সাজ-পোশাক ও অলঙ্কারের প্রতি বেশি রকম আকৃষ্ট ছিলেন বলে সেলিম, মুরাদ প্রমুখ শাহজাদারা তাঁকে অনেকটা পরিহাসের দৃষ্টিতেই দেখতেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর এই স্বভাব যায়নি। গায়ক তথা

হিজড়াদের সঙ্গে ছিল তাঁর সদ্ভাব এবং এদের সাহচর্যেই তিনি তাঁর সময়ের বেশির ভাগ কাটাতেন। শাহজাদা সেলিম তো তাঁকে 'দানিয়াল-বানু' বলে সম্বোধন করতেন।

শাহজাদার বেশভূষাও ছিল এই স্বভাবের অনুরূপ। ঢাকার সবচেয়ে মোলায়েম মকমলের চাপকান, মিহি রেশমের ফতুয়া এবং জরী দেওয়া মকমলের জুতো এই ছিল তাঁর পোশাক। গলায় দোদুল্যমান হীরা-মোতি মরকতের হার আর মাথায় তাঁর বিবিধ রত্ন খচিত পাগড়ী। দু হাতের বাহু-বন্ধনীর মাঝখানে একটি করে বৃহদাকার নীলা বসানো ছিল। আতরের সৌরভ তাঁর দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হয়ে সমগ্র প্রাসাদটিকে সুগন্ধময় করে তুলেছিল।

শাহজাদা দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন, তাঁর এক পাশে ছিলেন ইব্রাহিম খাঁ, অপরপাশে দীনদয়াল। সকলেই তিনবার করে আনত হয়ে তাঁকে সেলাম জানাল। শাহজাদা প্রসন্নমুখে স্মিতহাস্যে সকলকে অনুগৃহীত করলেন। তিনি নাসির খাঁকে নিজের দক্ষিণপাশে, রাজা পীথলকে বামপাশে এবং অন্যান্যদের নির্দিষ্ট আসনগুলিতে উপবেশন করার অনুমতি দান করলেন। সকলে আসন গ্রহণ করার পর নর্তকীদের আহ্বান জানানোর আদেশ দেওয়া হলো। তারা একে একে সকলে এলো এবং শাহজাদাকে কুর্নিশ করে শূন্যস্থানটিতে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট হলো। বাদ্যকারদের মধ্যে কেবল চঞ্চলজান ও গুল আনারার সঙ্গীরাই ভিতরে এসে পিছনে বসার অনুমতি পেল।

'প্রথম চঞ্চল জানের নৃত্য হোক।' শাহজাদা বললেন। চঞ্চল জান ধীরে ধীরে উঠে রাজকুমারকে অভিবাদন করে সামনে এসে বসল। তার তবলচী প্রভৃতিও এগিয়ে এলো। আমীর খুসরুর একটি সঙ্গীত সহযোগে সে একটি নৃত্য শুরু করল। হস্ত-পদ ও নেত্রের ভঙ্গিমা এবং ভাব সমূহের সম্মিলিত নৈপুণ্যে দর্শক মহলে প্রশংসা ব্যঞ্জক ধ্বনি গুঞ্জরিত হলো। নৃত্যের স্বাদ কিছুটা গ্রহণ করে শাহজাদা রাজা পীথলকে প্রশ্ন করলেন, 'কী রাজা! ভাল হচ্ছে না?'

'অতি উত্তম'। পীথল তাঁর সম্মতি জানালেন।

একটি নৃত্য সমাপ্ত হতেই চঞ্চলজান বোধহয় বিশ্রামের জন্য নীচে বসল। শাহজাদা তখন তাকে ডেকে বললেন, 'আমার বন্ধু পীথল তোমায় দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। তুমি এঁরই কাছে বসো।' মৃদু হেসে সে রাজার পদপ্রান্তে বসে পড়ল। রাজা আশীর্বাদের ভঙ্গিতে তার মাথায় হাত দিলেন এবং শাহজাদাকে বললেন, 'হুজুর! চঞ্চল জানের সঙ্গে আমি তো দীর্ঘদিন পরিচিত কিন্তু নাসির খাঁ সাহেব এঁকে চেনেনই না। একে ওর কাছে বসবার সুযোগ দিন না?'

'এই কথা? বেশ, চঞ্চল, তুমি নাসির খাঁর কাছে গিয়ে বসো।' দানিয়ালের এই আদেশ তৎক্ষনাৎ পালিত হলো। এই ব্যবহার নাসির খাঁর কিন্তু মোটেই ভাল লাগল না। কেবল শাহজাদার আদেশ বলেই বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে হলো। স্বীয় নৃত্যকলা প্রদর্শনের জন্য এবার গুল-আনারা অনুমতি পেল। তার নৃত্যটি ছিল চঞ্চলের থেকেও সুন্দর। কিন্তু ললিতকলায় শাহাজাদার জ্ঞান না থাকায় তিনি কোন বিশেষ উৎসাহ না দেখিয়ে বললেন, 'শহরে কোন নতুন গায়িকার আগমন হয়নি বলে মনে হচ্ছে। একটি নতুন মুখও এ সভায় দেখছি না। ও-হোঃ! একটা কথা মনে পড়েছে। এ শহরে লুঠতরাজ খুব বেড়ে গেছে। বাড়ির মধ্য থেকে মেয়েদের সব ধরে নিয়ে যাচ্ছে। আমি শুনেছি, আমার অন্তঃপুরের জন্য আনা একটি মেয়েকে কোন সংঘের লোকেরা নিয়ে পালিয়েছে। পীথল, আমার হাতে ক্ষমতা এলেই এসবের ব্যবস্থা করতে হবে।'

পীথল বললেন, 'তাই নাকি! আপনার অন্তঃপুর থেকেও অপহরণ শুরু হয়ে গেছে? তা হলে তো সাহসের সীমা ছাড়িয়ে গেছে!'

দানিয়াল বললেন, 'না না! এতটা ধৃষ্টতা দেখানো হয়নি। কাশিম বেগ আমার অন্দরমহলের জন্য একটি মেয়ে এনেছিল, তার কথা।'

নাসির খাঁ বললেন, 'কে অপহরণ করেছে?'

দানিয়াল বললেন, 'তা তো কেউ জানেনা। কাশিম বেগ বলছিল যে মেয়েদের ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে অর্থ উপার্জনকারী একটি চক্র রাজধানীতে আছে। আব্বাজান খুবই নরম পদ্ধতিতে কাজ করেন।

আমার হাতে অধিকার এলে তাদের একটিকেও ছাড়বো না। কী বল ?'

পীথল বললেন, তা নয় ত কী ? এই ধরনের অত্যাচারীদের খুঁজে বের করে সাজা দেওয়া দরকার। আপনার ইচ্ছা মত সবই হবে।'

গুল-আনারার নৃত্য তখনও চলছিল। এত সুন্দর নৃত্য-গীত দলপতি সিংহ কখনও দেখেনি। সেই জন্য সে মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। গুলআনারা তার গানের চেয়েও মাধুর্য পূর্ণ অধর, মন্তের আরুণিমা হতে অরুণতর কাপোল, মীন-চঞ্চল নয়ন যুগল, নূপুরধ্বনি দ্বারা কবিতা-রস-ক্ষরা চরণদ্বয়, হীরক দ্যুতি প্রক্ষেপক চন্দ্রকলাপ্রভ মৃদু হাসি এবং চটুল-নীল ভ্রূকুটির দ্বারা দর্শকবৃন্দের হৃদয় হরণে নিরত ছিল। নৃত্যানুগ-রসগ্রাহী আঁখিদুটি, তালের সঙ্গে নৃত্যরত কুচ-কুম্ভ-যুগল, শব্দার্থ বোধক বিশিষ্ট অভিনয় স্বপ্নমায়া সৃষ্টিকারী নূপুর ধ্বনি এবং গানের মাধুরী আস্বাদন করতে করতে দলপতি সিংহের মনে হচ্ছিল যে সে বোধ হয় স্বর্গের দেবসভার উর্বশী মেনকা আদি অপ্সরাদেরই দেখছে। গুল-আনারারও নির্নিমেষ নয়ন ঐ যুবককে দেখে নিল। এই ধরনের সুব্যক্ত অভিনন্দন রাজসভাগুলিতে দুষ্প্রাপ্য বস্তু ছিল। সেই জন্য তার মনোযোগ এই যুবকের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল। গানের মাঝেই সে দু-তিনবার তার দিকে দৃষ্টি পাত করল এবং গানের দু-একটি কলি তাকে লক্ষ্য করে বর্ষণ করলো। অনুসন্ধিৎসু দর্শকদের প্রতি পক্ষপাতীত্ব দেখানোর এই রীতি নর্তকীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

কথা বলতে বলতে গুলআনারাও সভাসদদের প্রতি দৃষ্টিদানকারী বাদশাহ আর এই ভাবকে অনুধাবন করতে পারলেন। তিনি প্রশ্ন করলেন 'গুল আনারা কাকে লক্ষ্য করে এই ভঙ্গিমা প্রকাশ করল ? আমি তো শুনেছি এই নর্তকী খুব দাম্ভিক।'

রাজা পীথলও এই সমস্ত লক্ষ্য করছিলেন। কিন্তু তিনি এমন ভাব দেখিয়ে চারদিক চেয়ে দেখলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। নাসির-খাঁর উত্তর এলো, 'ওই যুবক রাজা পীথলের অনুচর। কাশিম বেগ বলেছিল, 'বেশ ক্ষমতাবান ও সুযোগ্য রাজকুমার।'

পীথল বললেন, 'ও হচ্ছে রামগড়ের স্বর্গীয় রাজার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং

আমার বাহিনীর একজন যোগ্য উপনায়ক। এই চার-পাঁচ দিন মাত্র হলো রাজধানীতে এসেছে। দরবারে এসে আপনার দর্শন লাভের সুযোগ ওর হয়নি বলে আজ ওকে এখানে নিয়ে এসেছি।' দানিয়াল বললেন, 'ভালই করেছেন। এদিকে একবার ডাকুন না। খুব রসজ্ঞ মনে হচ্ছে।'

পীথল সঙ্কেতে দলপতি সিংকে কাছে ডাকলেন। তিনি দানিয়াল-শাহের কাছে এসে রীতি অনুযায়ী অভিবাদন করলেন।

দানিয়াল জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি এখানে নতুন এসেছ ?'

'চার পাঁচ দিন হয়েছে হুজুর। আজ পর্যন্ত আপনার সেবায় হাজির হতে পারিনি। এই অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

'না-না তাতে কী হয়েছে! তুমি তো পীথলের কাজে রয়েছ। আমাদের মধ্যে এমনই বন্ধুত্ব যে তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া আমার সঙ্গে দেখা হওয়ারই সমান।' এই সম্মান সূচক কথাগুলির সমর্থন করে পীথল মাথা নাড়লেন।

দলপতি সিংহ বললেন, 'আপনার অনুগ্রহ।'

দানিয়াল শাহ বললেন, 'এখানেই বসো। সমর্থ এবং উপযুক্ত লোকের অভাব বোধ করি। যখনই সম্ভব হবে, দরবারে এসো।'

পীথল বললেন, 'একথা আমি আগেই বলে দিয়েছি। আপনার আদেশ মত সেবায় হাজির হওয়ার জন্য আমার অনুচরদের কাউকে বিশেষ অনুরোধের প্রয়োজন নেই।'

দানিয়াল শাহ বললেন, 'শাবাশ পীথল! আপনার স্নেহের কথা আমি জানি। আমাদের সবার পক্ষে এবং বিশেষ করে সাম্রাজ্যের পক্ষে এই মনোভাব খুবই হিতকারী হবে।'

এই কথায় নাসির খাঁও তাঁর সম্মতি জানালেন। ততক্ষণে গুল-আনারার নৃত্যের সমাপ্তি হয়েছে। এই বার কাকে অনুমতি দেওয়া যায় তা জানার জন্য কাশিম বেগ এসে হাজির হলো। আদেশ হলো, 'একজন কাউকে গান করতে বলো।'

হীরাজানের প্রতি নিজের পক্ষপাতিত্ব প্রকাশের এই সুবর্ণ সুযোগ বুঝে কাশিম বেগ ঘোষণা করলো যে এবার হীরাজানের গান হবে। গুলআনার স্বস্থানে ফিরে এলো। নিজের অবশ্যম্ভাবী জয় লাভের কথা

ভাবতে ভাবতে শৃঙ্গারময় লজ্জার অভিনয়ের সঙ্গে সহজ ভঙ্গীতে হীরাজান কক্ষের মধ্যস্থলে এসে পৌঁছল। রাজ প্রাসাদে বহু দিন তার গান হয়নি বলে অনেকে তার গানের প্রতি উৎসুক ছিল তবলচী এবং বাদ্য-কাররা এসে প্রস্তুত হতেই দানিয়াল শাহ নাসির খাঁকে দেখে বললেন, আরে! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম! আপনাদের দুজনের সঙ্গে কিছু দরকারি কথা আছে। কোন্ কথা তা বলা নিষ্প্রয়োজন, আপনারা জানেন। আসুন পাশের ঘরে যাওয়া যাক।' তিনি আসন ত্যাগ করে 'সব চলতে থাকুক' এই কথা বলতে বলতে নাসির খাঁ এবং রাজা পীথল সমভিব্যাহারে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

হীরাজানের দুঃখের সীমা ছিল না। আগ্রার তামাম গণিকার সামনে শাহজাদা তাকে অপমানিত করলেন এটাই সে ধরে নিল! আর এর মূলে রয়েছে কাশিম বেগ। এই কথা চিন্তা করে সে ক্রোধে আরক্ত হলো। কিন্তু শাহজাদার প্রকৃত পক্ষে কোন অপরাধ ছিল না। তাঁর একমাত্র অপরাধ যে ললিতকলার মধ্যে তিনি রস পেতেন না। কাশিম বেগের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে হীরাজান শাহজাদার কল্যাণে খ্যাতিও ঐশ্বর্যবৃদ্ধির বিরাট স্বপ্ন দেখেছিল হীরাজান। আর সমস্ত কল্পনাই এই পথে অগ্রসর হচ্ছিল। তার আকাঙ্খার দুর্গ যখন এইভাবে ধূলিসাৎ হলো তখন তার ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক ছিল।

কাশিম বেগের অভিসন্ধির কিছুটা ইব্রাহিম বেগ আঁচ করে নিয়েছিল। সে ঠাট্টা করে বলল, 'কী হীরা! গাইছ না যে? তোমার গান শোনার জন্য সবাই উৎসুক হয়ে রয়েছে।' কথাটা যে ভাবেই বলা হোক এড়িয়ে যাওয়ার উপায় ছিল না। এদিকে কিন্তু শাহজাদার অনুপস্থিতির সুযোগে আমীর ওমরাহরা নিজ নিজ প্রিয় বারাঙ্গনার সঙ্গে প্রেমালাপে মগ্ন হয়ে পড়ায় হীরার গান শোনার দিকে কারো খেয়াল রইল না। সুযোগ পেয়ে গুল আনারা হাসিমুখে দলপতি সিংহের কাছে এলো। সে প্রশ্ন করল, 'আপনি আগ্রায় নতুন এসেছেন নাকি? এর আগে তো কখনো দেখিনি।'

দলপতি সিংহ খুব সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেও নির্বাক থাকা অনুচিত

ভেবে যথোচিত উত্তর দিলেন। দানিয়াল শাহের পাশে তাকে উপবিষ্ট দেখে গুল আনারা অনুমান করেছিল যে যুবকটি উচ্চবংশসম্ভূত এবং উচ্চ পদাধিকারী হবে। সেইজন্য তার সঙ্গে পরিচয়ের পরিধি বাড়ানোর জন্য সে আরও কথা বলতে চেষ্টা করল। আদবকায়দা দুরস্ত রাজনর্তকী দলপতি সিংহের উত্তর থেকে সব কিছু বুঝে নিল।

আরও এক ঘন্টা সব কিছু চলল। শাহজাদা অন্তঃপুরে প্রস্থান করলে অন্যান্যরাও যে যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করল। শাহজাদার কাছ থেকে পীথলের ফিরতে বিলম্ব হওয়ায় দলপতি সিংহকেও অপেক্ষা করতে হলো। সে বুঝতেই পারেনি যে কোন এক অজুহাতে গুল আনারা বাইরে তার পথ চেয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ভারতের বাদশাহ জালালুদ্দিন আকবর যে দক্ষিণাপথের দিকে যাত্রা করবেন, নির্দিষ্ট দিনটি নিকটবর্তী হতে হতে, সে খবর সমগ্র দেশে রাষ্ট্র হয়ে গেল। লোক এও জানল যে বাদশাহ ফিরে না আসা পর্যন্ত রাজধানীর কার্যভার সমিতির উপর, শাহজাদা দানিয়াল শাহও যার অন্তর্ভুক্ত, ন্যস্ত থাকবে। এই সমিতির সদস্য যে কে এবং কার উপর কোন্ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সে কথা কারো জানা ছিল না। কিন্তু সেলিমের উত্তরাধিকার যে বাদশাহ বাতিল করে দিয়েছেন এ বিষয়ে কারো সন্দেহ রইল না। এর বড় প্রমাণ হচ্ছে রাজধানীতে ডেকে আনার বদলে রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে সংঘর্ষের অজুহাতে তাকে আজমীরেই থাকার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। যদিও আগ্রা আজমীর থেকে খুব বেশি দূরে নয় তবু রাজধানী যদি দানিয়ালের হাতে থাকে তা হলে সেলিম কী করতে পারেন? আর লোকেরা এও জানতো যে বাদশাহের প্রিয় পাত্র মুবারক এবং আবুল ফজল প্রভৃতি সেলিমের শত্রু ছিলেন। এই সমস্ত কারণে সকলেই অনুমান করল যে ভাবী বাদশাহ হচ্ছেন দানিয়াল শাহ। যাত্রার দিন সমাগত হলে বাদশাহ এই অভিযানের পক্ষপাতী নন বলে মনে হতে লাগল। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে তাঁর বয়স হয়েছিল ষাটের কাছাকাছি। এত দীর্ঘকালব্যাপী অভিযানের শেষে তার প্রত্যাবর্তন অসম্ভবও হতে পারে। দ্বিতীয়ত তাঁর গুরু শেখ মুবারক

রোগে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন। তৃতীয়ত উত্তরাধিকারের গুরুত্ব পূর্ণ প্রশ্নটিও তাঁর কাছে একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেই কারণে যাওয়ার ব্যাপারটা অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছিল। সমস্যা কণ্টকিত ঐ দিনগুলিতে রাজা পীথল বেশির ভাগ সময় বাদশাহের কাছেই থাকতেন। 'রাজসভায় মৃগয়াগৃহে অথবা শাস্ত্রচর্চায় পীথলকে আমার কাছে থাকতেই হবে।' এই ছিল বাদশাহের সুস্পষ্ট আদেশ। এই অবস্থায় দলপতি সিংহও অন্য কাজ করার সময় পেলেন।

দু তিন হপ্তা তিনি এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়েছিলেন। নির্বান্ধব একাকীত্বে সময় অতিবাহিত করার ফলে ঐ যুবকের পক্ষে বয়সানুরূপ চিন্তাবৈকল্যের কবলে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। হপ্তা-তিনেক আগে শেঠজীর গৃহে দেখা সুকুমার ছবিটি তাঁর হৃদয় অধিকার করেছিল। তার পর অনেকবারই শেঠজীর ভবনে যাওয়ার এবং সূরজ-মোহিনীর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন। যেদিন থেকে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন সেইদিন থেকেই ঐ বালিকা তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও দাদুর কাছে আসা যাওয়া করত। কোন ধর্মীয় অথবা সামাজিক প্রসঙ্গে আলোচনা হলে সে ধীরে ধীরে এসে তাদের আলোচনায় অংশ গ্রহণ করত। শেঠজীও এ ব্যাপারে কোন রকম বাধা দেননি। একথাও তাঁর কাছে গোপন ছিলনা যে সূরজমোহিনী যুবকটিকে দেখতে এবং তার সঙ্গে কথা বলতে উৎসুক থাকে।

দলপতি সিংহের মনে ঐ মেয়েটির প্রতি আকর্ষণ বেড়েই চলল। তিনি এমন পর্যন্ত ভাবতে শুরু করলেন যে কন্যাটি যদি বৈশ্যজাতি সম্ভূত হয় তা হলে নিজে রাজ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তাকে বিবাহ করলে কোন দোষের হবে না। অনুলোমবিবাহও রাজপুত্রদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এই বিবাহের ফলে যে সন্তান হয় সে সন্তান রাজ্যাধিকার পায় না কিন্তু নিজের পিতৃব্যের বংশধরদেরই, রামগড়ের উত্তরাধিকারী বলে, যে দলপতি মনে করেন তাঁর এবিষয়ে এত চিন্তার কী থাকতে পারে? এ বিষয়ে দুঃখ বোধ করার তাঁর আবশ্যকতাই ছিল না। এখন তিনি ভাবতে লাগলেন যে কন্যাটির হৃদয়ে তাঁর প্রতি অনুরাগ কি নেই? নিভৃতে সাক্ষাৎ না হলে

এ সন্দেহ নিরসন করা যায় না। সুতরাং স্বল্পকালের পরিচয়ের পরিধিতে যে যে ঘটনা ঘটেছে সেগুলি নিয়ে তিনি মনে মনে পর্যালোচনা করতে লাগলেন। তার প্রতিটি শব্দ ও ভাবের উপর নিজের চিন্তার দৃষ্টিটা বার দুয়েক সুক্ষ্মভাবে বুলিয়ে নিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তেই পৌছলেন যে সুরজমোহিনীও তাঁকে ভালবাসে। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ভবিষ্যতে কী করা উচিত সেই কথা তিনি ভাবতে লাগলেন। সোজাসুজি শেঠজীর কাছে একথা পাড়া তাঁর ঠিক মনে হলো না। সেই জন্য সব কথা রাজা পীথলকে বলবেন স্থির করলেন। রাজা তাঁর সব কথা মনোযোগ সহকারে শুনলেন কিন্তু কিছু বললেন না।

দুদিন পরে দলপতি সিংহ যখন শেঠজীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন তখন শেঠজী নিজেই ঐ বিষয়ে কথা তুললেন। তিনি বললেন, 'মোহিনীর বিষয়ে আপনার ইচ্ছার কথা আমি জেনেছি। আপুনি রাজপুতবংশজ এবং একটি রাজ্যের উত্তরাধিকারীও। এই অবস্থায় বৈশ্য বংশীয় একটি কন্যাকে কী করে বিয়ে করবেন?'

'আমি রাজপুত্র ঠিকই,' দলপতিসিংহ বললেন, 'কিন্তু কোনরাজ্যের উত্তাধিকারী নই। আমার পিতার শেষ ইচ্ছার কথা আমি আপনাকে বলেছি। পিতৃব্য বংশের একটি শিশুও যে পর্যন্ত বেঁচে থাকবে রামগড় রাজ্যের উপর সে পর্যন্ত কোন অধিকারই আমার থাকতে পারে না।'

'বেশ, কিন্তু আপনার পিতৃব্য, তাঁর পুত্রেরা অথবা তাঁদের কোন সন্তান যদি না থাকে তাহলে তো রাজ্য আপনার হাতেই আসবে।'

'সে অবস্থায় আমাকেই রাজ্য শাসন করতে হবে। কিন্তু বাদশাহের প্রতিনিধিরা, আমার ভাইকে রাজ্যটি দিয়েছেন।'

'অর্থাৎ, এর সঙ্গে বিবাহ করার জন্য আপনি রাজ্যের অধিকারও ছাড়তে রাজী আছেন?'

'যে বস্তু আমার নয়, তা ছাড়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর রাজ্য ছাড়ার যদি প্রয়োজন হয় তো তার জন্যও আমি প্রস্তুত।'

'এই ধরনের ব্যাপারে অনেক ভেবেচিন্তে প্রতিজ্ঞা করতে হয়। আমি বলেছিলাম, আপনার পিতৃব্যের সব কথাই আমি জানি।

এই অবস্থায় রামগড় রাজ্যের উত্তরাধিকারী হচ্ছেন আপনি। এতবড় একটা সুযোগ এই ধরনের একটা ক্ষুদ্র মোহে পড়ে ছেড়ে দেওয়া কি উচিত হবে ? সেটা কি আপনার বংশের উপযুক্ত কাজ হবে ?'

'এ বিষয়ে আমি চিন্তা করেছি। আমার পিতৃব্য ছিলেন রাজর্ষি। প্রজারা তাঁকে দেবতা বলে মনে করতো। তিনি ভ্রাতৃহত্যা অনুচিত ভেবে নিজের মহত্ত্বের জন্যই রাজ্য ত্যাগ করাই শ্রেয় ভেবেছিলেন। আর মোগলদের অধীনে কি-ইবা রাজ্য আর কে-বা রাজা ! এখানে বাদশার দাস, ওখানে বাদশার দাসেদের দাস। এই ধরনের রাজমুকুট আমার ছোট ভাইয়ের পক্ষেই মঙ্গল কর—এই আমার ধারণা। এর মনে রাজ্য গ্রহণ বা ত্যাগের কোন চিন্তা নেই।'

শেঠজী এই কথার কোন উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেলেন না। তার আগেই সূরজমোহিনী ঐ কক্ষে এসে পড়লো। ফলে প্রসঙ্গটি সেদিনের মত চাপা রইল। অল্পক্ষণ পরেই মোহিনীর দিদিমাও সেখানে এসে গেলেন। তাঁর আগ্রহে দলপতি সিংহ সেদিন ওখানে তাঁদের সঙ্গেই ভোজন পর্ব সমাধা করলেন।

যুবকটির হৃদয় এই রকম একটি স্থানেই কেন্দ্রীভূত হলো। কিন্তু তার প্রেমের স্থায়ীত্বের পরীক্ষা সম্বন্ধীয় অনেকগুলি প্রসঙ্গও উপস্থিত হলো। কাশিম বেগের কবল থেকে যে মেয়েটিকে তিনি উদ্ধার করেছিলেন তার প্রসঙ্গটাই এলো সবার আগে। সেদিন রাত্রের অন্ধকারে মেয়েটিকে তিনি নিজের চোখে দেখেনও নি। তাকে বাঁচানোর তাগিদ থেকেই তখন ভৃত্যদের হুকুম দিয়েছিলেন তাকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। যখন তিনি বাড়ি ফিরলেন তখন মেয়েটি ঘুমিয়ে পড়ে ছিল। দ্বিতীয় দিন সুচেত যখন এসে জিজ্ঞেস করল যে তাকে নিয়ে কি করা যায় তখনই মাত্র মেয়েটির কথা তার মাথায় এলো। তিনি তাকে তাঁর কাছে আনিয়ে দেখলেন, মেয়েটির বয়স হবে প্রায় চোদ্দ বছর। রক্ষা কর্তাকে দেখে সে তাঁর পদতলে পড়ে কাঁদতে লাগল। তাকে কোন রকমে শান্ত করে তিনি আস্তে আস্তে তার পরিচয় নেওয়ার চেষ্টা করলেন। তার কাছ থেকে গজরাজের করুণ কাহিনী, রাজপুত বেশি সেই যুবকের আগমন, বিবাহের কথা দিয়ে

সিংহের বিয়ের কথাবার্তা চলছে। মহারাজাদের এবং অভিজাতদের মধ্যে বহু পত্নীত্বের প্রথা প্রচলিত থাকায় এ ব্যাপারে সে অসন্তুষ্ট হয়নি।

দলপতি সিংহের চিত্তচাঞ্চল্য ঘটানোর মত আরও একটি ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটেছিল। দানিয়াল শাহের মহলে তাঁকে দেখার দিন থেকেই গুল আনারা তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। চার-পাঁচ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন তিনি গেলেন না এবং কোন সংবাদও দিলেন না তখন গুল আনারা স্বয়ং নিজ দূতীকে তাঁর কাছে পাঠালো। দূতীটি যখন এলো দলপতি সিংহ তখন বাড়িতে ছিলেন না। সেই জন্য সুচেত তাকে ভিতরে এসে অপেক্ষা করার অনুমতি দিল। কোন কার্যোপলক্ষ্যে এক বৃদ্ধাকে তার প্রভুর কাছে আসতে দেখে ভৃত্যটি তাঁর মহত্ত্ব ও পদমর্যাদার কথা অসঙ্কোচে বর্ণনা করল। এই কথাবার্তার মধ্য দিয়ে বৃদ্ধা জানতে পারল যে দলপতি সিংহের মন কোন এক বড় শেঠের কন্যার প্রতি আসক্ত এবং তাদের বিয়ে শীঘ্রই হবে।

বৃদ্ধা বলল, 'ভাল ? এই রকম ঘটনা ? আমার মালিক তাঁর জন্য প্রাণ দিচ্ছেন আর তিনি এক শেঠের মেয়েকে বিয়ে করবেন ? শেঠের পয়সা দেখেছেন বোধ হয় ?'

সুচেত গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল, 'রামগড়ের রাজারা অর্থলোভী ? এমন কথা কেউ শুনেছে ? তোমার মালিক কত বড় শুনি ?'

'সারাভারতে এমন লোক কে আছে যে আমার মালিককে চেনে না ? গুল আনারা, জানতো বড় বড় রাজামহারাজাদেরও স্বপ্নের অপ্সরী। তাঁর একটু মৃদুহাসির বিনিময়ে সবকিছু ত্যাগ করার জন্য শাহজাদারা প্রস্তুত থাকেন। ঐশ্বর্যেও আজ তাঁর চেয়ে বড় কে আছে ? স্বর্গীয় শাহজাদা মুরাদ একদিন গান করার জন্য তাঁকে পাঁচ লাখ টাকার চেয়েও বেশি মূল্যের হার পুরস্কার দিয়েছিলেন। আমি নিজের চোখে দেখেছিলাম। আরও কত বলব ? এই রকম মহাশক্তিমতীর প্রেম যে এই রাজকুমারের উপর ন্যস্ত হয়েছে তা এঁর মহাভাগ্যের কথা। দূতীর এই সব কথা শুনে সুচেত তার প্রতি খুব যত্নশীল হয়ে উঠলো। সেকালে মুসলমানরা গণিকাদের সমাজচ্যুত মনে করতো না। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজঅন্তঃপুর আলো

করে থাকতো। এই ধরনের এক দাসীপুত্র ছিলেন শাহজাদা দানিয়াল। রাজপুতদের মধ্যেও এদের সমাদর ছিল। সুতরাং আবাল্য আগ্রার অধিবাসী সুচেত যদি গুল আনারাকে একজন প্রভাবশালী মহিলা এবং দূতীকে অসাধারণ একজন অতিথি বলে মনে করে থাকে তাহলে তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে?

সুচেত বলল, 'মা, পান খান। আরাম করে বসুন। মহারাজ এখনই এলেন বলে। গুল আনারা বেগমের ভালবাসা এঁর প্রতি হয়েছে এটাতো সৌভাগ্যেরই কথা। ইনিও যোগ্য এবং সুন্দর মানুষ।'

দূতী উত্তর দিল, 'তুমি যদি এঁকে আমাদের ওখানে পৌঁছে দাও তাহলে আমার কর্ত্রী তোমাকে দামী পুরস্কার দেবেন।'

'উঁ হুঁ! আমি আমার প্রভুকে একথা কি করে বলব?'

'আরে, রাখো! উনি যদি অতবড় রামচন্দ্র হন তবে এই মাত্র এখান থেকে যে মেয়েটি গেল, সে কে?'

'বাঃ রে! ওতো পথে কুড়িয়ে পাওয়া একটি মেয়ে। তিনি ওকে পালন করছেন। আপনি যা মনে করছেন তা নয়।'

এই সব কথাবার্তার মধ্যেই দলপতি সিংহ এসে গেলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর উপহার হিসাবে আনীত হস্তিদন্ত নির্মিত পেটিকায় রক্ষিত ও সুগন্ধলিপ্ত একটি সুবৃহৎ স্ফটিক তাঁর সামনে রেখে বৃদ্ধা তার আগমনের উদ্দেশ্য জানালো। রাজপুরীতে এবং খ্যাতিমান অভিজাত-বর্গের মধ্যে গুল আনারার সমাদরের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করে সেই দূতী বলল যে সমস্ত কিছুকেই অসার মনে করে তার মালিক দলপতি সিংহের মত অখ্যাত এক যুবককে তাঁর প্রেম নিবেদন করেছেন। তার এই প্রেম অমর। হৃদয়ের নির্মলতার পরিচয় এতে পাওয়া যায়।

দানিয়াল শাহের দরবারের সেই দৃশ্যের কথা দলপতি সিংহ তখনও বিস্মৃত হননি। নীলোৎপলনয়ন, নৃত্যশ্রমজাত স্বেদবিন্দুমাখা শিশিরস্নাত আরক্তিম পুষ্পের মত তার শ্রীমুখ, নৃত্যের মধ্যদিয়ে আলিঙ্গনে আকুতির ভাব প্রকাশক তার মৃণাল সদৃশ বাহুলতা এবং কলা সমৃদ্ধ তার ভঙ্গিমা প্রভৃতির মোহময় প্রভাব তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল। বৃদ্ধার

বাকচাতুর্য সেই স্মৃতিকে উজ্জীবিত করে দিল। মুখমণ্ডলের প্রতিফলিত মনোভাব বুঝতে পেরে দূতী বলতে থাকলো, 'মহারাজ, আমার মালিক স্বগৃহে বড় বড় অভিজাত পুরুষদের আমন্ত্রণ করে একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতে ইচ্ছুক। সম্রাটের অনুমতিক্রমে তাঁর বিজয় কামনায় অনুষ্ঠানটি করা হবে। আপনিও সেখানে পদার্পণ করে তাঁর আতিথ্য স্বীকার করুন এই তাঁর প্রার্থনা। এখন সবই আপনার ইচ্ছা।'

খারাপ কিছু নেই দেখে দলপতি সিংহ ঐ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

দূতীকে সম্মানের সঙ্গে বিদায় দিয়ে ঘরে ফিরতেই কার যেন কান্নার আওয়াজ তাঁর কানে এলো। অনুমানে তিনি বুঝলেন পদ্মিনী কাঁদছে। কারণ জানার জন্য তিনি গুলাবকে পাঠালেন কিন্তু তার অসফল হয়ে ফিরে আসার পর তিনি পদ্মিনীকে ডেকে পাঠালেন। তাঁকেও যখন সে কিছু বলল না তখন ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে তিনি অন্য কাজে মন দিলেন। বাদশাহ আকবরের দিগ্বিজয় যাত্রার খবর আজমীরে সেলিমের কাছে দ্বিতীয় দিনেই পৌঁছে গেল।

যেদিন যাত্রার কথা ঠিক হয়েছে সেই দিন থেকেই প্রত্যেক দিনের খবর শাহজাদাকে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বহু জনই উৎসুক ছিল। সেলিম এ-ও জানতেন যে বাদশাহের আগ্রা ত্যাগের পর রাজধানীর শাসন কার্য দানিয়ালের পক্ষভুক্ত লোকদের হস্তগত হবে। তিনি এটাও ভেবে করেছিলেন যে যদি বাদশাহ ঐ ধরনের কাজই করেন তাহলে তার অর্থ দাঁড়াবে যে তিনি উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেলেছেন। সমস্ত কিছু জানার পরও তিনি কোন হতাশা বা দুঃখ প্রকাশ করলেন না। দুঃসাহসী ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ বলল যে সেলিম রাজধানী দখল করে বাদশাহের আদেশ লঙ্ঘন করে নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণা করবেন। কিন্তু এই বিশ্বাস কারো ছিল না যে মহাপ্রতাপশালী আকবরকে যুদ্ধে পরাজিত করার মত শক্তি অথবা ক্ষমতা তাঁর আছে। আর একথাও সকলেই জানত যে সেলিমের সাহায্যকারী হিসাবে নিযুক্ত সকলেই বাদশাহের পরম বিশ্বাস ভাজন লোক ছিলেন। শাবাস খাঁ কম্বু, শা কুলিখাঁ বহরাম এবং রাজা জগন্নাথ—এই তিন জনই ছিলেন তাঁর সহচর।

এঁদের মধ্যে প্রধান যিনি সেই শাবাস খাঁ যে বাদশাহের বিরুদ্ধে কিছু করবেন না একথা সর্বজনবিদিত ছিল।

এই সব কারণে অবস্থা প্রতিকূল বুঝেই বোধ হয় সেলিম শান্ত ছিলেন। আকবরের প্রস্থানের খবর যে দিন তিনি পেলেন সেই দিনই তিনি নিজের সেনাপতিদের ডেকে এনে বললেন, 'আপনারা জানেন, আমার পূজনীয় পিতৃদেব দক্ষিণাপথ জয়ের জন্য যাত্রা করেছেন। আমাদেরও এখন আর বিলম্ব করা উচিত নয়। রাণাপ্রতাপ সিংহকে পরাস্ত করার কঠিন দায়িত্ব তিনি আমাদের উপর দিয়েছেন। কিন্তু আমরা আমাদের কাজে এই মুহূর্তেই লাগতে পারছিনা। আমার দেওয়ান ভগবান দাস বলেছেন যে এত বড় অভিযানের উপযুক্ত অর্থ আমাদের কাছে নেই। তাঁর অভিমত এই যে হাতে কমপক্ষে এক কোটি টাকা না থাকলে এত বড় বাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনুচিত হবে। আমি কি ঠিক বলছি না ভগবানদাস ?'

রাজকোষের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ান সাহেব দিয়ে বললেন, 'আমাদের কাছে খুব টেনেটুনে ষাট লক্ষ টাকা হবে, এতে কাজ চলবে না।' যুক্তিপূর্ণ ভাবে তিনি তাঁর বক্তব্যকে বুঝিয়ে বললেন।

সেলিম বললেন, 'কিন্তু কাজ বাধাপ্রাপ্ত হোক এ কোন মতেই হতে দেওয়া যায় না। সেইজন্য রাজা জগন্নাথ নিজের ২৫০০০ সৈন্য নিয়ে অগ্রসর হতে থাকুন। রাজধানী থেকে অর্থ সাহায্য আসার সঙ্গে সঙ্গেই শাবাস খাঁ কম্বুর বাহিনী তাঁর সাহায্যার্থে যাত্রা করবে। কোষাধ্যক্ষ নাসির খাঁর কাছ থেকে টাকা আনার জন্য অবিলম্বে কাউকে পাঠানোই হচ্ছে প্রধান কাজ। এর জন্য শা কুলি খাঁ আগ্রা চলে যান। নাসির খাঁ, তাঁর বন্ধু হওয়ায় বিনা বাধায় কাজটা হয়ে যাবে।'

সকলে স্বীকার করল যে এ-সবই বিজ্ঞতাপূর্ণ বিবেচনা প্রসূত। শাবাস খাঁ এবং শা কুলি খাঁও সেলিমের বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। ছ মাস ধরে আজমীরে থাকায় ক্লান্ত শা কুলি খাঁর আগ্রা যাওয়ার প্রস্তাবটা খুব পছন্দ সই লাগলো। শুধু তাই নয়, তাঁর মনে হচ্ছিল যে সময়ের তালে তাল রেখে দানিয়াল শাহের প্রিয়পাত্র হওয়াও দরকার। সেলিম

যখন আগ্রা যাওয়ার আদেশ দিলেন ঠিক সেই সময় তিনিও কোন অজু-হাতে আগ্রা যাওয়ার মতলব করছিলেন। শা কুলি খাঁর অনুপস্থিতিতে সৈন্যবাহিনীর উপর তাঁর নিরঙ্কুশ অধিকারের কথা চিন্তা করে শাবাস খাঁও খুব খুশী হলেন। সৈন্যবাহিনীতে দুজনেরই সমান পদমর্যাদা ছিল। তাই গত ছ মাস ধরে তাঁদের মধ্যকার মনোমালিন্যও ক্রমবর্দ্ধমান ছিল। সেলিমও তাঁদের মধ্যে শত্রুতা বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করতেন।

এইভাবে পরস্পর বিরোধী কারণে সকলেই সেলিমের প্রস্তাব এক বাক্যে মেনে নিলেন। অবিলম্বে আদেশপত্র লিখে ফেলার জন্য দেওয়ানকে নির্দেশ দেওয়া হলো। প্রথম আদেশ হলো, 'এক ক্ষুদ্র অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে শা কুলি খাঁ আগ্রা যাত্রা করবেন। দেরি করবেন না। সন্ধ্যার পূর্বেই যাত্রা করবেন। অশ্বারোহণের সুবিধার ফলে আপনার দুদিনের মধ্যে ফিরে আসতে পারবেন।' এই কথা বলে সেলিম তখনই তাঁকে বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় আদেশ ছিল রাজা জগন্নাথের উদ্দেশ্যে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত বাহিনী নিয়ে গোপনে যাত্রা করার আদেশ তাঁকে দেওয়া হলো। হর্ষধ্বনির মাধ্যমে এই আদেশ সম্বর্ধিত হলো।

সভাভঙ্গ হওয়ার পরে সেলিম শাবাস খাঁকে কাছে ডেকে সস্নেহে বললেন, 'আব্বাজান যা-ই স্থির করুন না কেন, আমাকে উপলক্ষ্য করে রাজ্যে কোন রকম গোলমাল যাতে না হয় তাই আমি চাই। সেইজন্য যতশীঘ্র সম্ভব উদয়পুর দখলে আনা আমাদের চাই-ই। অর্থ পাওয়া মাত্র রওনা হওয়ার ব্যবস্থা আপনি করে ফেলুন।' শাবাস খাঁ উত্তর দিলেন, 'আমারও ইচ্ছা তা-ই। আপনি অবশ্যই জয়লাভ করবেন।'

সেলিম বললেন, 'জয়পরাজয় তো যথা সময়ে বোঝা যাবে। যাই হোক, শা কুলি খাঁ ফিরে না আসা পর্যন্ত শিকার করে সময় কাটাবো ঠিক করেছি। শুনলাম, এখান থেকে তিরিশ চল্লিশ মাইল দূরে পাঁচ-ছটি বাঘ দেখা দিয়েছে। ওখানে শিকারের প্রস্তুতিও চলছে। সেজন্য আমি ওখানে মোটামুটি হপ্তা খানেক থাকবো। সঙ্গে বেশি লোকজন নেওয়া অনুচিত হবে। পঞ্চাশজন ঘোড়সওয়ার সৈনিক, অমরসিংহ

এবং দিলেরজঙ্গ আমার সাথী হবে। আমি ফিরেই যেন সৈন্যবাহিনীকে যাত্রার জন্য প্রস্তুত পাই। শা কুলি খাঁ না আসা পর্যন্ত আপনাকে সাহায্য করার জন্য আমি ভগবান দাসকে নিযুক্ত করছি।'

শাবাস খাঁ বললেন, 'যথা আজ্ঞা! কিন্তু মাত্র পঞ্চাশজনকে সঙ্গে নেওয়া যথেষ্ট নয়। কমপক্ষে দেড়শো জনকে সঙ্গে নেওয়া উচিত।'

সেলিম বললেন, 'কেন? মেয়েরা তো এখানেই থাকবে। এই অবস্থায় যথাসম্ভব কম লোককে সঙ্গে নেওয়াই তো ঠিক হবে।' যুক্তিটা শাবাস খাঁকে মানতে হলো। সমস্ত ব্যবস্থা যথা সম্ভব সত্বর পূর্ণ হলো। সন্ধ্যার আগেই শা কুলি খাঁ আগ্রার পথে রওনা হলেন। কোন মতে আগ্রা পৌঁছবার আগ্রহে তিনি আজ্ঞানুযায়ী অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। রাজা জগন্নাথ পঁচিশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং প্রয়োজনী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে যাত্রা করলেন। নৈশ ভোজ সমাধা করে সেলিমও পঞ্চাশজন অশ্বারোহী নিয়ে বেশ আরামে বিদায় নিলেন।

বাদশাহ চলে যাওয়ার পর তাঁর যে ফর্মান প্রকাশিত হলো তার ফলে অনেক ক্ষেত্রে এক ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হলো। জন সাধারণ নিঃসন্দেহ ছিল যে সিংহাসনের অধিকারী হবেন দানিয়াল শাহ। কিন্তু যখন জানা গেল যে তাঁকে শুধুমাত্র অন্তঃপুর ও রাজ প্রাসাদের রক্ষার দায়িত্বের অতিরিক্ত বাদশাহের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অন্য কোননিযুক্ত করা হয়নি তখন দানিয়াল শাহের সমর্থক নিরাশ হয়ে পড়লো। বাদশাহের রাজধানী ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতিপত্তি প্রদর্শনের জন্য যাঁরা তৈরী হয়ে বসেছিলেন, কার্য বন্টনের এই পদ্ধতি তাঁদের পছন্দ হলো না। রাজ কোষের দায়িত্ব লাভ করলেন নাসির খাঁ। তিনি ছিলেন সেনাদলের কর্তৃত্বাভিলাষী। এই দায়িত্ব তাঁর কাছে ভারস্বরূপ মনে হলো। রাজধানী রইল প্রকৃত পক্ষে রাজা পীথলের দখলে। দুর্গের রক্ষা এবং রাজধানীর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য পৃথকীকৃত সমগ্র রাজপুত সৈন্যবাহিনী তাঁকে শক্তিশালী করে তুলল।

যাওয়ার আগেই বাদশাহ যে রাজা পীথলকে ডেকে বিশেষ আদেশ দিয়েছিলেন একথা সকলে জানত। কিন্তু ঐ আদেশ কী ছিল এবং

কিসের জন্য ছিল, বিভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে তা অনুমান করেছিল মাত্র। প্রকৃতপক্ষে আদেশ ছিল এই ধরনের : 'আগ্রা দুর্গে কারও সেনাবাহিনী প্রবেশ করতে দেবে না। ভিতরে অথবা বাইরে থেকে যদি কেউ বল প্রয়োগের চেষ্টা করে তাহলে যুদ্ধ করে রাজধানী রক্ষা করবে। কারো নিয়োগই রাজ প্রতিনিধি হিসাবে নয়। সন্দেহজনক বিষয়ে লোক পাঠিয়ে আমার অনুমতি নেবে। আমি না ফেরা পর্যন্ত রাজধানীতে যাতে কোন গোলযোগ না হয় তার জন্য আবশ্য্য সব কিছুই নিজের দায়িত্বে করে নিতে হবে।'

পীথল বুঝে নিলেন উত্তরাধিকারের বিষয়ে বাদশাহ কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাননি। সেইজন্য তাঁর যাত্রার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাপতিত্বের অধিকারে তিনি একটি ঘোষণা জারি করলেন যে অন্য আদেশ প্রচার না করা পর্যন্ত পঁচিশ জনের বেশি সশস্ত্র ব্যক্তি দুর্গে প্রবেশ করতে পারবে না। সামন্ত ও প্রধানেরা দুর্গে প্রবেশের পূর্বে তাঁদের সশস্ত্র অনুচরদের জন্য অনুমতি পত্র সংগ্রহ করে নেবেন। এই ঘোষণার কথা শুনে নাসির খাঁ প্রমুখ দানিয়ালের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা ভেবে ছিলেন যে বাদশাহ বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা তাঁদের সৈন্য দিয়ে রাজধানী ছেয়ে ফেলবেন এবং তারপর রাজা পীথল যদি তাঁদের সহযোগী না হন তাহলে বলপ্রয়োগ করে তাঁকে স্থানচ্যুত করা হবে। পীথলের সতর্কতা ও দূরদৃষ্টি তাঁদের এই দুরভিসন্ধিকে ব্যর্থ করে ছিল। ঘোষণা প্রচারের পর সেনানায়কদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করে তিনি নাসির খাঁকে খবরটা দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। এসব ব্যবস্থা যে দানিয়াল শাহ এবং নাসির খাঁর মনঃপুত হবে না তা তিনি জানতেন। তিনি আবার একথাও জানতেন যে নিজেদের বিরোধিতার কথা প্রকাশ করার সাহসও তাঁদের হবেনা। সেইজন্য তাঁর কাজের ফলে ওঁরা যদি আতঙ্কিত হয়ে থাকেন তাহলে তা দূর করার উদ্দেশ্যেই তিনি সেখানে গেলেন।

পীথলকে দেখে বিরূপতার কোন আভাস না দিয়েই নাসির খাঁ তাঁকে স্বাগত জানালেন। পীথল দেখলেন যে রাজকার্যের বিষয়ে আলোচনা

করা সত্ত্বেও যখন তিনি ঐ ঘোষণাটি সম্পর্কে কিছু বললেন না তখন বাধ্য হয়েই তিনি কথাটা পাড়লেন। তিনি বললেন, 'আজ আমি একটা কড়া আদেশ জারি করেছি তা বোধ হয় আপনি শুনেছেন। ঐ আদেশের ফলে পঁচিশজনের বেশি সশস্ত্র লোকের দলবদ্ধ ভাবে দুর্গে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।'

নাসির খাঁ বললেন, 'আপনি ঠিক করেছেন।'

'আপনি আমার সঙ্গে একমত দেখে খুব আনন্দিত হলাম। কথা হচ্ছে এই যে শাহজাদা সেলিমের সঙ্গে আজমীরে মস্ত বড় একটি বাহিনী রয়েছে তা বাদশাহের আদেশ শোনার পর তাঁর সসৈন্যে এখানে হাজির হওয়ার রয়েছে।'

'কী? বাদশাহের বিরুদ্ধে?'

'কী করে বলব? শাহজাদা সাহসী ব্যক্তি। একটি শক্তিশালী সৈন্যদল তাঁর হাতে রয়েছে। তার উপর আবার সমস্ত মোল্লা-মৌলবীরা তাঁর পক্ষে রয়েছে। রাজা মান সিংহও সসৈন্যে আসতে পারেন। আমার অধীনে মাত্র পঁচিশ হাজার পদাতিক সৈন্য রয়েছে। দুর্গের বাইরের আক্রমণ ঠেকানোর পক্ষে এ সংখ্যা যথেষ্ট কিন্তু যুদ্ধ যদি ভিতরেও প্রসারিত হয় তাহলে খুব বড় সমস্যায় পড়তে হবে।'

এবার নাসির খাঁর মনে হলো যে তাঁর আশঙ্কা অমূলক এবং দানিয়াল শাহকে সাহায্য করাই পীথলের উদ্দেশ্য। কিন্তু তিনি বললেন, 'তবুও, বাদশাহের অনুপস্থিতিতে তাঁর প্রতিনিধি শাহজাদাকে জিজ্ঞেস করে নিয়ে এসব করলে ভাল করতেন।'

'আমি সেকথাও ভেবেছিলাম,' পীথল উত্তর দিলেন, 'কিন্তু যখন আমি বাদশাহকে বললাম তখন তিনি বললেন যে কম বয়সের জন্য শাহজাদার অভিজ্ঞতা তখনও কম সেই কারণে রাজধানী রক্ষার ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত হবে না।'

'তাই নাকি! এই রকম বললেন? দানিয়াল শাহের গুণাবলী তো বাদশাহের অজ্ঞাত নয়! তার উপর যথেষ্ট আস্থা রাখেন। এই কথাই বাদশাহ আমাকে বলেছিলেন।'

'মনে হচ্ছে, আমার কথায় আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি বোধ হয় মনে করছেন যে আমি আমার ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য এই বাহিনী তৈরী করেছি।'

'মহারাজ। একথা আমি কি বলতে পারি? কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে বাদশাহ সালামত আমাকে যা বলেছিলেন এবং আপনি যা বলেছেন, এ দুয়ের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য নেই। হয়ত আমিই ভুল বুঝেছি। সেলিম শাহকে বাদ দিয়ে যখন দানিয়াল শাহকেই তিনি নিজের প্রতিনিধি নির্বাচিত করেছেন তখন আমি কী করে স্বীকার করি যে বাদশাহ তাঁর বিচার ক্ষমতাকে তুচ্ছ মনে করেন?'

'একথাও আমি মহামান্য বাদশাহের কাছে নিবেদন করেছিলাম। তার উত্তরে একটি ফরমান লিখিয়ে দিয়েছেন।'

'সে ফরমানে কী আছে?'

'তার নকলটা আমি এনেছি, দেখুন।'

পকেট থেকে একটি কাগজ বের করে তিনি নাসির খাঁর হাতে দিলেন। সেটির সংক্ষিপ্তসার হল এই: 'যতদিন আমি দক্ষিণে থাকবো ততদিন পর্যন্ত রাজধানী রক্ষার সকল ব্যবস্থা এবং অধিকার আমি আমার বিশ্বাসভাজন ও বিশেষ স্নেহের পাত্র মহারাজা পৃথ্বী সিংহ রাঠোরের উপর অর্পণ করছি। পৃথ্বী সিংহের আদেশই আমার অনিবার্য আদেশ। তাকে মান্য করার জন্য আমি ফরমানের মাধ্যমে সবাইকে বাধ্য করছি। এই আদেশ অমান্যকারী রাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হলেও রাজদ্রোহী বলে বিবেচিত হবেন এবং তাঁদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হবে।'

ফরমানটি পাঠ করে নাসির খাঁ বিচলিত হয়ে পড়লেন। তিনি বললেন, 'বটে! বাদশাহ সালামতের অসীম বিশ্বাস ও কৃপা আপনার উপর রয়েছে। এর দ্বারা তিনি তো প্রকৃতপক্ষে সব অধিকারই আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। বাস্তবিক পক্ষে বাদশাহের প্রতিনিধি আপনিই। আমরা সবাই আপনার আজ্ঞাবহই রয়ে গেলাম। আপনার আদেশই বাদশাহের আদেশ হিসেবে মান্য করার কথা এতে রয়েছে।'

পীথল বললেন, 'সেই রকমই তো লেখা আছে। কিন্তু এ ক্ষমতা

আমি পেয়েছি তা আমি মনে করিনা। বাদশাহের অনুপস্থিতির সময় সব কাজ যথা নিয়মে চালু রাখাই আমার অভিপ্রেত।'

আন্তরিক হৃদ্যতার ভাব প্রকাশ করে তাঁরা পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু রাজা পীথল বুঝতে পারলেন যে এই পত্রটি তাঁর প্রতি নাসির খাঁর বিদ্বেষকে আরও বাড়িয়ে দিল। আর নাসির খাঁর মনের অবস্থা? দানিয়ালের রাজ্যাধিকার লাভের পর রাজা পীথলকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার যে মতলব তাঁর ছিল তা ফলবতী না হওয়ায় তিনি হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন এবং বাদশাহ পীথলের উপর যে আস্থা প্রকাশ করেছেন তার ফলে মর্যাদাহানী হওয়ায় তাঁর ক্রোধ আরও বেড়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন যে মুসলিম-ঐশ্বর্যের রক্ষণাবেক্ষণের ভার 'একটি কাফের কুত্তার' উপর ন্যাস্ত করতে পারে যে বাদশাহ তিনি মুসলমান জনতার কাছ থেকে সমাদর লাভের যোগ্য নন। বাদশাহ এবং পীথলের উপর তাঁর মনে যে ক্রোধের সঞ্চার হলো তার ফলে তিনি দু-একবার অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন! ষড়যন্ত্রের মধ্যদিয়ে পীথলকে হত্যা করার ইচ্ছাই তাঁর হলো। কিন্তু তাতে রাজপুত সৈন্যদল ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকেই হত্যা করে ফেলবে এবং কঠোর দণ্ডদানের ব্যাপারে খ্যাতিসম্পন্ন বাদশাহই বা কী করেন বলা যায় না। এই সব ভাবনায় যখন তিনি বিব্রত বোধ করছিলেন ঠিক সেই সময় কাশিম বেগ তাঁর কাছে এসে হাজির হলো।

নাসির খাঁ তাকে বললেন, 'তুমি শুনেছ সব কথা? বাদশাহ সৈন্যবাহিনীর সমস্ত ক্ষমতা সেই কাফেরকে দিয়ে রেখেছেন। তার আদেশ যে মানবেনা তাকে রাজদ্রোহী মনে করা হবে। আমরা সব তার অধীনে থাকবো। যে কুত্তা পা দিয়ে ছোঁওয়ার যোগ্যও নয়, তার অধীনে আমাদের থাকতে হবে। এই যদি কথা হয় তাহলে এরাজ্যকে আমরা জিতলাম কেন? হিন্দুস্তানকে মোগলদের অধীনে আমরাই আনলাম আর আমরাই আজ কেউ নই। বাদশাহ আমাদের কেবল দাস বলেই মনে করেন। শুধু তাই নয়, এই কাফেরদের সম্মানিত করে আমাদেরই ঘাড়ে চড়িয়ে রেখেছেন। এসব কতদূর সইবো? এই পৃথ্বী সিংহকে

শেষ করে না ফেলা আমাদের পক্ষে অপমানজনক। এর দর্প আর অহঙ্কার! সব দেখিয়ে দেবো! এই রাজ্যকে যে মুসলমানরা তাদের বাহু বলে জয় করে নিয়েছে তা বোনেদের বিক্রী যারা করে সেই সব নীচদের দান করার জন্য নয়।'

কাশিম বেগ এবং অন্যান্য মুসলিম সরদারদের রায়ও এই-ইছিল। সে বলল, 'হুজুর! আপনার কথাই সত্য। কিন্তু এখন সামনাসামনি বিরুদ্ধতার কোন ফল হবে না। প্রথমত শহরের সমস্ত সৈন্যই তার অধীন। আমরা বিরুদ্ধে দাঁড়ালে আমাদের সে সহজেই দমন করবে। কোন রকমে হত্যাও যদি করা হয় তা হলেও বাদশাহ জেনে ফেলবেন। পরিণাম যে কী হবে তা বলার আবশ্যকতা নেই। শাহজাদার হাত দিয়েই যদি হত্যার কাজটা হয় তাহলে ঠিক হয়। কিন্তু তাতেও মুস্কিল আছে। কত কষ্ট করে দানিয়াল শাহকে আমরা এত উঁচুতে তুলেছি। পা ফেলতে যদি একটু ভুল হয় তা হলেই সব গোলমাল হয়ে যাবে।'

'তাহলে তুমি কি বলতে চাও যে আমরা চুপচাপ সব কিছু সইতে থাকবো?'

'আমি বলতে চাইছি যে কাজ করতে হবে খুব সাবধান হয়ে। সরাসরি বিরোধে কোন লাভ নেই, তাতে বরং আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সেই জন্য প্রকাশ্যে বিরোধিতা করা অনুচিত।

'কী করব তাহলে?'

'আমাদের ছাড়া অন্য কারোর দ্বারা যদি সে নিহত হয় অথবা বাদশাহ যদি তার উপর অসন্তুষ্ট হন তা হলে আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হতে পারে। আমি এর রাস্তা খুঁজে পেয়েছি।'

'কী শুনিনা?'

'প্রথম কথা, বাদশাহকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হোক যে পীথল সেলিমের সঙ্গে যোগ দিচ্ছে। এটা খুব শক্ত কাজ নয়। দানিয়াল শাহের লোকরাই বিনা অনুমতিতে রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবে না এটাই তার লক্ষ্য। ভাবলে আরও অনেক কারণ পাওয়া যাবে। সম্রাটের গুপ্তচরদের মাধ্যমেই এসব খবর তাঁর কাছে পৌঁছানো দরকার।

তাদের মধ্যে কয়েকজন আমার বন্ধু আছে। ওদের দিয়ে কাজ হতে পারে।'

'বেশ কথা, কিন্তু তাঁর পক্ষেও তো লোক আছে?'

'সে সব আমার ওপর ছেড়ে দিন। আমি সব ঠিক করে নেবো। আপনি শুধু দানিয়াল শাহের সঙ্গে পীথলের কি হয়, খেয়াল রাখুন।'

'আজকের সমস্ত কথা জানার অন্য কী ফল আর হবে? পীথলকে আলাদা অধিকার দেওয়ার অর্থই হচ্ছে দানিয়ালের অপমান এবং সে এই ধরনের অধিকারের প্রয়োগও তাঁর বিরুদ্ধে করেছে। চলো, এখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আর সব কিছু তুমি করে নিও।'

নাসির খাঁ সোজা দানিয়াল শাহের প্রাসাদে গিয়ে হাজির হলেন। শাহজাদা নিজে সম্রাট হওয়ার স্বপ্নে মশগুল ছিলেন। নাসির খাঁ এসেছেন শুনে তিনি অবিলম্বে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন এবং এসে যেতেই তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই শাহজাদা বুঝতে পারলেন যে ব্যাপার বেশ গুরুতর। তিনি বললেন, 'তোমার মুখের অবস্থা এরকম কেন? কী হয়েছে? আমার মাননীয় অগ্রজ কি আগ্রায় পৌঁছে গেছেন?'

'আপনি যে সময় এতই আনন্দিত সে সময় কষ্ট দিতে সঙ্কোচ হয়। তবুও কাজটা দরকারী বলেই কথা বলতে চাই।'

ভীরু প্রকৃতির শাহজাদার মুখ ম্লান হয়ে এলো। নাসির খাঁকে তিনি অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। ব্যাপারটির গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য খাঁসাহেব কঠিন মৌনতা অবলম্বন করলেন। এর ফলে দানিয়াল আরও বিচলিত হয়ে পড়লেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী নাসির, আসল ঘটনা কী? এত তাড়াতাড়ি কিভাবে এলে?'

নাসির বললেন, 'আপনি মনোযোগ দিয়ে শুনুন। মনে হচ্ছে, সমস্ত কিছু ওলট-পালট হয়ে গেছে।'

'কী ওলট-পালট? আমার হাতে রয়েছে রাজ্যাধিকার আর সাহায্যের জন্য তুমি রয়েছ কাছে। সুতরাং ওলট-পালট কি হতে পারে?'

এই কথার উত্তরে নাসির খাঁ পীথলের আদেশ, বাদশাহের ফরমান এবং তার ফল স্বরূপ দানিয়াল চক্রের অপমান ও শক্তি হ্রাসের কথা

চতুর্গুণ বাড়িয়ে বললেন। 'বাদশাহ সালামতের পুত্র তথা ভাবী বাদশাহ হলেন আপনি আর আমাকে কাজ করতে হবে এই কুত্তার অধীনে? এ আমি কখনও সহ্য করতে পারবো না। আর সে যে সেলিমের পক্ষপাতী তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই!'

দানিয়াল বললেন, 'তা যদি হয় তা হলে তাকে কোন মতে...'

নাসির বললেন, 'তাও ভেবেছিলাম। কিন্তু দুর্গের সমস্ত সৈন্যই রাজপুত। সেই জন্য পীথলের কোন ক্ষতি হলে তারা আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অন্য কোন উপায় বের করতে হবে।'

কাশিম বেগের পরামর্শের কথা তিনি বললেন এবং দানিয়াল তাতে তাঁর সমর্থন জানালেন। তিনি বললেন, 'এখুনি এর ব্যবস্থা কর। পীথল যদি এতটা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে থাকে তাহলে সেলিম খুব শীগ্‌গিরই এখানে এসে পৌঁছবেন। আর ভাইসাহেব যদি রাজধানী দখল করে নেন তাহলে আমার আর কিছু রইল না। আমাকে কা করতে হবে?'

'প্রধান কথা আপনি মনে রাখবেন যে যতদোষই তার মধ্যে থাকুক না কেন, শক্তিও কৌশলে পীথল কম নন। সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে থাকা সত্ত্বেও সে এমন ভাব দেখাবে যাতে মনে হয় যে সে যেন সব কিছুই আপনার পরামর্শমত করছে। আপনার উপর প্রজাদের যে শ্রদ্ধা আছে তা সে এই পদ্ধতিতে নষ্ট করে দেবে। সম্রাটের ফরমান তার হাতে, থাকায় সোজাসুজি লড়ে লাভ নেই। এমন করতে হবে যাতে প্রমাণ হয় যে সে অহঙ্কারী এবং আপনার আদেশ অমান্যকারী। সেনা-বাহিনী সংক্রান্ত ব্যাপারে সে সর্বাধিনায়ক। ঠিক একইভাবে অন্তঃপুরের ব্যাপারে পূর্ণক্ষমতা আপনার রয়েছে এবং আপনি হলেন ভবিষ্যতের বাদশাহ। সেই জন্য আপনার অধিকার সীমার মধ্যে সে যদি কোন ব্যাপারে বিরোধিতা করে অথবা প্রতিকূল ভাব দেখায় তাহলে তাকে রাজদ্রোহী প্রমাণ করতে পারবেন। এরকম হলে বাদশাহের আস্থাই তার উপর থেকে চলে যাবে।'

দানিয়াল বললেন, 'ঠিক আছে। এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। ঐ শেঠের ব্যাপারটাই ধরা যাক। যদি হুকুম না মানে তো...।'

নাসির খাঁ বললেন, 'আপনার কী মত ?'

দানিয়াল বললেন, 'তোমার মনে নেই, চার-পাঁচ মাস আগে আমি তোমাকেও বলেছিলাম। শেঠ কল্যাণমলের মেয়েকে আমার অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলাম। গত নববর্ষ উৎসবের দিন মীনা বাজারে আমি তাকে দেখে ছিলাম। আব্বাজান অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে কথা বললেন। তাঁর সৌন্দর্যের কথা কি বলব ? স্বর্গের অপ্সরাও তার কাছে হার মানে। সেই সময়েই আমার মন হারিয়ে গেল। শেঠকে ডেকে আমি বললাম। তিনি উত্তরে বললেন যে বাদশাহ সালামত যদি বলেন তা হলে তিনি মেনে নেবেন। তা না হলে সম্ভব নয়। শেঠের উপর আব্বাজানের কৃপাদৃষ্টির কথা আমি জানি। সেই জন্য সেখানে কথাটা বলতে আমার সঙ্কোচ হলো। অন্তঃপুরের দায়িত্ব এখন আমার হাতে। সুতরাং বলপূর্বক ও আমার ইচ্ছাকে পূর্ণ করতে পারি। পীথলকে আদেশ করে দেখবো। সে না মানলে রাজদ্রোহী হবে।'

নাসির খাঁর কাছেও এটা সঠিক বলে মনে হলো। পীথল ও শেঠ কল্যাণমল উভয়ের সঙ্গেই তাঁর সমান শত্রুতা। তিনি এও জানতেন যে হিন্দু বালিকাদের মুসলিম অন্তঃপুরে আনতে পীথল সম্মত হবে না। সেই জন্য কল্যাণমলের পৌত্রী যদি পীথলের নেতৃত্ব দানিয়ালের অন্তঃপুরে নীত হয় তাহলে খুব ভাল হবে।

প্রসন্ন মন নিয়ে নাসির খাঁ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বাদশাহের দরবারে নববর্ষ উৎসব খুব সমারোহের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হতো। এই উপলক্ষ্যে তিনি বিবিধ আমোদ প্রমোদের আয়োজন করতেন। সে সময় এই উৎসবের মেয়াদ ছিল ন দিন কিন্তু পরে সেটা বাড়িয়ে করা হয় চোদ্দ দিন। উল্লিখিত ন দিন বাদশাহের দরবার রাজপ্রাসাদের বড় প্রাঙ্গনে বসত। দূর-দূরান্ত থেকে রাজামহারাজা, অভিজাত এবং ওমরাহরা আসতেন এবং প্রাঙ্গনের মধ্যে নির্মিত মণ্ডপে বসে বাদশাহকে নিজেদের নজরানা দিতেন। অভিজাত ধনীদের পক্ষে এই সময়টাকে ঐশ্চর্য ও আড়ম্বর প্রদর্শনের সময় বলে গণ্য করা হতো।

দিনের বেলায় হতো দরবার, জলসা, ব্যায়াম-প্রদর্শনী এবং হাতীর লড়াই প্রভৃতি এবং রাত্রিকাল ব্যয়িত হতো নৃত্য গীত ইত্যাদির মধ্য দিয়ে। গজ-যুদ্ধ বাদশাহের কাছে ছিল চিত্ত বিনোদনের এক পরম প্রিয় মাধ্যম। সেই জন্য বিশেষভাবে শিক্ষিত হাতীদের লড়িয়ে দেওয়া রাজধানীর এক প্রধান জনপ্রিয় বস্তুতে পরিণত হয়েছিল।

বিভিন্ন উচ্চপদাধিকারী ব্যক্তিদের নিপুন যোদ্ধাদের দ্বন্দ্ব যুদ্ধ, পালোয়ানদের কুস্তি, যাদুকরদের যাদুবিদ্যা প্রদর্শন এবং পণ্ডিতবর্গের বিতর্ক সভা প্রভৃতি বহু জিনিসই তখন রাজধানীতে অনুষ্ঠিত হতো। উচ্চপদাধিকারীদের পুরস্কৃত করা, রাজ প্রিয় ব্যক্তিদের পদবী দান এবং নব সম্মানিতদের অভিনন্দন জানানোও ছিল এই উৎসবের অঙ্গ।

এসব ছাড়াও, রাজপুরীর ভিতরে বাদশাহ মীনাবাজার বসানো শুরু করেছিলেন। বহু সদ্‌গুণের অধিকারী আকবরের মধ্যে ইন্দ্রিয়পরায়ণতা ছিল একটি বড় দোষ। দেবেন্দ্রোপম প্রতাপশালী তাঁর মধ্যে দেব-রাজের এই বিশেষ দোষটিও ছিল প্রবল। শোনা যায় যে নানাদেশ থেকে নির্বাচিত বিভিন্নজাতির প্রায় পাঁচ হাজার স্ত্রীলোক তাঁর অন্তঃ-পুরকে অলঙ্কৃত করেছিল। তাঁর এই চরিত্রের প্রতিফলন ছিল মীনা-বাজার নামক বস্তুটির মধ্যে। রাজপুরীর অন্তর্গত বড় উদ্যানটিতে ছ-সাত পঙ্‌ক্তিতে বৃহৎ বিপনিসমূহ সজ্জিত হতো এবং রাজধানীর প্রধান প্রধান দোকান থেকে রকমের জিনিস এনে জমা করা হতো। ঐসব অস্থায়ী দোকানগুলিতে কুলীনকুল ললনাদের বিক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হতো। সপুত্র বাদশাহ ছাড়া আর কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার এখানে ছিল না। সৌন্দর্য, বংশ মর্যাদা এবং বিশিষ্ট পদমর্যাদার জন্য খ্যাতি সম্পন্না নারীদের উক্ত স্থানে এনে বিক্রয় করার যে আদেশ দেওয়া হতো তা লঙ্ঘন করা বা তার বিরোধিতা করা রাজদ্রোহ বলে গণ্য হতো। এইভাবে রাজাজ্ঞা অনুসারে মীনাবাজারে আগত মহিলাদের মধ্যে কারো প্রতি বাদশাহের মন যদি আকৃষ্ট হতো তাহলে তিনি তার চরিত্র নাশ করায় পশ্চাৎপদ হতেন না। কেবলমাত্র সিরোহীর মহারাজই নিজ স্ত্রীদের মীনাবাজারে পাঠানোর বাধ্যবাধকতা

থেকে মুক্ত ছিলেন। এই রকমের একটি উৎসবেই পরবর্তী কালের জগৎখ্যাতা নূরজাহানকে সেলিম আবিষ্কার করেছিলেন।

ঠিক চারমাস পূর্বে এই মীনাবাজারেই দানিয়াল সুরজমোহিনীকে দেখেছিলেন। সেই দিন থেকেই বালিকাটিকে নিজ অন্তঃপুরে নেওয়ার ইচ্ছা তাঁর ছিল। তিনি শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে এই কাজটি কাশিম বেগ বা ইব্রাহিম খাঁর আয়ত্বাধীন নয়। সেইজন্য শেঠজীকে ডাকিয়ে তাঁর ইচ্ছার কথা তিনি সরাসরি জানালেন। কিন্তু শেঠজীর উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি বললেন, 'সুরজমোহিনী যদি আমার কন্যা বা পৌত্রী হতো তাহলে তো কোন কথাই ছিল না। কিন্তু যেহেতু তাকে দত্তক হিসাবে নেওয়া হয়েছে সেই হেতু তার অন্যান্য যে আত্মীয় স্বজন রয়েছে তাঁদের মতামত নেওয়া দরকার।' শাহজাদাকে এ যুক্তি মানতেই হলো। দুমাস পরে তিনি যখন কথাটির পুনরুত্থাপন করলেন তখন উত্তর পাওয়া গেল, 'বন্ধু বান্ধবদের বক্তব্য এই যে স্বয়ং বাদশাহ যদি এই ধরনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবেই এ সম্পর্কে চিন্তা করা যেতে পারে।' দানিয়াল শাহ বিপদে পড়লেন। তিনি জানতেন যে বাদশাহ শেঠকে সম্মান করেন। এই অবস্থায় তাঁর কাছে এই ইচ্ছা প্রকাশ করলে উত্তর কী হবে তা স্পষ্ট ছিল। সৈন্য পাঠিয়ে অপহরণ করলেও বাদশাহের কোপদৃষ্টির ভয় ছিল। এই সমস্ত ভেবে এখন পর্যন্ত তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন। এখন তাঁর মনে হলো যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির এই হলো সুবর্ণ সুযোগ। বাদশাহের ঘোষণা ছিল যে শাহজাদাদের আদেশ রাজাজ্ঞার মতই পালনীয়। তাই তিনি ভাবলেন, এর বিপরীত কিছু করার সাহস শেঠ কল্যাণমলের হবে না। আর পৃথ্বী সিংহ রাঠোর যদি দূত হিসাবে যান তাহলে তো শেঠজী অবশ্যই মেনে নেবেন।

বিলম্বে ক্ষতি হতে পারে ভেবে দানিয়াল পরের দিনই রাজা পীথলকে ডেকে পাঠালেন। রাজা নগর পরিদর্শন ও সৈন্য সংস্থাপনের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছেন এবং সন্ধ্যার আগে যে ফিরবেন না সে সংবাদ নিয়ে দূত ফিরে এলো। ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হল।

এসব কথা তত্‌ক্ষণে শেঠজীও জ্ঞাত হলেন। সম্পূর্ণ জানার আগেই সম্ভাবনার কথা তিনি অনুমান করে নিয়েছিলেন। দানিয়াল শাহ তাঁর অভিলাষ সোজাসুজি ব্যক্ত করেছিলেন এবং বাদশাহের কৃপায় তাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ানো গিয়েছিল। এখন বাদশাহ রয়েছেন দূরে আর দানিয়াল শাহের হাতে রয়েছে ক্ষমতা। সুতরাং সুরজমোহিনীকে বলপ্রয়োগের দ্বারা নিজ অন্তঃপুরে নিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই সমস্ত চিন্তা করে তিনি স্থির করলেন যে তাঁকে এই দুষ্কর্ম করার সময় না দেওয়াই বাঞ্ছনায়। সেইজন্য বাদশাহ দক্ষিণের পথে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই বহু সংখ্যক অনুচরের সঙ্গে সুরজমোহিনী এবং তার দিদিমাকে হরিদ্বার পাঠিয়ে দিলেন। দানিয়াল শাহের মতলবের হদিশ পেয়ে তিনি নিজ কর্মপন্থার ঔচিত্য উপলব্ধি করে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন।

সৈন্যবাহিনীগুলি পরিদর্শন করে দলপতি সিংহকে নিয়ে ফিরে এসেই রাজা পীথল দানিয়াল শাহের আমন্ত্রণের কথা জানতে পারলেন। শাহ-জাদার সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে তিনি তাড়াতাড়ি রাজপুরীতে গেলেন। প্রভুর পদোন্নতির সাথে সাথে দলপতি সিংহেরও পদোন্নতি হয়েছিল। তিনি পূর্বেই পীথলের নিজবাহিনীর উপনায়ক ছিলেন, এখন রাজকীয় সেনাবাহিনীর একটি বিভাগের নায়কত্ব এবং আগ্রা শহরের রক্ষার দায়িত্বও তাঁকে দেওয়া হলো।

অতিমাত্রায় আনন্দের সঙ্গে দানিয়াল শাহ পীথলকে অভ্যর্থনা জানালেন। কুশল প্রশ্নের পর তিনি বললেন, 'রাজধানী রক্ষার জন্য আপনি যে ব্যবস্থা করেছেন সেটা খুবই ভাল। বাদশাহ স্বয়ংও যদি আক্রমণ করেন তাহলে তাঁকেও বেশ অসুবিধায় পড়তে হবে।'

পীথল উত্তর দিলেন, 'মহামান্য বাদশাহের নির্দেশ পালনের জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। কেউ যে বল প্রয়োগের জন্য অগ্রসর হবে তা আমি মনে করি না।'

দানিয়াল বললেন, 'ভাই সাহেবের কথা আপনি কি শুনেছেন?'

'ওদিক থেকে আর কোন ভয় নেই।'

পীথল বললেন, 'না আমি কিছু শুনি নি। সারাদিন সৈনিকদের সঙ্গে

বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শনে ব্যস্ত ছিলাম।'

'ভাই সাহেবের কাছ থেকে শাকুলি খাঁ আজ দুপুরে এসেছেন। আব্বাজানের মত বিজয় লাভেই তাঁরও স্বার্থ রয়েছে। সেইজন্য তিনি সমগ্র বাহিনীকে উদয়পুরের দিকে অভিযানের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজা জগন্নাথের সঙ্গে রাজপুত বাহিনী পরশু রওনা হয়ে গেছে। বাকি সৈন্যদের যাত্রা করার জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন। তারই জন্য পত্র নিয়ে শাকুলি খাঁ এসেছেন। কমপক্ষে এক কোটি টাকা চাই। অর্থ পেয়েই শাবাস খাঁ গোলন্দাজ বাহিনী নিয়ে যাত্রা করবেন।'

'তা হলে তো আমার মন থেকে একটা মস্তবড় বোঝা নেমে যায়। সেলিম শাহ যদি সসৈন্যে এসে পড়েন তাহলে তাঁকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বোধ হয় আমাদের হবে না। তিনি উদয়পুরের দিকে অগ্রসর হলে আমাদের ভয় দূর হবে।'

'সসৈন্যে এদিকে আসার সাহস ভাই সাহেবের নেই বলেই মনে হচ্ছে। বাদশাহ সালামতের ঘোষণায় নিরাশ হয়েই তিনি প্রতাপ সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় বেরুনো স্থির করেছেন। তাতে দোষের কিছু নেই। যে-ই জয়ী হোক, আমাদের পক্ষে তা মঙ্গলকরই হবে।'

'বাদশাহের পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ আনন্দের ব্যাপার নয়। আমাদের ধর্মসঙ্কটে না ফেলে তিনি যে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেছেন, তাতে খুব ভালই হয়েছে।'

'বিপত্তি দূর হয়েছে। হ্যাঁ, আমি আপনাকে এই কথা আলোচনার জন্য নয়, নিজের একটা কাজের জন্য ডেকেছি।'

'আপনার আদেশ হতে যা দেরি। বাদশাহের অনুপস্থিতিতে, আপনি জানেন, আমি আপনাকেই তাঁর প্রতিভূ মনে করি।'

'আমাদের পীথলের মনে অন্য কিছু থাকতেই পারে না। এ আমি জানি। আমার একটি বাসনা আছে। সে ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই। শেঠ কল্যাণমলকে আপনি জানেন। তাঁর এক সুন্দরী নাতনী আছে। তাকে আমি পত্নীত্বে বরণ করতে চাই।'

কুলীন বংশীয় হিন্দু কুমারীদের সঙ্গে মুসলমান শাহজাদাদের বিয়ে

সেকালে নতুনত্ব কিছু ছিল না। সেইজন্য সেলিমের এই মোহ পীথলের কাছে বিচিত্র বলে মনে হলো না। কিন্তু তিনি একথাও জানতেন যে ঐ মেয়েটিকে শেঠজী দলপতি সিংহের হাতে সমর্পণ করবেন বলে সঙ্কল্পবদ্ধ এবং ওরা দুজনেও পরস্পরের সঙ্গে প্রণয় বন্ধনে আবদ্ধ। সেই কারণে কথাটা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তিনি বললেন, 'এতে আর মুশকিলের কী আছে? আপনি যদি তাকে বিবাহ করেন তাহলে শেঠজী নিজেকে অনুগৃহীত বলে মনে করবেন। রাজ পরিবারের সঙ্গে বৈশ্যদের আত্মীয়তার চল হিন্দুদের মধ্যে আছে। এ অবস্থায় বাদশাহের প্রিয় পুত্রের পত্নী হওয়া কি কম বড় কথা। আপনি কি তাঁর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছেন?'

'দু তিনবার ডাকিয়ে বলেছিলাম কিন্তু তিনি বলেন, বাদশাহ আদেশ করলে তাঁর বিরোধিতা থাকবে না।'

'তাহলে এ ব্যাপারে মহামান্য বাদশাহের কাছে নিবেদন করার মধ্যে খারাপের কী আছে?'

'তা কিছু নেই। কিন্তু সেটা করিনি। এখন ত আমিই রাজ-প্রতিনিধি। আব্বাজানের আদেশও আছে—আমার কথাকেই রাজাজ্ঞা হিসাবে মানার। অবিলম্বে এই বিবাহ কার্য সম্পন্ন হোক এটাই আমার সিদ্ধান্ত। আপনি এর সব ব্যবস্থা করে দিন।'

'শেঠজী যদি অস্বীকার করেন?'

'আমার আদেশ বাদশাহেরই আদেশ। তাঁর অনুমতির কী প্রয়োজন? তিনি স্বীকৃত না হলে মেয়েটিকে আপনি বলপূর্বক নিয়ে আসুন। এই আমার আদেশ।'

পীথলের মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল কিন্তু মনের এই ভাবকে তিনি বাক্যে প্রকাশ না করে উত্তর দিলেন, 'এই আদেশ এখন পালিত হতে পারে না, হুজুর।'

'কেন?'

'প্রথম কথা হচ্ছে, সেই মেয়েটি এবং তার মাতামহী আজ দু-তিন দিন হলো দ্বারকা না গোকর্ণ, ঠিক বলতে পারছি না কোথায়,

তীর্থ যাত্রায় বেরিয়েছে। আর আমি একথাও শুনেছি যে একটি যোগ্য পাত্রের সঙ্গে তার বিয়ের পাকাপাকি কথাও হয়ে গেছে।'

দানিয়াল শাহের মুখ ম্লান হয়ে গেল। বিবাহিত মহিলাদের অপহরণের মাধ্যমে রাজকুমারদের বিবাহ করা বাদশাহ একেবারেই পছন্দ করতেন না। সেলিমের প্রতি তাঁর অসন্তোষের প্রধান কারণও ছিল এই। সেইজন্য তিনি জানতেন যে যদি অন্য কারো সঙ্গে সুরজমোহিনীর বিয়ে হয়ে যায় তাহলে তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার নয়।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'সে যে তীর্থ যাত্রায় গেছে তা আপনি কি করে জানলেন? পথ থেকে যদি ধরে আনা হয় তাহলে আমি কোন দোষে পড়ব না। বিবাহও হয়ে যাবে, আর বাদশাহের অপ্রীতিভাজনও হতে হবে না।'

পীথল উত্তর দিলেন, 'তা-ও সম্ভব নয়। সম্রাটের মোহরাঙ্কিত রক্ষাপত্র সঙ্গে নিয়ে এবং তাঁর সেনাবাহিনীরই দশজন রাজপুত্রের প্রহরায় তারা গেছে। এসব ব্যবস্থা আমিই করেছিলাম। কল্যাণমলের প্রতি বাদশাহ কিরূপ কৃপাশীল তা তো আপনি জানেনই। নিজের পৌত্রী সম্বন্ধে একটি আবেদনপত্র বাদশাকে দেওয়ার জন্য তিনি আমাকে দিয়েছিলেন। মহামান্য বাদশাহ সেটি সানন্দে মঞ্জুর করেছিলেন। তাই এ ধরনের কাজ করে কোন লাভ হবে মনে হয় না।'

'শেঠজী আমাকে একেবারে বেকুব বানিয়ে দিলেন। আপনি তাঁকে বলে দেবেন যে আমি তাঁর উপর ভয়ঙ্কর অসন্তুষ্ট হয়েছি। সময় আসুক না, ভালমত শিক্ষা দিয়ে দেব।'

'ও কথা বলবেন না। কল্যাণমল একজন প্রতাপশালী ব্যবসাদার। তিনি বাদশাহের প্রিয় পাত্র। আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কিছুই বলেন নি। কেবল এই কথাই বলেছিলেন যে বাদশাহের সম্মতি চাই। এতে আপনার কী অসুবিধা আছে?'

'এ ব্যাপারে পীথল আমায় কিছু বলবেন না। তাকে আমি শিক্ষা দেবোই। তার সহযোগী সকলকেই আমি শত্রু বলে মনে করবো।'

ইঙ্গিতটা যে তাঁর উদ্দেশ্যে তা পীথল বুঝলেন। তিনি মৃদু হেসে

বললেন, 'আপনার শত্রু হতে কেউ চাইবে না। বরং অহেতুক ক্রোধে রাজকার্য ব্যাহত হতে পারে একথা আপনি জানেন।'

পীথলের কথায় শাহজাদা খুশী হলেন না। তবুও তাঁর কথার উত্তর দেওয়ার সাহস তাঁর হলো না। কথা শেষ হতেই পীথল বেরিয়ে পড়লেন। ততক্ষণে রাত্রি নেমে এসেছে। রাজপুরীর বাইরে একেবারে অন্ধকার। বড় বড় বাজারগুলি ছাড়া অপরাপর রাস্তা আলো জ্বালানোর প্রথা সে সময় ছিল না। উচ্চ পদাধিকারীরা যাতায়াতের সময় মশালবাহী ভৃত্য সঙ্গে নিতেন। সাধারণ লোকও পথ চলার সময় আলো নিয়ে বেরুতো। খুব তাড়াতাড়ি আসায় পীথলের মশাল বাহক সঙ্গে আসতে পারে নি। সাথী দলপতি সিংহের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তিনি নির্ভয়ে পথ চলছিলেন। পীথল বললেন, 'বাড়ি ফিরেই শেঠজীর ওখানে গিয়ে একটা কথা বলে এসো।'

শেঠজীর সঙ্গে দেখা করতে পীথলের সব সময়ই ভাল লাগত। পীথল বলতে থাকলেন, 'কথাটা এই,—তাঁর পৌত্রী এবং তাঁর দিদিমা কোন পথে এবং কোথায় গেছে তা যাতে কেউ জানতে না পারে, সেইজন্য তাঁকে সতর্ক করে দিতে হবে।'

ব্যস্ততার দরুণ দলপতি দুদিন শেঠজীর ওখানে যেতে পারেন নি। সেইজন্য পীথলের সংবাদের অন্তর্গত খবর তার পক্ষে দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কী? সুরজমোহিনী দূরের কোন দেশে গেছে? তার কি কোন বিপদের সম্ভাবনা আছে?'

পীথল উত্তর দিলেন, 'ভয় পেয়ো না। তার নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থা আমি করেছি। কোষ্ঠীর বিচারে এখন তার খারাপ দশা চলছে। গ্রহশান্তির জন্য তাই তাকে তীর্থ ভ্রমণে পাঠানো হয়েছে।'

দলপতি সিংহ একথা পুরাপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না। অশুভ-দশার অবসানের জন্যই যদি তার যাত্রা হয়ে থাকে তাহলে তা এমন গোপনতার সঙ্গে হলো কেন—এই প্রশ্ন তার মনে জাগলো। আর ব্যবস্থাটা এত দ্রুততার সঙ্গেই বা কেন হলো? তাঁর আশঙ্কা হলো যে সুরজমোহিনীর সঙ্গে তাঁর প্রেমকে সম্ভবত শেঠজী স্বীকৃতি দিতে

নারাজ এবং সেই জন্যই তিনি তাকে দূরে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি আমার বিবাহের ইচ্ছার বিরোধীতাও করেন নি আবার সমর্থনও করেন নি। সেই কারণে এই তীর্থ যাত্রার সূচনা। তবু তার মনে হলো যে তার ভয়ে দূরে চলে যাওয়া অনাবশ্যক। তাই এটা বোধহয় ঠিক নয়। দলপতি সিংহের চিন্তা প্রবাহের ধারা অনুমান করে পীথল বললেন, 'তোমার সঙ্গে পরিষ্কার ভাবে আলোচনা করার বাধা নেই। তোমারও জানা উচিত। ঐ মেয়েটিকে তোমার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার শেঠজীর মত আছে কিন্তু তাতে কিছুটা অসুবিধা আছে। প্রথম কথা হচ্ছে এই যে দানিয়াল শাহ তাকে গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। এ পর্যন্ত শেঠজী বিপদ বাঁচিয়ে চলছিলেন। এখন বাদশাহ না থাকায় এ ব্যাপারে দানিয়াল শাহ তাঁকে বাধ্য করতে পারেন এটা ভেবেই আমরা তাদের দূরে পাঠিয়েছি।'

দলপতি সিংহের মনে যুগপৎ আশা পূর্ণতার আনন্দ এবং দানিয়াল শাহের উপর ক্রোধের সৃষ্টি হল। তাঁরা দুজন এইভাবে কথা বলতে বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময়, কোথা থেকে কে জানে, তিন চার জন সশস্ত্র ব্যক্তি তাঁদের সামনে লাফিয়ে পড়ল। 'এই সেই মেয়ে চোর! রাক্ষস!' চিৎকার করতে করতে একজন পীথলের অশ্বের গলদেশে তরবারির আঘাত করলো। প্রাণভয়ে পলায়মান আহত অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পারদর্শী পীথল লাফিয়ে পড়লেন। লাগাম ছেড়ে দিয়ে দলপতি সিংহও তলোয়ার হাতে তাদের সম্মুখীন হলেন। আক্রমণকারী দলের নেতা কটুক্তি বর্ষণ করতে করতে পীথলকে আক্রমণ করলো। অন্য তিনজন তাঁকে ঘিরে ফেলতে যেতেই তাদের মধ্যে একজন দলপতি সিংহের অসির আঘাতে ধরাশায়ী হলো। তারপরে যে যুদ্ধ হলো তাতে জয় পরাজয়ের কোন প্রশ্নই রইলো না। শারীরিক শক্তিতে ও অস্ত্র নৈপুণ্যে অদ্বিতীয় পীথলের সঙ্গে চারজন লড়লেও ভয়ের কিছু ছিল না। তাদের একজন তো আহতই হয়ে পড়েছিল এবং দলপতি সিংহ সাহায্যের জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। ফলে ঐ চার জনের পক্ষে আত্মরক্ষা করা দায় হয়ে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণ পর্যন্ত তিনজন বুঝে গেলেও শেষে তাদের

দলপতি আঘাত পেয়ে ভূলুণ্ঠিত হলো। অবশিষ্ট দুজন পালিয়ে বাঁচলো।

রুধিরসিক্ত তরবারি সাফ করে কোষবদ্ধ করতে করতে পীথল বললেন, 'তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছ। সেইজন্য আমি আজীবন তোমার কাছে ঋণী থাকব। পৃথ্বী সিংহ অকৃতজ্ঞ নয়।'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন, 'শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম সৈনিকের ধর্ম। এর মধ্যে প্রশংসার কী আছে?'

'কিন্তু একাজ কাদের? ওদের কথা তুমি শুনলে? ঐসব কথার মধ্যে নিশ্চয় কোন গূঢ়ার্থ আছে। এর খোঁজ নেওয়া দরকার। কিন্তু এখনই কাউকে কিছু বোলো না।'

'রহস্য কিছু নিশ্চয় আছে। আপনাকে 'মেয়ে চোর' বলেছিল। জল্লাদটা পড়ে রয়েছে বটে কিন্তু মরে নি। ওকে বন্দী করে প্রশ্ন করলে বোধহয় ব্যাপারটা জানা যাবে।'

'ঠিক আছে। আমি তোমার ঘোড়াটা নিয়ে চলে যাচ্ছি। এদিক ওদিক থেকে কাউকে ডেকে আমার আহত ঘোড়াটিকে এবং এই লোকটিকে তোমার ওখানে নিয়ে যেও। নতুবা সারা শহরে কাল এই কথা প্রচার হয়ে যাবে। তাতে অসুবিধার সৃষ্টি হতে পারে।'

ইতিমধ্যে দশ পনের জন অশ্বারোহী সৈনিকের প্রহরায় পর্দাঢাকা একটি শিবিকা সেখানে নিয়ে আসা হলো। দু-দুজন লোক মশাল হাতে সামনে এবং পিছনে যাচ্ছিল। শিবিকার আকার প্রকার ও সাজসজ্জা দেখে সহজেই অনুমিত হয় যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়া কোন মহিলা চলেছেন। সেই দলের নায়ককে দলপতি সিংহ সমস্ত কথা বললেন। শিবিকার কাছে গিয়ে সেও সমস্ত কথা আরোহীকে জানাল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'প্রার্থিত সাহায্য দেওয়ার অনুমতি আমার প্রভুপত্নী দিয়েছেন। আমাকে আপনার সঙ্গী হওয়ার অনুমতি দিন।'

পীথল বললেন, 'আপনার প্রভুপত্নী আমার খুব উপকার করলেন। এই আহত অশ্বটিকে বাঁচানো সবচেয়ে আগে দরকার। এ আমার খুব প্রিয়। আপনার প্রভুপত্নী যদি একে বাঁচাবার ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব বাধিত হই। দ্বিতীয়ত আমাকে হত্যার উদ্দেশ্যে আগত এই

লোকটিকে আমার দেহরক্ষীর বাড়িতে পৌঁছে দিতে হবে। আমার সঙ্গে কাউকে আসতে হবে না।' পালকি থেকে উত্তর এলো : 'রাজা পৃথ্বী সিংহের প্রার্থনা আজকাল আজ্ঞা হিসাবেই গণ্য। সেদিক থেকেও আপনাকে সর্বপ্রকার সাহায্যদানে আমি প্রস্তুত।'

পীথলের ইচ্ছামত সবকিছু করার আদেশ দেওয়া হলো। পীথল নিজ গৃহে গমন করলেন। আঘাতের ফলে মূর্চ্ছিত ব্যক্তিকে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। লোকটি রাজপুতবেশী। অনেক চিন্তা করেও তার এই দুঃসাহসের কারণ তিনি খুঁজে পেলেন না। শেষে তাকে একটি অশ্বপৃষ্ঠে রেখে অপর একটিতে নিজে আরোহন করে তিনি নিজগৃহে গমন করলেন।

এই অসময়ে দৃষ্ট ঐ সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলাটি কে হতে পারেন, কেন এ সময় রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন প্রভৃতি ভাবতে ভাবতে পীথল বাড়ি পৌঁছলেন। সাক্ষাৎ প্রার্থীদের ফিরে যাওয়ার আদেশ দিয়ে তিনি নিজ কক্ষে প্রবেশ করলেন। দৈনন্দিন কাজের পর পূজা-আহ্নিকের পর্ব সমাধা করে খেতে যাওয়ার আগে অন্তঃপুরের পরিদর্শকদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন যে কাউকে ভিতরে আসতে অথবা বাইরে যেতে যেন না দেওয়া হয় এবং খুব সাবধানতার সঙ্গে যেন প্রহরা কার্য চলে। এই মর্মে প্রহরী ও দেহরক্ষীদের সতর্ক করে দেওয়া হোক।

'এই আদেশ কি আমার ক্ষেত্রেও প্রতিবন্ধক হবে?'

'সময় অসময়ের নিয়ম পুরানো বন্ধুদের জন্য নয়।'

মেঘহীন আকাশ থেকে আকস্মিক গর্জনের মত এই প্রশ্নে চকিত পীথল পিছন ফিরেই তাঁর মুখ্য সচিবের সাথে নারীবেশী এক পৌরুষদীপ্ত যুবককে নিঃসঙ্কোচ পদক্ষেপে অগ্রসরমান দেখলেন। তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আপনি?'

আগন্তুকের জবাব ছিল, 'হ্যাঁ! আমিই। কেন, অসুবিধা হলো?'

ইশারায় অনুচরদের বাইরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে পীথল বললেন— 'হুজুর! এ যে দুঃসাহসিক ব্যাপার! শাকুলি খাঁ আজ সন্ধ্যায়ই খবর

দিলেন যে আপনি প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধার্থে রওনা হয়েছেন।'

আগন্তুক ব্যক্তি হলেন সেলিম শাহ। তিনি বললেন, 'সেকথা সত্য। কিন্তু বলুন রাস্তার লড়াইয়ে আপনার দেহে আঘাত লাগেনি ত?'

'তাহলে সেই শিবিকায় আপনি ছিলেন?' শাহজাদা ও পীথল উভয়েই হেসে উঠলেন।

সেলিম বললেন, 'হাঁ, আপনার সাহায্যকারী স্ত্রীরত্নকে দেখে নিন। আব্বাজান আমার নগরে প্রবেশ নিষেধ করেছেন কিনা আমার জানা ছিল না। আর অন্যে না জানুক এটাই আমার কাছে আবশ্যক মনে হয়েছে: আগে জানা থাকলে আমার পরম বন্ধু পৃথ্বী সিংহ রাঠোর নগর দ্বারে এসেই হয়ত আমাকে সম্বর্ধিত করতেন এবং কোন এক প্রাসাদ পুরীতে থাকার ব্যবস্থা করে দিতেন। আমার ছোট ভাইজান আমার জন্য সেখানে কোন মিষ্টান্ন পাঠাতেন আর আমি তা খেয়ে সুখ ভোগের জন্য সোজা স্বর্গের দিকে রওনা দিতাম। এই সমস্ত ভেবেই, এই বোর্খায় আবৃত হয়ে এখানে আসা স্থির করেছি। এতো কাণ্ড করে নিজের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভব হয়েছে।'

পীথল বললেন, 'আমরা জানতাম যে পরশু পর্যন্ত আপনি আজমীরে ছিলেন। মাত্র এই দুদিনে আপনি কি করে এখানে এলেন?'

'কেন পীথল, এতে অসুবিধার কী আছে? আমার প্রপিতামহ বাবর শাহ মাত্র একদিনে এর চেয়ে বেশি দূরের পথ অতিক্রম করেন নি? আর আমার আব্বাজান যখন অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে পনেরো দিনের মধ্যে গুজরাট পৌঁছে ছিলেন তখন আপনিও তো তাঁর সঙ্গে ছিলেন? আমি কি তৈমুরের বংশধর নই? দাসী পুত্র তো আমি নই! আমার ধমনীতে প্রবহমান রক্ত শতশত অশ্বমেধ যজ্ঞের হোতা সূর্য বংশীয় রাজপুত বীরেদেরই রক্ত। সুতরাং আপনার প্রশ্নটি কি অসংগত নয়?'

'প্রভু! অপরাধ মার্জনা করুন। আমি আপনার শৌর্য-বীর্যের কথা জানি না তা নয়। যাক, আপনি অনুচরসহ এসেছেন তো?'

সেলিম আবার হেসে ফেললেন। বললেন, 'হে বন্ধু! ভীত হয়ো না। আমার সঙ্গে কোন সৈন্য বাহিনী আসেনি। আমি কি আমার

পরম মিত্র পীথলের সঙ্গে যুদ্ধ করবো ?'

পীথলের দেহে প্রাণ ফিরে এলো। সেলিমের বৃহৎ বাহিনী যদি দুর্গ অবরোধ করে তবে তাকে রক্ষা করা যে কঠিন হবে তা তিনি জানতেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'উদয়পুর যাবেন ঠিক করে আবার কেন তাহলে ফিরে এলেন ? আমরা সকলে ভাবলাম, পিতৃদেবকে সন্তুষ্ট করার যোগ্য বিজয় লাভ করে, যথা সময়ে আপনি এখানে আসবেন।'

'আমিও তাই ভেবেছিলাম। অর্থ সংগ্রহ করে শাকুলী খাঁ ফিরলেই যাত্রা করা হবে ঠিক ছিল। কিন্তু পরশু শিকারে বেরিয়ে আমি শুনলাম যে আমার সেনাপতি এবং আব্বাজানের বিশ্বস্ত সেবক শাবাস খাঁ ছোট একটা সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন। সেনাপতি ছাড়া কি যুদ্ধ হয় ? ভাবলাম, রাজধানী গিয়ে দেখে আসি আমার মিত্রোত্তম কী করছে।'

'কী ? শাবাস খাঁ নিহত হয়েছেন ? কার সঙ্গে যুদ্ধ করে ?'

'তিনি যখন মারা যান আমি তখন আজমীরে ছিলাম না। সেই জন্য সঠিক ঘটনা জানা নেই। সংবাদ বাহক বলেছে যে আমার দেওয়ান ভগবানের সঙ্গে সামান্য বাকবিতণ্ডা হয়েছিল এবং ক্রোধান্ধ হয়ে ভগবান দাস তলোয়ারের আঘাতে তাঁর শিরশ্ছেদ ঘটান।' সেলিমের বক্তব্যের মর্মার্থ অনুধাবন করতে বুদ্ধিমান পীথলের কিছু মাত্র অসুবিধা হলো না। বাদশাহের বিশ্বাসভাজন শাবাস খাঁকে কোন তুচ্ছ কারণে হত্যা করার সাহস যে ভগবান দাসের হবে এটা বিশ্বাস যোগ্য নয়। সেই জন্য—কীচক যদি মরে থাকে তাহলে ভীমসেনই মেরেছেন—এই প্রবাদবাক্য অনুসারে পীথল বুঝে নিলেন যে ঐ ঘটনা সেলিমের অনুমতি ছাড়া ঘটেনি। সেলিমকে সংযত রাখার জন্যই যে বাদশাহ শাবাস খাঁকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে ছিলেন একথা সর্বজনবিদিত ছিল। শাবাস খাঁর বর্তমানে সেলিম ইচ্ছামত কোন ক্ষমতার প্রয়োগ করতে সক্ষম হতেন না। সেলিমের নির্দেশমতই ভগবান দাস যে শাবাস খাঁকে আক্রমণ করেছেন সেই জন্যই এবিষয়ে পীথলের কোন সন্দেহ রইল না। অর্থ-সংগ্রহের অজুহাতে শাকুলী খাঁকে আগ্রা পাঠানোর উদ্দেশ্যও তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শাবাস খাঁর

জায়গায় এখন সেনাপতি কে?'

'বাদশাহের আদেশ না আসা পর্যন্ত কাজ চালাবার জন্য আমি ভগবান দাসকেই নির্দেশ দিয়েছি।'

'আচ্ছা, শাবাস খাঁর নিজস্ব তহবিলে তো যথেষ্ট অর্থ ছিল…'

'আমি শুনেছি সেই জন্যই সংঘর্ষ ঘটে ছিল। কমপক্ষে পাঁচ কোটি টাকা শাবাস খাঁ সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমার যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব আছে দেখে ভগবান দাস শাবাস খাঁর অর্থের একাংশ রাজ্যের প্রয়োজনে চেয়েছিলেন। শাবাস খাঁ তাতে রাজী হননি। তুর্কী হলে কী হবে তাঁর হৃদয়টা হচ্ছে বেনিয়ার। আমার প্রচুর অর্থের প্রয়োজন কিন্তু তিনি এক কড়িও দিতে প্রস্তুত নন।'

'সেই জন্য এখন তাঁর অর্থ ভাণ্ডারের সম্পূর্ণ টাই ভগবান দাসের হাতে এসে গেছে। তাই না?'

হ্যাঁ ঐ রকমই একটা কিছু হবে।'

একটু হেসে, স্তম্ভিত করে দিয়ে, এই যে সমস্ত কথা সেলিম বললেন তার গুরুত্ব চিন্তা করে পীথলের হৃদয় বিচলিত হলো। সেলিমের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ছুটি কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল। একটি হচ্ছে এই যে প্রতাপ সিংহের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য যে সৈন্যের সমাবেশ হয়েছিল তা এখন সেলিমের নিজের আয়ত্বের মধ্যে এসে গেছে; সেলিমকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত শাবাস খাঁর মৃত্যুতে সেই বাহিনীকে ইচ্ছামত পরিচালনা করা এবং কারো বিরুদ্ধে নিয়োজিত করা তাঁর পক্ষে সহজ হয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত মান সিংহ প্রভৃতি হিন্দুরাজা এবং আকবরের দীনইলাহির বিরোধী মুসলমান পদাধিকারীরা বাদশাহের বিরুদ্ধে সেলিমকে সাহায্য করার ব্যাপারে এবং প্রয়োজন বোধে তাঁকে সিংহাসনারূঢ় করাতেও সঙ্কোচ বোধ করবেন না। এই সমস্তের পথে একমাত্র বাধা ছিল অর্থাভাব, তাও এখন আর রইল না। সাহসী শাহজাদা সেলিম কী করে বসেন ভেবে পীথল ভীত হলেন। তাঁকে চিন্তামগ্ন দেখে সেলিম প্রশ্ন করলেন, 'আমার কথায় আপনি খুব সমস্যায় পড়েছেন মনে হচ্ছে।'

পীথল উত্তর দিলেন, 'না, কিছু না। নিজেদের মধ্যকার বিবাদের

ফলে পদাধিকারী ব্যক্তিদের মৃত্যু কোন বিশেষ ঘটনা নয়। তবুও, আজমীরের যখন এই অবস্থা তখন এভাবে একলা আপনি এখানে পদার্পণ করেছেন কেন—সেই কথাই আমি ভাবছি।'

'বেশ ভাই, বেশ! প্রিয় বন্ধু পীথলের সঙ্গে যখন দেখা করতে এসেছি তখন বাইরের সাহায্যের কী প্রয়োজন? এমন সময় এখানে কেন? এই যে প্রশ্ন এর উত্তর হচ্ছে অনেক দিন বন্ধুদের দেখিনি। বন্ধুর আগমন তো সব সময়ই আনন্দের হয়ে থাকে, তাই না?' এই কথার কোন উত্তর না দিয়ে পীথল শুধু একটু হাসলেন। সেলিম আবার প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে, আমার এখানে আসা কি নিষিদ্ধ?'

পীথল বললেন, 'এ প্রশ্ন কেন করছেন? আপনি কি বাদশাহের সন্তান নন? এমন কোন শহর আছে যেখানে আপনার প্রবেশাধিকার নেই?'

সেলিমের হাসি পেলো। তিনি বললেন, 'পীথল, তুমি খুবই বিচক্ষণ ব্যক্তি। আমি আজমীরে থাকলেও এখানকার সব কথাই জানি। লোকে বিশ্বাসের সঙ্গে বলছে যে আব্বাজান ঐ দাসীপুত্রকে রাজ্যাধিকার দিয়ে গেছেন। আমি জানতে চাইছিলাম যে এর মধ্যে কতটুকু সত্য আছে। বাদশাহ যদি এই সিদ্ধান্ত করে থাকেন তা হলে আপনি তো জানবেনই।'

'লোকেরা যে এই রকম বলে,' পীথল বললেন, 'সেটা আমিও জানি। আমি এ-ও জানি যে মহামান্য বাদশাহ এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেননি।'

'আমার দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলুন। সেই শয়তানের বাচ্চা মুবারকের পরামর্শে বাদশাহ দানিয়ালকে উত্তরাধিকার দেননি?'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মহামান্য বাদশাহ সে রকম কিছু করেন নি। আর সে রকম কাজ তিনি করবেনও না।'

'বন্ধুবর! এতে এত নিশ্চিত হওয়ার কী আছে? বাবর শাহকে রাজ্য কি কেউ দিয়েছিল? আমার পিতামহ হুমায়ুন শাহ রাজ্যহারা হয়ে কতদিন এখানে ওখানে ঘুরেছিলেন। আব্বাজানও, যিনি সার্বভৌম হয়েছেন—তিনিও নিজের শক্তিতেই হয়েছেন কি না?

দানিয়ালকে উত্তরাধিকার যদি দিয়েই দেন তা হলেও আপনি কি বিশ্বাস করেন যে সে দুদিনও রাজত্ব করতে পারবে? কিন্তু এই রকম অবস্থায় কে শত্রু কে মিত্র সেটা তো জানতে পারবো। এটাই আনন্দের।'

'ভুল হয়েছে। বোধহয় সেই জন্যই বাদশাহ কিছু স্থির করেননি।'

'তা যদি না করে থাকেন তাহলে কেন আপনি এই আদেশ জারী করেছেন যে পঁচিশ জনের বেশি সশস্ত্র ব্যক্তি রাজধানীতে প্রবেশ করতে পারবে না। এর অর্থ কী?'

'আমি আপনাকে স্পষ্ট কথাই বলব। বাদশাহের আদেশানুসারে তিনি না ফেরা পর্যন্ত দুর্গের অধিকার আমার হাতেই থাকবে। সেই জন্য বেশি সশস্ত্র ব্যক্তি ভিতরে না আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই বাধা বাহির ভিতর দুদিক থেকেই।'

'বুঝতে পেরেছি। এই নিষেধাজ্ঞা আমার পক্ষেও যেমন দানিয়ালের পক্ষেও অনুরূপভাবেই প্রযোজ্য। সংক্ষেপে আব্বাজান প্রত্যক্ষে আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করলেও তা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে না। দানিয়ালেরও অহঙ্কার করার কিছু নেই। আমরা দুজনেই করযোড়ে কৃপার প্রত্যাশায় থাকবো। কথাটা তাই না?'

'মহামান্য বাদশাহের উদ্দেশ্যের কথা আমি জানিনা। আর সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করাও আমার পক্ষে অনুচিত। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। চিন্তা করলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন।'

'আপনি খুব যোগ্য ব্যক্তি। সোজা কথার মানুষ। দু পক্ষের কোন দিকেই নেই। কিন্তু বন্ধুবর! দু জনের মাঝখানে থাকলে কী দশা হয় তা তো জানেন?'

পীথল দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন, 'ভালভাবেই জানি। দুদিক থেকেই খুব ঘা খেতে হয়। কিন্তু আমার অবস্থান তেমন নয়। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে একটি পক্ষভুক্ত হয়ে আছি।'

ঔৎসুক্যের সঙ্গে সেলিম প্রশ্ন করলেন, 'কোন পক্ষে?'

'মহামান্য বাদশাহের পক্ষে।' পীথল উত্তর দিলেন।

'অপর কারো মুখ চেয়ে আমাকে তাঁর আজ্ঞা কার্যকরী করতে

হয় না। বাদশাহের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালনীয় মনে করে কাজ করাই আমার কর্তব্য মনে করি।'

সেলিম আবার চিন্তায় ডুবে গেলেন। এতক্ষণে বন্ধুত্বের ভাব বিলীন হয়ে তার স্থানে আবির্ভাব হলো সময়োচিত গাম্ভীর্যের। তিনি চিন্তিত রয়েছেন দেখে পীথলও নীরব রইলেন। অবশেষে সেলিম বললেন, 'পীথল, আমার কথা মন দিয়ে শোন। আমাদের পরিচয় দুদিনের নয়। আমরা পরস্পর আশৈশব পরস্পরের বন্ধু। আমি তোমাকে কতটা চাই তার প্রমাণ তুমি বহু বারই পেয়েছ। আমার প্রতি তোমার স্নেহের কথাও আমি জানি। শুধু তাই নয়, আমরা পরস্পরের আত্মীয়ও বটে। সেইজন্য আমি বিশ্বাস করে যা বলছি তা তুমি নিজের মধ্যে সীমিত রাখবে বলে আশা করি। তুমি জানো যে আমার অধীনে রয়েছে এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী। প্রয়োজনীয় অর্থও এখন আমার হস্তগত রয়েছে। অপর পক্ষে তোমার হাতে রয়েছে মাত্র পঁচিশ হাজারের একটি রাজপুত বাহিনী। শহরের বেশির ভাগ মানুষ আমার পক্ষে। এমত অবস্থায় আমার সঙ্গে যুদ্ধে তুমি জয়লাভ করতে পারবে না। তুমি আমার পক্ষে যোগ দাও—একথা আমি বলছি না। সে কথা বলা বৃথা হবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষের কি প্রয়োজন আছে?'

'প্রাণ খুলে আপনি আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমি তা-ই বলবো। আপনার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি বলে বুঝাবার বস্তু নয় তাই আমি এখন এই কথা আপনাকে বলছি। মহামান্য বাদশাহের পর এই সাম্রাজ্য আপনারই অধিকারে আসবে। বাদশাহের অন্য কোন ইচ্ছা নেই। আর হবেও না। যদি অন্য কিছু চানও তাহলেও তার আশা নেই। এই অবস্থায় আপনি যা ভাবছেন তা কেবল পাপ পূর্ণ-ই নয়, মূর্খতা পূর্ণও বটে। পিতৃদ্রোহী সন্তান ইহলোক এবং পরলোকে সুখী হয় না। এসব কথা বাদ দিয়ে যদি ধরে নেওয়া যায় যে আপনার বিশাল বাহিনী আগ্রা অধিকার করেছে তাহলেও বাদশাহ দক্ষিণ থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সম্মুখীন হওয়ার ক্ষমতা কি আপনার হবে? তাঁর পরাক্রম, বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্যের কথা চিন্তা করুন। তাঁর মত প্রতাপশালী

ভারতে আর কে আছেন ? এই রকম পিতার সঙ্গে বিবাদ করে আপনি কি জয়ী হবেন ? শাবাস খাঁর মৃত্যু সংবাদ আপনার মুখ থেকে বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট সব কিছু আমি বুঝে নিয়েছি। আমার বিনীত পরামর্শের প্রতি গুরুত্ব দিন। এখন সাহস দেখাবেন না। যদি এ সমস্ত অস্বীকার করার সিদ্ধান্তই করেন তবে পৃথ্বী সিংহের শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকতে সে আপনাকে আগ্রা অধিকার করতে দেবে না।'

পীথলের বক্তব্য শিলালিপির গভীরতায় সেলিমের মনে দাগ কাটলো। উত্তরে তিনি কিছু বলার আগেই বাইরের দালানে একটা কোলাহলের শব্দ শোনা গেলো। ব্যাপারটা কী জানার জন্য তলোয়ার কোষমুক্ত করে পীথল বাইরে গেলেন। ঠিক সেই সময় বাধাসৃষ্টিকারী ভৃত্যদের সরিয়ে দিয়ে দানিয়াল শাহ কক্ষে প্রবেশ করলেন।

'বাঃ পীথল ! কী রাজভক্তি ! আ হা কী দুর্গ রক্ষা !' অট্টহাস্য-সহযোগে এই কথাগুলি তিনি বললেন।

পীথল, বললেন, 'আপনি কী বলছেন ? আমার রাজভক্তিতে আপনি কী কলঙ্ক দেখলেন ?'

'আপনার কাছে এই গোঁফ-ওলা স্ত্রী রত্নটি বসে রয়েছেন এঁকে কি আমি চিনি না ? বাদশাহ সালামত আপনার উপর বিশ্বাস রেখেছেন। এই রাজধানী রক্ষার ভার তিনি আপনার হাতে তুলে দিয়েছেন। কার হাত থেকে রক্ষা ? রাজশক্তির বিরুদ্ধাচারীর হাত থেকে রক্ষা। এখন শেয়ালকে মুর্গী পোষার ভার দেওয়ার মত হলো না কি ?'

পীথল সেলিমশাহের দিকে তাকালেন। তিনি এমন শান্তভাবে বসেছিলেন যে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কিছু শোনেননি। এঁদের পারস্পরিক বাদ প্রতিবাদ শোনার জন্যই যেন তিনি চুপ চাপ বসেছিলেন। পীথল উত্তর দিলেন, 'শহর রক্ষার ভারই আমার হাতে অর্পণ করেছেন। জবাবদিহির ভার কেবল আমারই। শাহজাদাদের বিবাদে থাকার আদেশ বাদশাহ দেননি। আমার কাছে আপনারা দুজনই সমান।'

দানিয়াল হেসে ফেললেন, 'সমান ! তোমার বোন··· ?'

বাক্যের পদপূরণ হওয়ার আগেই পীথলের হাত কোমরে দোদুল্যমান

তলোয়ারের উপর পড়ল। তিনি গর্জন করে উঠলেন, 'কি বললে?'

'দাঁড়াও, পীথল! এই কুকুরের রক্তে তলোয়ারকে অশুচি কোরো না। এর জবাব আমিই দেবো।' বলতে বলতে সংহার রুদ্রের মূর্তিতে সেলিম দানিয়ালের কাছে এগিয়ে গেলেন। সেলিমের ক্রোধ দেখে দানিয়াল কাঁপতে শুরু করলেন, 'বল, কী বললি? আবার বল!' এইভাবে গর্জন করতে করতে সেলিম হাতের চাবুক দিয়ে দানিয়ালের মুখে আঘাত হানলেন। মুহূর্তের মধ্যে এ সব ঘটে গেল। পীথল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মারার জন্য সেলিমকে আবার চাবুক ওঠাতে দেখে দুই হাঁটুর আড়ালে মুখ লুকিয়ে তাঁর পায়ে লুটিয়ে দানিয়াল বললেন, 'আমাকে মারবেন না! আমায় দয়া করুন।' বলে কাঁদতে লাগলেন।

'দাসীপুত্র! তুই আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবি!' ক্রোধান্ধ সেলিম এই কথা বলতে বলতে তাকে পদাঘাত করলেন।

ততক্ষণে পীথল 'না! না!' বলে সেলিমকে ধরে সরিয়ে দিলেন। তা না হলে হয়ত দানিয়াল শাহকে আর দ্বিতীয় সূর্যোদয় দেখতে হত না।

পদাঘাতে ভূলুণ্ঠিত কুকুরের মত ক্রন্দমান দানিয়ালের দিকে তাকিয়ে সেলিম হেসে ফেললেন এবং ব্যঙ্গের সুরে বললেন 'ভারত সম্রাট হওয়ার যোগ্যই বটে তুই। হায়রে! তৈমুরের বংশে তুই জন্মেছিস! আমি স্ত্রীলোকের পোশাকই শুধু পরেছি আর তুই জন্মেছিসই স্ত্রীলোক হয়ে! এটা জেনেই আব্বাজান তোকে অন্তঃপুর পাহারার কাজ দিয়েছেন, নপুংশকদের উপযুক্ত কাজ!'

তারপর পীথলের দিকে ফিরে তিনি বললেন, 'পীথল! বাদশাহকে যখন এসব কথা লিখবে তখন তাঁকে একথাও জানিও, ভুলোনা যেন, আমি সুপারিশ করছি যে যদি মোগল সাম্রাজ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখতে হয় তাহলে বাদশাহ হওয়ার যোগ্যতম ব্যক্তি হলেন বীর পুঙ্গব এই দাসীপুত্র।'

দুজনের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে বড় কষ্টে দানিয়াল শাহ উঠে দাঁড়ালেন। তিনি কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে যাবেন এমন সময় সেলিম বললেন, 'কোথায় যাচ্ছিস্? দাঁড়া ওখানে! তোকে আমার কিছু বলার আছে।' চাবুকের আঘাতে রক্ত ঝরা মুখে দানিয়াল কাঁপতে

কাঁপতে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

'শুনছ পীথল! আজ আমি একে আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।' সেলিম বললেন, 'এ যতদিন আমার কাছে থাকবে ততদিন আমার কোন ভয় থাকবে না। রাজধানী তুমি আমার হাতে না ছেড়ে দাও তাতেও কিছু যাবে আসবে না। তোমার আমার পক্ষে ক্ষতিকারক এই বদমায়েসকে আমি যদি বন্দী করে রাখি তাতে তোমার আপত্তি থাকা অনুচিত।' একথা দানিয়ালের কাছে নিজের মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা বলে মনে হলো। সেলিমের হাতে পড়লে যে দুদিনও বাঁচা যাবে না তাতে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। বিরুদ্ধবাদী ও পথের বাধাকে যে কোন প্রকারে ধ্বংস করাই তৈমুর-বংশের চিরাচরিত রীতি ছিল এবং তাঁর প্রতি সেলিমের বিদ্বেষের কথা কারো অজানা ছিল না। এই সঙ্কট থেকে ত্রাণের কোন পথ না দেখে তিনি পীথলের দিকে চাইলেন। পীথলের মধ্যে কোন ভাবান্তর না দেখে বাঁচানোর আবেদনপূর্ণ করুণ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন।

পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে পীথল ও কিছুটা বিচলিত হলেন। দানিয়ালের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বুঝেছিলেন যে গোলমালের সূত্রপাত হলো। সেলিমের সঙ্গে কলহ শুরু হতে এই শাহজাদাটির ভীরুতা ও কাপুরুষতা দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। সেলিমের এই নূতন প্রস্তাবে তিনি দোটানায় পড়লেন। সেলিম দানিয়ালকে নিয়ে গেলে তাঁর গতি কি হবে তা তিনি জানতেন। পরিহাসছলে শাবাস খাঁর মৃত্যু কাহিনী-বর্ণনাকারী সেলিম আজন্মশত্রু দানিয়ালের সঙ্গে যে কি ব্যবহার করবেন সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। নিজের ভবন থেকে রাজকুমার নিখোঁজ হলে ঝামেলায় তাঁকেও পড়তে হবে এবং বাদশাহ এ ব্যাপারে কিছুতেই ক্ষমা করবেন না। বিশেষ রাজধানীর নিরাপত্তার ভার যখন তাঁরই উপর। এই সময় এ ধরনের অত্যাচার হতে দেওয়াও অপরাধ। সেইজন্য পীথল যে ভাবেই হোক এই সিদ্ধান্তকে কার্যকরী না হতে দেওয়া প্রয়োজন বোধ করলেন।

তিনি বললেন, 'হুজুর! দানিয়াল শাহ আমার অতিথি। একথা আপনি জানেন যে তাঁর কোন ক্ষতি হলে ক্ষাত্রধর্মের বিরোধী হবে।

সেই জন্য ইনি যতক্ষণ আমার গৃহে আছেন ততক্ষণ আপনাকে এই সিদ্ধান্ত ত্যাগ করতে হবে। এই আমার প্রার্থনা।'

সেলিম বললেন, 'কী? একে ছেড়ে দেবো? আমাদের অন্তঃপুর এবং তোমার বংশে কলঙ্ক আরোপকারী একে তুমি বাঁচাতে চাও।'

'ওকথা বলবেন না! আমাদের ধর্মে বলে অভ্যাগত ব্যক্তি গুরুর মতই পূজনীয় এবং এক্ষেত্রে শাহজাদা আমার অতিথি। সেজন্য ইনি যাই বলুন না কেন ক্ষমা করাই আমার কর্তব্য। তার ওপর আপনি তো ওকে শাস্তিও দিয়ে দিয়েছেন।'

সেলিম ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন, 'পীথল! আমার সঙ্গে বিবাদ কোরো না! তার পরিণাম কী জানতো? বৃথা তর্ক কোরো না। একে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

পীথল উত্তর দিলেন, 'অনুগ্রহ করে আমাকে বাধা করবেন না! আপনি আমার প্রাণ নিতে পারেন কিন্তু অপমান করতে পারবেন না!'

'যদি আমি বলপ্রয়োগ করি?'

'ভেবে দেখুন! সেটা সম্ভব কিনা? আপনি এই শহরে একাই এসেছেন। এঁর সঙ্গে অনুচর আছে, তারা বাইরে অপেক্ষা করছে।'

বিনয়ের সঙ্গে ব্যক্ত এই কথার প্রকৃত অর্থ সেলিম বুঝে নিলেন। পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের মত তিনি গোঁঙাতে লাগলেন। কিন্তু তখনই ক্রোধকে সংযত করে তিনি বললেন, 'পীথল! তোমার কথার অর্থ আমি বুঝেছি। আমি এখানে সঙ্গীহীন হয়ে এসেছি বলে এখান থেকে যাওয়াও তোমার অনুমতি সাপেক্ষ। জেদ করলে দানিয়ালের বদলে আমাকে বন্দী হতে হবে। এই নয় কি? বেশ, তাহলে এসো! বাদশাহের পত্নীর গর্ভজাত সন্তানকে বন্দী করার সম্মান তুমিই লাভ কর!'

পীথল উত্তর দিলেন, 'আপনি আমার কথার এমন অর্থোদ্ধার করছেন যে কথা আমি কখনও চিন্তাও করিনি। রাজধানীতে আপনি কী করে বন্দী হতে পারেন? আপনাকে বন্দী করার অধিকার একমাত্র বাদশাহেরই আছে। আপনার পূজ্য পিতৃদেব দানিয়াল শাহকে কিছু ক্ষমতা দিয়ে গেছেন। সেইজন্য তাঁর এখানেই থাকা প্রয়োজন।

আপনার সঙ্গে পাঠানো সম্ভব নয়।'

সেলিম কিছু বললেন না। দানিয়াল শাহকে শুনতে না দিয়ে পীথল বললেন, 'আমি যা বলছি, তা আপনার ভালর জন্যই বলছি। বাদশাহ এখনও আপনার প্রতি অপ্রসন্ন রয়েছেন। দানিয়াল শাহের যদি কিছু হয়ে যায় তাহলে তাঁর ক্রোধের সম্মুখীন কে হবে? আর এই সাহসে লাভ কি? এঁকে বাদশাহ নিজের উত্তরাধিকারী করবেন এ কি কথার মত কথা? এবং আপনি আমার দিকটাও তো দেখবেন। এখনই আপনি কিছু করলে বাদশাহ মনে করবেন যে তার মধ্যে আমিও আছি। তাঁর ক্রোধ আপনাকে করবে উত্তপ্ত আর আমাকে করবে ভস্ম। শুধু তাই নয় আমি বিশ্বাসহন্তাও হবো। এই সব চিন্তা করে এমন কাজ থেকে বিরত থাকুন যে কাজে লাভের পরিবর্তে ক্ষতি হয়।'

সেলিম উত্তর দিলেন, 'শত্রু মিত্র উভয় দিক থেকেই আমি শুধু বাধাই পাচ্ছি। শহর অবরোধ করলে বন্ধু আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামবে। নিজের শত্রুকে বন্দী করতে চাইলে স্নেহের দোহাই দিয়ে বাধা দেবে। এই যদি হয় তবে বন্ধু এবং শত্রুর মধ্যে তফাৎ কোথায় রইল?' এই কথার উত্তরে পীথল কিছু বললেন না। তিনি দানিয়াল শাহকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। সেলিমশাহ আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আগ্রহান্বিত নন। সুতরাং অনুগ্রহ করে একটু এঘরে আসুন।'

কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করে দানিয়াল শাহকে তার ভিতরে পাঠিয়ে তিনি বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। সেলিমের মনে হলো দানিয়াল শাহকে তাঁর হাত থেকে বাঁচানোই এর উদ্দেশ্য। পীথলের উপর তিনি একটি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি হানলেন কিন্তু কিছু বললেন না। পীথল তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনার আগমনের কথা দানিয়াল শাহ যখন জেনেছেন তখন নাসির খাঁ প্রমুখ অনেকেই সে কথা জেনেছে। সেই জন্য আপনি যদি এই পোশাকে ঐ পালকিতে যান তাহলে তাঁরা আপনাকে বন্দী করার চেষ্টা করবেন।' সেলিম ক্রুদ্ধ হলেন। ঝাঁঝিয়ে উঠে তিনি বললেন, 'বাদশাহ ছাড়া কে আমাকে বন্দী করতে পারে?

নাসির খাঁ আমার উপর হাত তুলবে।'

'আপনি আপনার স্বাভাবিক চেহারায় যদি যান তাহলে বোধ হয় কেউ কিছু করবে না' পীথল উত্তর দিলেন, 'কিন্তু গরু মারতে এসে পঞ্চ নাম জপ করে লাভ কি? সুতরাং যদি তাঁরা আক্রমণ করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন তাহলে আপনি তা রোধ করতে পারবেন না।'

'তাহলে আমাকে কী করতে হবে?'

'আপনি একজন রাজপুত যুবকের পোশাক পরে আমার দেহরক্ষী সেনার উপনায়ক হিসাবে দুর্গ পরিদর্শনের ভান করে মাদারী দরওয়াজা পর্যন্ত যান। আপনার অনুচরবৃন্দ আগেই সেখানে হাজির থাকবে।'

সেলিম মেনে নিলেন। পীথল বললেন, 'আমার পোশাক আপনার ঠিক হবে। তাড়াতাড়ি পোশাক বদলে নিয়ে যাত্রা করা দরকার।' তারপর এক জন ভৃত্যকে ডেকে তিনি কি যেন আদেশ করলেন।

সেলিম জিজ্ঞেস করলেন, 'দানিয়ালকে আপনি কি করবেন?'

'সিংহদ্বার দিয়ে আপনি বেরিয়ে যাওয়া মাত্র আমি তাঁকে প্রাসাদ পর্যন্ত নিজে পৌঁছে দিয়ে আসব। তার আগে ছাড়লে গণ্ডগোল করার চেষ্টা করতে পারেন। সেই জন্যই এরকম ব্যবস্থা।'

সেলিম সরবে হেসে উঠলেন, 'বেশ! তাহলে আরও কিছুক্ষণ সে এখানে বসুক। আমি তাড়াতাড়ি পোশাক বদলাই।'

ঘরের সামনের দিকে গিয়ে দানিয়াল শাহের সঙ্গে আগত কর্মচারীদের শুনিয়ে পীথল নিজের দেহরক্ষী সৈনিকদের আদেশ করলেন, 'রাত্রে খুব গোলমাল এবং উপদ্রব হওয়ার ভয় আছে। দ্বারপালকে সতর্ক করে দাও। যেই হোক কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেবেনা। রাত্রে দুর্গের উপর আক্রমণও হতে পারে! আশপাশের সব জায়গার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো। তোমাদের নায়ককে আমি ভাল ভাবে সব বলে দেবো।'

তারপর তিনি আবার কক্ষে ফিরে এলেন। সে সময় সেলিম একজন রাজপুত যুবকের বেশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। 'পীথল। আমার নাম কি? তোমার দেহরক্ষী সেনার উপনায়ক হলে তার একটা নামতো চাই।' সেলিম বললেন।

'নাম ? রাজকুমার দলপতি সিংহ ! এদিক দিয়ে আসুন। এই বার সবার সামনে দিয়ে এখন আমার পিছু পিছু আসুন।'

এইভাবে সেলিম শহরের বাইরে এলেন। প্রায় এক ঘন্টা পরে অনুচরবর্গ এসে জানালো যে শাহজাদা মাদারী দারওয়াজা অতিক্রম করেছেন। বালীর ল্যাজে বাঁধা রাবণের মত ঘরের মধ্যে বসে শাহজাদা দানিয়াল ক্রোধ, হতাশা এবং অপমানের দুঃখে গুণে গুণে সবাইকে অভিশাপ দিচ্ছিলেন। মনে মনে তিনি পীথলকে উচিত শিক্ষা দেওয়া প্রতিজ্ঞা করলেন। সেলিমকে তো তিনি মনে মনে বারকয়েক ফাঁসীই দিয়ে দিলেন। এই ভাবে তিনি যখন মনোরাজ্যে প্রতিকার ও প্রতিশোধে ব্যস্ত সেই সময় পীথল এসে দরজা খুলে দিলেন।

'এই বার আসুন ! কোন ভয় নেই।' দানিয়াল শাহকে বললেন।

ক্রোধাগ্নিতে জ্বলে উঠে দানিয়াল নীরবে বেরিয়ে এলেন। দৃষ্টিপাতের যদি দাহিকাশক্তি থাকতো তাহলে পীথল সে সময় ভস্ম হয়ে যেতেন। তাঁর চক্ষু দুটিতে প্রতিফলিত বিদ্বেষ, দুরভিসন্ধি ও প্রতিশোধ স্পৃহা পীথলের মনেও বিপদাশঙ্কা সৃষ্টি করলো। বিষাক্ত তীরের মত মত ঐ দৃষ্টিপাতের অর্থ ছিল।

'আমার জিঘাংসার কোন সীমা থাকবে না।' কোন কথা না বলে দানিয়াল শাহ নিজ প্রাসাদের দিকে চলে গেলেন।

আক্রমণকারীদের পাণ্ডাকে দলপতি সিংহ হাঙ্গামার জায়গা থেকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন পীথল প্রেরিত সংবাদটি পৌঁছে দেওয়ার জন্য সেখান থেকে শেঠ কল্যাণমলের বাড়িতে গেলেন। তাঁর মন নানা চিন্তার রঙ্গভূমি হয়ে উঠেছিল। দানিয়াল শাহ সুরজমোহিনীকে নিজের অন্তঃপুরে নিয়ে যেতে চান—একথা জানার পর থেকে তাঁর মন ব্যাকুল হয়েছিল। সেই ম্লেচ্ছ যে তাঁর প্রিয়তমাকে চায় এটাই তাঁর দৃষ্টিতে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে হচ্ছিল। তার উপর শেঠজীকে ডেকে নিজের ইচ্ছা পূর্ণ করে দিতে বলা তো তাঁর কাছে মহাপাতকের সমান বোধ হল। মোগলদের আশ্রিত হওয়ার জন্য এবং আগ্রা আসার জন্য তিনি অনুতপ্ত হলেন। প্রতাপ সিংহ ছাড়া সব রাজপুতই যেখানে

আকবরের অধীনতা মেনে নিয়েছেন সেখানে ছোট একটি রাজ্যের অধিপতি হয়ে মোগলদের বিরোধীতা করা নিরর্থক ভেবেই তিনি এখানে এসেছিলেন। কিন্তু রাজধানীতে এসে এখানকার সব রীতিনীতির সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় ঘটার পর তাঁর মনে হচ্ছে যে এখানে আসা ভুল হয়েছে এবং এরফলে তিনি তাঁর পৌরুষকে নষ্ট করেছেন। ক্রোধে দুঃখে তাঁর মন ভরে গেল। কিন্তু করার কি ছিল? মহাপরাক্রান্ত রাজা পৃথ্বী সিংহও যখন মোগলদের অধীনে রয়েছেন ক্ষুদ্র একটি রাজ্যের রাজ্য ভ্রষ্ট তাঁর মত রাজার তখন কি অধিকার থাকতে পারে? একমাত্র কল্যাণমলের ভরসাই তাঁর কাছে আশার আলোক স্বরূপ। ডেকে এনে বলা সত্ত্বেও তিনি যে দানিয়াল শাহের ইচ্ছার প্রতি অনুকূল মনোভাব দেখাননি সেই সাহসের জন্য মনে মনে তিনি শেঠজীর প্রশংসা করলেন। বাদশাহ দূরে গেলে রাজকুমার বলপ্রয়োগ করবেন এই আশঙ্কায় কল্যাণকে আগে থেকেই অন্যত্র সরিয়ে দেওয়ার বুদ্ধিকে তিনি অসাধারণ বলেই মনে করলেন। শাহজাদার ইচ্ছার প্রতিকূলতা করার ফলে তাঁর উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়তে পারতো। তিনি কারাগারে নিক্ষিপ্তও হতে পারতেন। আদেশ লঙ্ঘনকারীকে হত্যা করাও ঐ অপরিণামদর্শী যুবকের পক্ষে অসম্ভব নয়। বাদশাহ অবশ্য শেঠজীর প্রতি খুবই কৃপাশীল ছিলেন। কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূর থেকে এই সময় তিনি কি করতে পারতেন? এই সব ভেবে কল্যাণমলের প্রতি দলপতি সিংহের মনে শ্রদ্ধার ভাব বেড়েই গেল।

সুরজমোহিনীর অবস্থার কথা চিন্তা করে তাঁর সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছিল। সে এখন কোন পথ দিয়ে যাচ্ছে? তখনকার দিনে রাজপথ সুরক্ষিত ছিল না। তার উপর পথিক যুবতী স্ত্রীলোক হলে তার বিপদ কহতব্য নয়! এই কথা চিন্তা করেই কি তাঁদের পথ এবং নির্দেশের কথা কাউকে জানাতে বারণ করেছে? পথের অসুবিধা ও বিপদের কথা চিন্তা করে তাঁর হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠলো। বিপদাশঙ্কার মূল হচ্ছে অধিক স্নেহ। তিনি যদিও জানতেন যে কল্যাণমল তাদের নিরাপত্তার পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থাই করেছেন তবুও উক্ত কারণে তাঁকে কেন

পাঠানো হলো না তা ভেবে তিনি দুঃখিত হলেন। তাঁর মন সম্পূর্ণভাবে সুরজমোহিনীকে অনুসরণ করে চলছিল।

দলপতি সিংহ যখন শেঠজীর বাড়ি পৌঁছলেন তখন তিনি আহারান্তে ভাগবত পাঠ করছিলেন। দলপতি সিংহকে দেখেই তিনি বুঝলেন যে তাঁর আগমন কোন প্রয়োজনীয় কার্যোপলক্ষ্যেই হয়েছে। তিনি বললেন, 'এসো, বসো। কী ব্যাপার?'

দলপতি সিংহ বললেন, 'নিজের কাজের কথাটাই আমি আগে বলছি। মহারাজা পৃথ্বী সিংহের কাছ থেকে খবর নিয়ে আমি এসেছি।'

'মহারাজের কুশল তো? দুদিন দেখা করতে পারিনি।'

'হ্যাঁ কুশলেই আছেন। আপনার পৌত্রী কোথায় এবং কোন পথে গেছে তার খবর কেউ যেন না পায় এই কথা বিশেষ ভাবে বলার জন্য তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। এ ব্যাপারে খুব সতর্ক হবেন।' কথাটি শোনামাত্র শেঠজীর মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো। নিশ্চয় বিশেষ কোন কারণ থাকায় পীথল এই ধরনের খবর পাঠিয়েছেন, এটা তিনি বুঝেছিলেন। বিপদ কোন দিক থেকে আসতে পারে তা তিনি জানতেন। কিন্তু তা কোন আকারে আসবে তা ভেবে তিনি কোন কিনারা করতে পারছিলেন না। খবর থেকে এটুকু তাঁর কাছে স্পষ্ট হলো যে সুরজমোহিনীর বাইরে যাওয়ার সংবাদ দানিয়াল শাহ পেয়েছেন। এত গোপনে অনুষ্ঠিত কাজ কি করে প্রকাশ পেলো? আর প্রকাশ পাওয়া মানেই তো নির্দিষ্ট স্থান এবং পথের কথাও গোপন না থাকা। তা যদি সত্য হয় তাহলে পথ থেকে তাকে অপহরণ করা দানিয়াল শাহের পক্ষে অসম্ভব নয়। শেঠজী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন। সে সময় যে তাঁকে দেখতো সে-ই ধাঁধায় পড়ে যেত এই ভেবে যে ইনি সত্যিই কি রত্ন ব্যবসায়ী না কোন প্রবল পরাক্রমশালী রাজকেশরী। ক্রমবর্দ্ধমান ক্রোধকে সংযত করে বললেন, 'এ খবর কেন দেওয়া হয়েছে জানেন কি?'

দলপতি সিংহ বললেন, 'অল্পস্বল্প জানি। সম্পূর্ণ জানি না। আজ সন্ধ্যায় দুর্গের ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করে ফিরতে মহারাজা সংবাদ পেলেন যে অবিলম্বে দানিয়াল শাহের সঙ্গে দেখা করতে হবে। তিনি

তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে কী কথা হয়েছে জানি না। বাইরে এসে খবর দিয়ে আপনার কাছে পাঠালেন।'

দানিয়াল শাহের কামনার কথা শেঠজীর জানা ছিল। তাই তিনি অনুমান করলেন যে ঐ বিষয়েই তিনি পীথলকে ডেকে ছিলেন। তাহলে সুরজমোহিনীর যাত্রার খবর পৃথ্বী সিংহের মুখ থেকেই তিনি শুনে থাকবেন। নীতি-নিপুন পীথল প্রকৃত অবস্থার কথা নিশ্চয় তাঁকে জানান নি এই ভরসায় তিনি কিছুটা অবশ্য আশ্বস্ত হলেন। তবুও সুরজ-মোহিনীর যাত্রার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সঙ্গের কয়েক জন এবং অপর দুতিনজন ভৃত্যের জানা ছিল। সেই জন্য যথা সম্ভব সত্বর লোক পাঠিয়ে তার পথ এবং নির্দিষ্ট স্থান পরিবর্তিত করার সিদ্ধান্ত করলেন।

শেঠজী বললেন, 'বেশ। মহারাজকে আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করবেন। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এখনই করছি। সব দিকে সতর্কও থাকবো।'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন. 'আমি তাঁকে বলব। কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞেস করব? আপনি আপনার পৌত্রীকে এত দূরে পাঠাবার সময় তার সঙ্গে অনুচর হিসাবে আমাকে পাঠানোর কথা চিন্তা করলেন না—এটা আমার প্রতি আস্থাহীনতার দ্যোতক নয় তো?'

'আপনি এর জন্য দুঃখিত হবেন না। প্রথমে আমি তাই ভেবে-ছিলাম। এ ব্যাপারে আমি যখন পীথলের সঙ্গে আলোচনা করলাম তখন তিনি পরামর্শ দিলেন যে এখানেই আপনার বেশি প্রয়োজন এবং সুরজমোহিনীর নিরাপত্তার জন্য সৈনিকদের পাঠানোই ঠিক হবে।'

'বাদশাহের জ্ঞাতসারে তাঁরই সৈন্যদের প্রহরায় কি কুমারী গেছে, এটাই কি তাহলে বুঝতে হবে?'

'হাঁ! কিন্তু কী কারণে সে তীর্থ যাত্রায় যাচ্ছে তা তিনি জানতেন না। আমার প্রতি করুণায় এবং পৃথ্বী সিংহের অনুরোধে তিনি রাজ অতিথির এই সম্মান আমাকে দিয়েছেন।'

'তা হলে ভয়ের কিছু নেই, না?'

'অত জোর দিয়ে বলা যায় না। বাদশাহ অনেক দূরে গেছেন। অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি পদাধিকারী হয়ে রয়েছে। সেইজন্য প্রয়োজনমত

সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত।'

'ফিরে আসতে কত সময় লাগবে? এটা ভাববেন না যে আমি তাড়াহুড়ো করছি। বিয়ে হয়ে গেলে কোন অসুবিধা থাকবে না।'

শেঠজীর হাসি পেলো। যুবকদের মন কেবল নিজেদের সুখের দিকেই দৌড়ায়। তিনি বললেন, 'মনে নেই সেদিন কি বলেছিলাম? রাজার উত্তরাধিকারী রাজকুমারদের স্বজাতি ছাড়া বিয়ে করতে নেই।'

'অমন কথা বলবেন না। আপনি ভালভাবেই জানেন যে আমার রাজ্যাধিকার নেই। যদি থাকেও আমি তা ত্যাগ করতে প্রস্তুত।'

'এ ব্যাপারে এখন চিন্তার প্রয়োজন নেই। আর একটি বাধা আছে। শোনা যাচ্ছে দানিয়াল শাহ মেয়েটিকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। এটা নিজেদের মধ্যে গোপন করার আবশ্যকতা নেই। আমি তাকে বলেছি বাদশাহের আদেশ ভিন্ন আমি তা পারবো না। সেই জন্য বাদশাহকে সমস্ত কথা না বলে কিছু করা অনুচিত হবে। একটা কথা বলবো? সুরজমোহিনী আমার পৌত্রী নয়। সে আমার আশ্রিতা। আমি এবং তার দিদিমা আপনার প্রস্তাব সমর্থন করি। সেইজন্য কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে। বাদশাহ ফিরে এলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বাদশাহ কবে নাগাদ ফিরবেন? দক্ষিণের যুদ্ধ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কি সেখানে থাকবেন?'

'বলতে পারি না। তাঁর গুরুদেব শেখ মুবারকের অসুস্থতা খুবই বেড়েছে। বয়সও অনেক হয়েছে। এই অবস্থার কথা জানানোর জন্য বার্তাবাহক গেছে। সেলিম শাহ কি করেন সেটাও দেখা দরকার। তিনি যদি গোলযোগ আরম্ভ করেন তাহলে বাদশাহ বেশি দিন থাকবেন না। সব দিক চিন্তা করে আমার মনে হচ্ছে মাস দুয়েকের মধ্যেই ফিরবেন।'

'একটা কথা আপনাকে এখনও বলিনি। দানিয়াল শাহের প্রাসাদ থেকে ফিরে আসার পথে চার-পাঁচ জন লোক মহারাজাকে হত্যার চেষ্টা করেছিল। ভগবানের কৃপায় কোন অমঙ্গল হয়নি। আততায়ীদের মধ্যে একজন নিহত হয়েছে এবং তাদের নেতাকে ধরা হয়েছে।'

'কি? পীথলকে হত্যার চেষ্টা? সম্পূর্ণ বল। তাঁর উপর যখন

আক্রমণ হয়েছে তখন এর পিছনে বড় চক্রান্ত আছে।'

'সে রকম কিছু মনে হচ্ছে না। কোন একটা ভুলের ফল। আততায়ী 'নারীহরণকারী বলে চিৎকার করে তাঁর উপর আক্রমণ করেছিল।'

'তাই নাকি? বিস্তারিত ভাবে বলো কি হয়েছিল।'

'আমি বললাম না দানিয়াল শাহের আদেশ অনুসারে সন্ধ্যায় আমরা ওখানে গিয়েছিলাম? ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। রাজপথের যে জায়গাটায় বেশি অন্ধকার সেখানে চার জন সশস্ত্র ব্যক্তি এই সেই মেয়ে-চোর! রাক্ষস! বলতে বলতে মহারাজার উপর আক্রমণ করল। তারা নানা রকমের কটুবাক্য বলছিল। তাদের কথায় বোঝা গেল যে মহারাজকে তারা হিন্দু স্ত্রীলোকদের অপহরণ করে মুসলমানদের উপহারদানকারী দুর্বৃত্ত ভেবেছিল। আক্রমণকারী লোকটি হিন্দু এবং অস্ত্রবিদ্যায় পটু ছিল।'

'ঘটনাটা ভুল বশত ঘটেছে বলে তুমি যে সিদ্ধান্ত করেছ তা আমার কাছে ঠিক বলে মনে হচ্ছে না। এর মধ্যে আরও গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। এ ব্যাপারে অবিলম্বে অনুসন্ধান আবশ্যক। একটু দাঁড়াও, আসছি।'

বাইরে গিয়ে শেঠজী তাঁর ভৃত্যকে ডেকে কি যেন বললেন। শেষে বললেন, 'এখনই যাও। বলবে রাত্রের মধ্যেই প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করার জন্য আমি আদেশ করেছি। কাল দুপুরের মধ্যে এসে জানাবে।'

তারপর তিনি অন্যান্য ভৃত্যদের ডেকে আরও কিছু আদেশ করলেন। এইভাবে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যস্ততার মধ্যে কাটিয়ে তিনি আবার দলপতি সিংহের কাছে ফিরে এসে প্রশ্ন করলেন 'আচ্ছা, আততায়ীদের সেই পাণ্ডাটি কোথায়? তোমার দায়িত্বেই আছে তো?'

'সে আমার ভৃত্যদের হেপাজতে আছে। আঘাতের ফলে অজ্ঞান হয়ে আছে। ফিরে তার কাছ থেকে সব কথা জানতে চেষ্টা করবো।'

'ঠিক আছে। কাল আমি এসে তার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার সঙ্গে আর একজন লোক যাবেন। তাঁকে যাতে আর কেউ না চিনে নেয় তার ব্যবস্থা করে রাখবেন।'

ঐ আদেশকে দলপতি সিংহ শিরোধার্য করলেন। শেঠজীর মুখের

দিকে তাকিয়ে তিনি বুঝলেন যে তিনি গভীর কোন এক চিন্তায় মগ্ন। সুতরাং সবিনয়ে বিদায় গ্রহণ করে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

গুলাবের সেবার ফলে মূর্ছিত আততায়ী ধীরে ধীরে চোখ মেললো। 'আমি কোথায়? আপনারা কে?' প্রভৃতি প্রশ্ন সে করতে থাকলো। দলপতি সিংহের নির্দেশ ছাড়া এসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া গুলাব ঠিক মনে করল না। উত্তর না পেয়ে সে চোখ বন্ধ করে শুয়ে রইল। হঠাৎ আবার সে চিৎকার করে উঠলো, 'হায়রে আমার পদ্মিনী! আমার পদ্মিনী! আমি কি স্বপ্ন দেখছি?' করুণ স্বরে নিজের নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনে পদ্মিনী ঐ ঘরে এসে হাজির হলো এবং আহতকে দেখে 'বাবা আমার' বলে তার বক্ষলগ্ন হলো। তাকে আহত দেখে দুঃখে সে কাঁদতে লাগল। 'আমি কার ঘরে রয়েছি? তুমি এখানে কি করে এলে?' আহত বৃদ্ধ প্রশ্ন করলো এবং আবার তার মুখ ক্রোধে হঠাৎ রক্তবর্ণ ধারণ করল। সে বলতে থাকল, 'হায় এও আমাকে দেখতে হলো! আমার মেয়েকে যে চুরি করেছে তারই ঘরে আমি এসে পড়লাম? ছিঃ! বদ্ মেয়ে কোথাকার! দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে। আমি তোকে দেখতে চাই না!' সে গর্জন করে উঠলো।

'ও বাবা! ওকথা বলবেন না। আপনি একজন সৎ রাজকুমারের ঘরে রয়েছেন। তিনি আমাকে ঠকাননি, ঈশ্বরের কৃপায় আমি নির্দোষই আছি।' বালিকা বলল।

'তাহলে তুমি এখানে কি করে এলে?'

এই প্রশ্নের উত্তরে সমস্ত ঘটনা সবিস্তারে সে বর্ণনা করল। কাশিম বেগ কর্তৃক আপহৃত হওয়া, হীরাজানের বাড়িতে অবস্থান এবং তারপর দলপতি সিংহের বাড়িতে আসা পর্যন্ত সমস্ত কাহিনী শুনে নিয়ে সে বলল, 'কিশন রায়ের বাড়িতে পাঠাবার চেষ্টাও করেছেন। আমার অনুরোধেই আপনাকে না পাওয়া পর্যন্ত এখানে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।'

সে যখন কথা বলছিল তখন দলপতি সিংহ বাড়ি ফিরলেন। আহত ব্যক্তির ঘরে এসে তিনি পদ্মিনীকে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে দেখলেন। কিশন রায়ের কাছ থেকে গজরাজের কাহিনী তিনি শুনেছিলেন।

সেইজন্য লোকটির হত্যা প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য এখন তাঁর বোধগম্য হলো। কিন্তু কি কারণে এবং কার প্রেরণায় রাজা পীথলের উপর আক্রমণ করেছিল তা তিনি বুঝতে পারলেন না। নিজের স্ত্রীর অপহরণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা সে করেই রেখেছিল। কন্যার শ্লীলতা হানি যে ব্যক্তি করেছে তার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক ভাবেই সে তৎপর হবে। কিন্তু এ সমস্তের জন্য পীথলকে যে দোষী করা হবে তা বিশ্বাসের অযোগ্য। দলপতি সিংহ অনুমান করলেন যে হয় অজ্ঞতার ফলে নতুবা কোন কুচক্রী দলের প্রেরণায় এটা ঘটেছে। যে কোন কারণেই হয়ে থাক, আসল ব্যাপারটা জানা দরকার। সুতরাং তিনি আহত ব্যক্তির খাটের কাছে গেলেন। পদ্মিনীও ঘোমটা টেনে সেখান থেকে চলে গেল।

দলপতি সিংহ জিজ্ঞেস করলেন, 'সব ঠিক আছে? পটি ঠিকমত বাঁধা হয়েছে? এখন ব্যথা কি একটু কমেছে?'

গজরাজ উত্তর দিল, 'ক্ষত খুব বেশি নয়। ব্যথাও কম। কিন্তু আমি খুব দুঃখিত যে এই রকম কৃপাশীল উদারহৃদয় মানুষের প্রতি দারুণ অপরাধ করেছি। আপনাদের দৃষ্টিতে আমি একজন হত্যাকারী।'

'মহাশয়! আপনি হিন্দু কুল-সূর্য মহারাজ পৃথ্বী সিংহ রাঠোরকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার চেষ্টা ফলবতী হয়নি।'

'হায়! ভগবান! আমি কি মহানুভব পীথলকে আক্রমণ করেছিলাম? তাঁর জন্য আমি যে মরতেও প্রস্তুত!'

'তাহলে কি ভেবে আপনি এই কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?'

'আমি জানতাম যে দানিয়াল শাহের অনুচর এক রাজপুত সৈনিক আমার কন্যার সর্বনাশের চেষ্টা করেছে। অনুসন্ধানে রত থাকার সময় এক বন্ধু লাভ করলাম। সেই আমাকে চিনিয়ে দিয়েছিল।'

একথা শুনে দলপতি সিংহ কিছুক্ষণ চিন্তা মগ্ন রইলেন। এই ঘটনার পেছনে দানিয়ালের বা নাসির খাঁর কোন অনুচর রয়েছে বলে তাঁর মনে হলো। রাজার প্রতি এই দুজনের শত্রুতা রয়েছে বলেই দলপতি সিংহের মন ওদিকে গেল। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, আপনি বলুনতো সেই বন্ধুটি দেখতে কেমন? দেখে চিনতে পারার মত কোন চিহ্ন তার

মুখে আছে কি ?'

'রঙ ফরসা। শরীর হৃষ্টপুষ্ট ও দীর্ঘকায়। সন্ধ্যায় দেখা হয়ে ছিল বলে মুখ প্রভৃতির বর্ণনা আমি দিতে পারবো না। কিন্তু একটা বেশ স্পষ্ট চিহ্ন আছে—মুখমণ্ডলে একটি ক্ষত।'

'ডানদিকে না বাঁদিকে ?'

'ডানদিকে।'

'এইবার বুঝতে পেরেছি। আপনার উৎসাহদাতা কাশিম বেগ ব্যতীত অপর কেউ নয়। সেই আপনার মেয়েকে অপহরণ করেছিল।'

গজরাজ নিঝুম অবস্থায় পড়েছিল। আবার ক্রোধে উত্তেজিত হয়ে উঠলো। দলপতি সিংহের মনে হলো সে হয়ত এখনই উঠে দুঃসাহসিক অভিযানের উদ্দেশ্যে দৌড় লাগাবে। তিনি তাকে বোঝাতে লাগলেন, 'বন্ধু, এখন তাড়াহুড়ো করবেন না। আপনার কষ্টের কথা আমি অনেক কিছু জানি। তার প্রতিকারের সব ব্যবস্থাই হবে। দ্রুততায় লাভ নেই। শরীরটাকে সম্পূর্ণ সুস্থ হতে দিন। ঘটনা জানার পর মহারাজা পৃথ্বী সিংহও আপনার সাহায্যকারী হয়ে যাবেন। এখন মেয়েকে তো পেয়েছেন। তার সেবায় আপনি শীঘ্রই সেরে উঠবেন।'

গজরাজ বলল, 'আপনি আমার প্রতি যে কৃপা দেখাচ্ছেন তার জন্য আমি সর্বদা ঋণী থাকবো। পদ্মিনী নিজে বলেছে আপনি সেই দানবদের হাত থেকে আমার মেয়েকে বাঁচিয়েছেন। একথা আমি কখনও ভুলতে পারবো না। আজ থেকে গজরাজের জীবন আপনার হাতে।'

চিন্তা ভারাক্রান্ত মনে দলপতি সিংহ শয়নগৃহে প্রবেশ করলেন। পীথলকে হত্যার এই চেষ্টা কাশিম বেগ নিজে করতে পারে না। স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য সে সব কিছুই করতে পারে কিন্তু পীথলের উপর হাত তোলার সাহস তার কিছুতেই হতে পারে না। সেই জন্য একাজ অবশ্যই নাসির খাঁ অথবা দানিয়াল শাহের উৎসাহ দানের ফলেই হয়েছে। এবং তা যদি হয়ে থাকে তাহলে বুঝতে হবে রাজ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের এটি একটি ভূমিকা। বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে এঁরা তিনজন যদি একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন তবে অনেক কিছুই ঘটতে পারে।

বাদশাহ রয়েছেন সুদূর দক্ষিণে। বড় একটি সেনাদল নিয়ে শত্রুরূপে সেলিম রয়েছেন আজমীরে। রাজধানীতে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের মধ্যেই এই ধরনের মনোমালিন্য! সমস্ত কারণের ফলে যে সঙ্কটের উৎপত্তি হবে তার কথা ভেবে দলপতি সিংহ ভীত হয়ে পড়লেন। সৈন্যদলের সর্বাধিনায়ক পীথল যখন জানতে পারবেন যে নাসির খাঁর দেহরক্ষী সৈন্যের নায়কই তাঁকে হত্যার প্রেরণাদাতা তখন তিনি কি করবেন?'

কল্যাণমল সকালেই দলপতি সিংহের গৃহে পদার্পণ করলেন। দলপতি সিংহ তখন নিত্যকার্যে ব্যস্ত। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ প্রকাশ না করেই শেঠজী গজরাজের কক্ষে গিয়ে হাজির হলেন। গজরাজের কোন কথাই তাঁর জানা ছিল না বলে তিনি গোড়া থেকেই সবকিছু জেনে নিলেন। পত্নী অপহরণকারী ব্যক্তি কবে এসেছিল সেটা তিনি জেনে নিলেন। সুবেদারের কাছে যে নালিশ করা হয়েছিল এবং তার যে জবাব পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি জানার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখে থমথমে একটা ভাব এসে গেল। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। চারবাগে রুগ্ন অবস্থায় পড়ে থাকা এবং কন্যার উপর বিপদের ঘটনা ইত্যাদির যখন সে বর্ণনা করতে আরম্ভ করল তখন শেঠজী বললেন, 'এ সমস্ত আমি জানি। মেয়েটি এখন এখানেই আছে না? আপনি যে তার পিতা তা এখন জানতে পারলাম। এখন কি করতে চান আপনি?

গজরাজ বলল, 'আমার একটিই মাত্র বাসনা আছে। যে অধমরা আমার স্ত্রীকে কলঙ্কিত করে আমার এই হাল করেছে তাদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ নেবো। তার জন্য আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। যা ঘটুক না কেন এ আমি করবোই।'

কল্যাণমল বললেন, 'আপনার ইচ্ছা স্বাভাবিক এবং ন্যায়সঙ্গত। কিন্তু তার জন্য সতর্কতা এবং সুবিবেচনার প্রয়োজন। তা না হলে এখানকার মত অসুবিধায় পড়তে হবে। এর জন্য একটু অপেক্ষা করতে হবে। শত্রু খুবই শক্তিশালী। তার বিরুদ্ধে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ না করলে কোন লাভ হবে না।'

'আপনার কি পরামর্শ? আমার কি করা উচিত?'

'আমি চিন্তা করে বলব। আগে অনেক কিছু অনুসন্ধানের আছে। কোন অবস্থাতেই আমাকে জিজ্ঞেস না করে কিছু করবেন না। আর যদি আপনার স্ত্রী জীবিত থাকেন তা হলে...'

'বেঁচে আছে তো?' কথার মাঝ খানেই গজরাজ প্রশ্ন করল।

'এ ব্যাপার নিশ্চিত রূপে কিছু বলা যায় না। তবুও যদি জীবিত থাকেন তাহলে আপনার কাছে এনে দেবো। সম্রাটকে সমস্ত কথা বলে আপনি যাতে ন্যায় বিচার পান সে ব্যবস্থা করতে মহারাজ পৃথ্বী সিংহ সক্ষম হবেন। কিন্তু তার আগে কিছু ঘটিয়ে ফেললে মুশকিল হয়ে যাবে।'

'আক্রমণকারীদের তাহলে কোন দণ্ডই দেওয়া হবে না?'

'আগে আপনার স্ত্রীকে বাঁচাতে হবে তারপরে আক্রমণকারীদের সাজা দেওয়ার কথা ভাবা যাবে। আমার একটি প্রার্থনা আছে। এক হপ্তা পর্যন্ত আপনি কোথাও যাবেন না। আপনি কোথায় আছেন সে খবর কাশিম বেগ যেন না পায়। আর যা করতে হবে, বলে দেবো।'

'আপনার যা অভিরুচি।' চিন্তিতভাবে গজরাজ উত্তর দিল. 'কিন্তু যদি এক হপ্তা পর্যন্ত কোন খবর না পাই তাহলে আমি চুপ করে থাকবো না। আমি জানি, প্রবল ক্ষমতাবান ওমরাহদের অন্তঃপুর থেকে মেয়েদের বের করে আনা সহজ কাজ নয়। তার জন্য আমি চেষ্টাও করবো না। কিন্তু অপমান যে করেছে তাকে হত্যা করা আমার আয়ত্তাধীন। ঈশ্বর সে সুযোগ আমাকে নিশ্চয় দেবেন।'

সেলিমের চাবুক খেয়ে এসে দানিয়ালের অবর্ণনীয় দুঃখ এবং ক্রোধ হলো। সেলিমের গালাগালের জন্য তাঁর মনে যতটা ব্যথা বেজেছিল মার খাওয়ার দরুণ ততটা নয়। তিরস্কার সহ্য করার ক্ষমতা তাঁর মধ্যে ছিলনা। অস্থির-চিত্ত এবং দুর্বলদের স্বভাবসিদ্ধ অহঙ্কারের তিনি ছিলেন প্রতিমূর্তি। পীথলের সামনে সেলিম তাঁকে যে গালাগাল করলেন তাতে তিনি ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলে মনে করলেন। কিন্তু সেলিমের কিছু করার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। সেই জন্য পুরো রাগটা গিয়ে পড়ল পীথলের উপর। তিনি তাঁকে অপমানের হেতু এবং একমাত্র রাজপুত সাক্ষী মনে করলেন। যে কোন অবস্থায় তিনি ঐ উদ্ধত

রাজপুতকে, যে তাঁর সমস্ত উচ্চাকাঙ্খা পূরণের পথে প্রবল বাধা হিসাবে দাঁড়িয়েছে, ভালমত শিক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত করলেন। নিদ্রাদেবী সে রাত্রে আর তাঁর উপর প্রসন্ন হলেন না। তাঁর আশপাশের লোকজনকে এবং অন্তঃপুরের মহিলাদেরও সেদিন ভাল লাগল না। পীথলকে কি ভাবে আয়ত্তে আনা যায়, কি ভাবে তাঁকে কষ্ট দেওয়া যায়, কোন পদ্ধতিতে তাঁকে অপমানিত করা সম্ভব এবং অবশেষে কোন উপায়ে তাঁকে বধ করা যায় এই সমস্ত চিন্তায় সে রাতটা তাঁর কাটলো। পরদিন সকালেই ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থার ব্যাপারে পরামর্শের জন্য নাসির খাঁকে ডেকে পাঠালেন। মুখমণ্ডলে আঘাতের চিহ্ন থাকায় তিনি অন্তঃপুর-বাসী হতে বাধ্য হয়েছিলেন। নাসির খাঁ অত্যন্ত বিষণ্ণভাবে তাঁর কক্ষে প্রবেশ করে বললেন, 'হুজুর! একটি বড় দুঃসংবাদ এনেছি। আমাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙে পড়েছে!'

দানিয়াল প্রশ্ন করলেন, 'কী হয়েছে?'

'শেখ মুবারক কাল রাত্রে পরলোক গমন করেছেন। আপনি জানেন, তাঁর সাহায্য আমাদের পক্ষে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি দু-এক হপ্তা ধরে পীড়িত ছিলেন। কিন্তু এত শীঘ্র যে মৃত্যু আসবে কেউ জানত না। এই সংবাদে বাদশাহ সালামতেরও অসীম দুঃখ হবে। শেখ সাহেবকে তিনি নিজের পিতার মত মনে করেন।'

'শেখ সাহেবের মৃত্যু যদি হয়ে থাকে তাহলে আমাদের সব কাজ মাটি হয়ে যাবে। খাঁ সাহেব, তিনি কি অসুখে মরেছেন না আমাদের শত্রুরা যমরাজের সাহায্যকারী হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটিয়েছে?'

'তাও হতে পারে।' নাসির খাঁ চিন্তান্বিত ভাবে উত্তর দিলেন, 'তাঁর মৃত্যুতে শত্রুপক্ষের নিরঙ্কুশ লাভ। পীথলকে সেনাপতি করার বিরোধী ছিলেন শেখ সাহেব। একথা আমি জানি, পীথলও বোধ হয় জানে।'

'তাহলে আমার আর কোন সন্দেহ নেই। সেই বদমাইস রাজপুত নিশ্চয় বিষ দিয়ে হত্যা করিয়েছে। শীঘ্র একজন লোক পাঠিয়ে বাদশাহ সালামতকে খবর দিতে হবে। এর প্রমাণও আমার কাছে আছে। কাল রাত্রের কথা বোধ হয় আপনার জানা নেই।'

'কী ?'

পীথলের কাছে ছদ্মবেশে সেলিমের আগমন, গুপ্তচরের মাধ্যমে খবর পেয়ে নিজে পীথলের বাড়িতে গমন করেন এবং সেখানকার সমস্ত ঘটনার কথা দানিয়াল নাসির খাঁকে শুনিয়ে দিলেন। হাতের মুঠোর মধ্যে সেলিমকে পেয়েও তাকে বন্দী করতে পীথল স্বীকৃত হননি, চাবুক দিয়ে সেলিম যখন তাঁকে মারলো পীথল তখন তাঁকে সাহায্য না করে দাঁড়িয়ে দেখলেন। এ সবই রাজদ্রোহের প্রত্যক্ষ প্রমাণ। তিনি বললেন।

নাসির খাঁ বললেন, 'এই যদি হয় তাহলে সেলিম শাহ পীথলের সহযোগিতায় রাজধানী দখলের চেষ্টা করবেনই। যদি তিনি রাত্রে এখানে এসে থাকেন তাহলে তাঁর সৈন্য বাহিনীও কাছাকাছি কোথাও আছে। এই রাজদ্রোহী বিলম্ব না করে রাজধানী তাঁর হাতে তুলে দেবে। এ সবই সবিস্তারে বর্ণনা করে বাদশাহ সালামতের কাছে লিখে পাঠানো দরকার।'

দানিয়াল অবিলম্বে এই মর্মে একটি দীর্ঘ পত্র লিখে পাঠিয়ে দিলেন। পীথল রাজদ্রোহী, তিনি সেলিমের নির্দেশে বিষ প্রয়োগে শেখ মুবারককে হত্যা করেছেন, শোনা যাচ্ছে সেলিম একটি বড় বাহিনী নিয়ে রাজধানী অবরোধ করার জন্য এগিয়ে আসছেন ইত্যাদি ঘটনা সেই চিঠিতে লেখা ছিল। দানিয়াল এবং নাসির খাঁ জানতেন যে এই চিঠি পাওয়া মাত্রই বাদশাহ আগ্রায় ফিরে আসবেন এবং সেই সময় পীথলের সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হবে। সেই জন্য চিঠিটি যথা সম্ভব শীঘ্র পৌছানোর ব্যবস্থা করে এবং বিজয় হস্তগত হয়েছে ভেবে তাঁরা খুব সন্তোষ লাভ করলেন।

সেলিমের বাহিনী যে নগর অবরোধ করতে আসছে এ খবর সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ল। একদিক থেকে কথাটা সত্যও ছিল। সেলিমের কাছে যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল, শাবাস খাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার উপর সেলিমের একক কর্তৃত্ব এসে গেল। রাজা জগন্নাথের নেতৃত্বে যে পঁচিশ হাজার পদাতিক সৈন্য আগেই যাত্রা করেছিল তারা আগ্রার কাছাকাছি এসে গিয়েছিল। নতুন সেনাপতি ভগবান দাসের অধিনায়কত্বে অবশিষ্ট সৈন্য দলের আগমন প্রতীক্ষায় তারা আগ্রা থেকে সাত মাইল

দূরে তাঁবু ফেলে ছিল। দুদিনের মধ্যে ঐ বাহিনী এসে গেলেই আগ্রাকে অবরোধ করা হবে বলে সেলিম স্থির করেছিলেন।

আমি সসৈন্যে রাজধানীর কাছে এসে গেছি, সুতরাং পূর্ণ প্রস্তুতিসহ তোমরা এসে আমায় স্বাগত জানাও এবং নগরের চাবিও আমার হাতে সমর্পণ কর---এই মর্মে পীথলও দানিয়ালের কাছে দ্রুত খবর দেওয়ার জন্য দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। দানিয়াল তার কোন উত্তর দেন নি। বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে পীথল ঐ দূত মারফতই জবাব পাঠিয়ে দিলেন যার বক্তব্য হচ্ছে, 'মহামান্য বাদশাহ দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত রাজধানীর ভার আমার উপরই আছে। মহামান্য বাদশাহের হস্তাক্ষর যুক্ত মুদ্রাঙ্কিত আদেশ পত্র না পাওয়া পর্যন্ত ঐ দায়িত্ব দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত হতে পারে না। কেউ যদি সম্রাটের আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তবে তাকে রাজদ্রোহী হিসাবে দণ্ড দিতে আমি সঙ্কুচিত হবো না। এত বড় বাহিনী নিয়ে আগ্রা শহরের নিকটবর্তী হওয়াকেই আমি মহামান্য বাদশাহের আদেশ অমান্য করা বলে মনে করি। এই সময়, এই ভাবে বিদ্রোহের পতাকা না উড়িয়ে ফিরে যাওয়াই উচিত হবে। যে কোন অবস্থায় আপনি যদি এমন কাজ করেন যা রাজধানীর নিরাপত্তার প্রতিকূল তাহলে মহামান্য বাদশাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হিসাবে গণ্য করে আমাকে যুদ্ধ করতে হবে।'

পীথলের সঙ্গে আলাপ করে সেলিম এটা বুঝেছিলেন যে তাঁর কাছ থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না কিন্তু এই ধরনের কড়া উত্তর তিনি আশা করেন নি। তিনি ভেবে ছিলেন, সসৈন্যে আগ্রায় পৌঁছবামাত্র আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্বের কথা ভেবে পীথল রাস্তা থেকে সরে দাঁড়াবেন। পরিবর্তে যখন এমন কড়া উত্তর এলো, সেলিম বেশ ভাবনায় পড়লেন। আগ্রার দুর্গ জয় করা বড় সহজ কাজ নয়। ভিতরের সৈন্যদল যদি সাহসী বীর এবং দক্ষ হয় তবে যতবড় বাহিনীই হোক না কেন, তার ছ মাস সময় লাগবে। আক্রমণের খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ তাঁর সম্পূর্ণ বাহিনীটিকে নিয়ে চলে আসবেন। সুতরাং খুব শীঘ্রই যদি রাজধানী অধিকার না করা যায় তাহলে যুদ্ধের মাধ্যমে জয়লাভ করার

শক্তি অথবা সময় থাকবে না।

এ সমস্ত সেলিম জানতেন বলেই পাঁথলের উত্তরে তিনি নিরাশ হলেন। এই প্রভুভক্ত রাজপুতের জন্য নিজের সমস্ত আশাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে দেখে তিনি ব্যাকুল হলেন। তবুও নিজের সমস্ত উদ্যোগ আয়োজনকে এত সহজে জলাঞ্জলি দেওয়াটা তার পদমর্যাদা এবং সম্মানের উপযুক্ত বলে মনে হলো না। তিনি ভাবলেন যে তাঁর প্রচেষ্টার কথা ইতিমধ্যেই বাদশাহের কর্ণ গোচর হয়েছে এবং তাঁর পৌরুষের পরাজয়টা এভাবে প্রকাশ হতে দেওয়া ঠিক হবে না। জয়লাভের কোন রকম চেষ্টা না করলে মেয়েরা পর্যন্ত তাঁকে বিদ্রূপ করবে এবং বীর শ্রেষ্ঠ আকবরও যে তাঁকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবেন না এটা তিনি অনুভব করলেন। এই সমস্ত চিন্তা করে কৌশলে কাজ সারার সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন।

তৈমুর বংশের অতুলনীয় পৌরুষ সেলিমের মধ্যে পূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। যত দোষই তাঁর মধ্যে থেকে থাকুক না কেন ভীরুতা, অস্থির চিত্ততা, অনবধানতা প্রভৃতি শাসকের পক্ষে অযোগ্যতার এই মূল ত্রুটি গুলি তাঁর মধ্যে ছিল না। সেনানায়ক এবং পরামর্শদাতাদের একত্রিত করে তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত বলে তাঁর মনে হলো। রাজা জগন্নাথ সিংহ, দেওয়ান ভগবান দাস, মীর উস্মান প্রভৃতি বন্ধুদের ডেকে তিনি তাঁদের পরামর্শ চাইলেন।

বহু যুদ্ধক্ষেত্রের যশস্বী নায়ক মীর উস্মান বললেন, 'এতে ভাববার কি আছে? আমাদের বাহিনী আগ্রা দুর্গ জয়ে সক্ষম। শহরের প্রায় তিন চতুর্থাংশ অধিবাসী আমাদের সমর্থক। তারা আমাদের সাহায্য করবেই। দুর্গটিকে আমরা চারদিক থেকে বেষ্টন করতে পারি। দুর্গ ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করায় বিলম্ব হতে পারে কিন্তু বাইরে থেকে অবরোধ করে তাদের অনাহারে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে দেওয়ায় কী অসুবিধা থাকতে পারে? পাঁথলের আছে মোট পঁচিশ হাজার রাজপুত সৈন্য। মুসলমান অধিবাসীরা তাঁর বিপক্ষে। সেইজন্য আমার পরামর্শ হচ্ছে আক্রমণ করা হোক।'

সেলিম মাথা নাড়লেন কিন্তু তাঁর এই শিরশ্চালনের অর্থ কারোরই ঠিক বোধগম্য হলো না। ভগবান দাস বললেন, 'মীর সাহেব, আপনি

যা বলছেন তা ঠিক। কিন্তু তাতে একটা অসুবিধা আছে। বাদশাহের কাছে বার্তাবহ গেছে। সব শুনে তিনি সসৈন্যে ফিরবেন। তখন অবরোধকারী আমাদের সৈন্যদলের কি অবস্থা হবে?'

মীর উস্মান বললেন, 'এমন কিছু হবে না। বড় কোন বাহিনী বাদশাহের সঙ্গে দক্ষিণ থেকে আসতে পারবে না। সৈন্যবাহিনীর একটা বড় অংশ সেখানে যুদ্ধরত রয়েছে। আর আমার তো মনে হয় বাদশাহ সালামত আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবেন না। যদি করেনও তাঁকে হারিয়ে দেওয়া আমাদের পক্ষে শক্ত হবে না।'

ভগবান দাস হেসে ফেললেন, 'বহুত আচ্ছা, মীর সাহেব! বাদশাহের সঙ্গে লড়বেন? আমাদের বাহিনীতে তার জন্য কত জন তৈরী আছে? দেবতুল্য বাদশাহ আকবরের সামনে দাঁড়াবার সাহস কে করবে? নিরস্ত্র অবস্থায়ও এসে যদি তিনি সামনে দাঁড়ান তাহলে তাঁকে অভিবাদন জানাবে না এমন লোক আমাদের মধ্যে ক'জন আছে?' তিনি সেলিমকে প্রশ্ন করলেন, 'হুজুর, বলুন তো বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্য লাভ করতে আপনিই কি চান?'

সেলিম উত্তর দিলেন, 'আব্বাজানের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা আমি কখনও পোষণ করিনি আর আজও করি না। যদি তা করিও তার ফলাফলের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। অতি উৎসাহী উস্মানও তাঁর সামনে ভেজা বেড়াল হয়ে যাবেন। ভগবান দাস, আপনি কি মনে করেন?'

ভগবান দাস বললেন, 'হুজুর! আগ্রা জয়ের বাসনা ত্যাগ করা হোক এই আমার ইচ্ছা। চেষ্টা করলেও এ ব্যাপারে কৃতকার্য হওয়া যাবে না। মহামান্য বাদশাহ যাতে সহজে আমাদের হারিয়ে দিতে না পারেন এমন কোন দুর্গে আমাদের অবস্থান করতে হবে। সেই দুর্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি জয় করে নিয়ে আমরা আরামে থাকবো। এইভাবে অগ্রসর হলে বেশ ভেবে চিন্তে তবেই বাদশাহ পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবেন। আর অল্প দিনের মধ্যে সব মিটেও যাবে।'

সেলিম কিছুক্ষণের জন্য চিন্তামগ্ন হলেন। এই পরামর্শের সঙ্গে তাঁর মতের ঐক্য ছিল। পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করার বা তাঁকে পদচ্যুত করার

কোন ইচ্ছাই তাঁর ছিল না। দানিয়ালকে উত্তরাধিকার দেওয়া যে সহজ হবে না সেটা তিনি কেবল বুঝিয়ে দিতে চাই ছিলেন। সেলিম-বিরোধী মন্ত্রীদের অপসারণও তাঁর কামা ছিল। নিজের শক্তি এবং পৌরুষও তিনি দেখিয়ে দিতে চাইছিলেন। এই সমস্ত কারণে ভগবান দাসের পরামর্শ তাঁর মনে ধরল।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'যদি এই রকমই করতে হয় তাহলে কোন্ দুর্গ এবং কোন্ প্রদেশ উপযুক্ত হবে?'

ভগবান দাস উত্তর দিলেন, 'লাহোর অথবা এলাহাবাদ। এ দুটির মধ্যে যে কোনটি দখল করলে নিজের হিসাবে শাসন করা যায়।'

'লাহোর হচ্ছে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় শহর। কিন্তু লাহোর অধিকার করলে কাবুল এবং আগ্রা এই দুদিক থেকেই আমাদের আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে। এলাহাবাদ সুরক্ষিত স্থান। সেখানে থাকলে গঙ্গাতটের সমগ্র অঞ্চল আমাদের অধীনস্থ হবে। দ্বিতীয়ত বাংলার সুবেদার মান সিংহ আমাদের বিরুদ্ধে যাবেন না। তৃতীয়ত ওখানকার দুর্গটি এমনই মজবুত যে সহজে জয় করে নেওয়া সম্ভব নয়।'

সেলিম বললেন, 'ঠিক! ঠিক! ভগবান দাস, আমাদের ঐস্থানে গিয়েই সুদৃঢ় ঘাঁটি করতে হবে। ওখানকার দুর্গ রক্ষকও আমার বন্ধু। সে নিশ্চয় আমার সঙ্গে সহযোগিতা করবে। আমার সুপারিশেই আব্বাজান তাকে সেখানে নিযুক্ত করেছিলেন। কী রাজা জগন্নাথ, আপনি তো কিছু বললেন না?'

'আমার একটা কথা মনে হচ্ছে', রাজা জগন্নাথ বললেন, 'সম্ভব হলে আগ্রা অধিকার করাই উচিত। একবারও চেষ্টা না করে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। যুদ্ধে জয়লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু কৌশলেও কি সাফল্য লাভ করা যাবে না? শহরের মধ্যেই কি বিদ্রোহের সৃষ্টি করা যায় না? পীথলকে আয়ত্তে আনার জন্যও তো কিছু করা যেতে পারে।'

'কি ভাবে?' সেলিম প্রশ্ন করলেন।

'পীথলের নিজস্ব কোন রাজ্য নেই। রাজা রায় সিংহের ভ্রাতা হিসাবেই তাঁর যা কিছু সম্মান। হুজুর যদি তাঁকে এই লোভ দেখান যে আপনার

বিরুদ্ধবাদী কোন রাজার রাজত্ব তাঁকে দেওয়া হবে তাহলেও কি তিনি অস্বীকৃত হবেন ? মানুষ যত মহান হোক না কেন মনে তার উচ্চাভিলাষ থাকবেই। সেই বস্তুটিকে খুঁজে বের করে, যদি কাজে অগ্রসর হওয়া যায় তবে সকলকেই বশীভূত করা যেতে পারে। আপনার অনুমোদন পেলে আমি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারি। বাদশাহের এখানে পৌঁছতে কম করে হলেও পনেরো দিন লাগবে। এর মধ্যে চেষ্টা করে দেখি। যদি কিছু করা না যায় তবে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করলেই হবে।'

'আপনার কথা পীথল মানবেন না। বেশ, চেষ্টা করে দেখতে পারেন। এলাহাবাদ গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করতেও সময় লাগবে। পীথলের সঙ্গে আলোচনার দায়িত্বটা আপনিই নিন। ভগবান দাস গোপনে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করুন। আর সৈন্যবাহিনী সামলানোর দায়িত্ব থাক মীর উস্মানের উপর।'

সিদ্ধান্ত অনুসারে সমস্ত ব্যবস্থা করা হলো। কিছু সংখ্যক অনুচর এবং ধনভাণ্ডার নিয়ে ভগবান দাস এলাহাবাদের পথে রওনা হলেন। সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে মীর উস্মান আগ্রার চারদিক ঘিরে ফেললেন। সকলের অজ্ঞাতে রাজা জগন্নাথ রাজধানীতে প্রবেশ করলেন।

সেলিমের বাহিনী রাজধানীর কাছে এসে পড়েছে জেনেই নগরের প্রতিরক্ষায় পীথল ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সেলিম সমর্থক মৌলবী এবং ওমরাহরা ভিতরে থেকে উপদ্রব করতে পারে। সম্ভাবিত সেই বিপদ যাতে না ঘটে তার জন্য তিনি একটি ঘোষণায় জানালেন, 'বাদশাহের অধিকার বিঘ্নিত করার জন্য একটি শত্রু বাহিনী নগরের প্রান্তে হাজির হয়েছে। ঐ বাহিনীর সাহায্যকারী নাগরিকদের জাতি ধর্ম-নির্বিশেষে সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসি দেওয়া হবে।' ঢোল বাজিয়ে ঐ ঘোষণা নগরে প্রচারিত হলো। অন্যদিকে শহরের স্থানে স্থানে বিজ্ঞাপনপত্র টাঙিয়ে জানানো হলো যে বাদশাহের বিরুদ্ধে গুজব রটনাকারী এবং গোলযোগ সৃষ্টি কারীদের বেঁধে এনে বাজারের মধ্যে দাঁড় করিয়ে বেত্রাঘাত করা হবে। বড় বড় রাস্তায় এবং যেখানে যেখানে জনসমাবেশ ঘটে থাকে সেইসব জায়গায় প্রহরার জন্য সৈনিক নিযুক্ত করা হলো।

কেউ যদি সেলিমকে সাহায্য করার কথা ভেবেও থাকে, এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে তাকে নিষ্ক্রিয় থাকতে হলো। বাদশাহের নিজ সন্তানের বিরুদ্ধে পীথল যে এই রকম দৃঢ় ব্যবস্থাবলী গ্রহণ করবেন একথা কেউ কল্পনাও করেনি। শহরের আভ্যন্তরীণ উপদ্রব বন্ধ করার জন্যই যে শুধু তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা নয় দুর্গের প্রধান অবস্থানগুলিতে সঙ্গে সঙ্গে কামানগুলি স্থাপিত হলো। দুর্বল স্থানগুলিকে সুদৃঢ় করে তুললেন, রক্ষী সেনাদলকে উৎসাহ দিলেন এবং অন্যান্য আবশ্যক ব্যাপারে সাবধানতা ও তৎপরতা দেখালেন। বাদশাহের প্রতি শুভেচ্ছার কারণে জনতা পীথলের মঙ্গল কামনাই করল।

এই সমস্ত কাজে দলপতি সিংহ ছিলেন পীথলের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ। দেহরক্ষীর স্থান থেকে উন্নীত হয়ে তিনি হলেন সেনাবাহিনীর উপ-সেনাপতি। বাল্যকালে প্রাপ্ত যুদ্ধ-বিদ্যা এখন তাঁর কাজে লাগল। নগরের বাসিন্দা অভিজাতদের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা না থাকায় অল্প বয়স্ক দলপতি সিংহ এতবড় দায়িত্ব পালন করলেও তাঁরা ঈর্ষান্বিত হলেন না।

নগরের বহির্ভাগে সেলিমের বাহিনী এবং অভ্যন্তরে পীথলের বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে পরস্পরের প্রতি ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, কেউই গোলাবর্ষণ করল না। বাদশাহ কেবল মাত্র রক্ষা করার আদেশই দিয়েছেন এই কথা ভেবে পীথল সেলিমকে পরাজিত করে বিতাড়িত করা অনাবশ্যক মনে করলেন। জয়লাভের দ্বারা আগ্রাকে হস্তগত করার ক্ষমতা নেই ভেবে সেলিমও আক্রমণ করলেন না।

কৌশলে পীথলকে আয়ত্তে আনার উদ্দেশ্যে আগত জগন্নাথ নগরে প্রবেশের পরেই সেলিমের পক্ষভুক্ত কয়েকজন আমীরের সঙ্গে দেখা করলেন। পীথলের রক্ষামূলক ব্যবস্থাগুলির খবর তাঁদের কাছ থেকে পেয়ে জগন্নাথ কিছুটা হতাশ হলেন। এত সতর্কতার সঙ্গে যিনি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন, নিজকর্তব্য এবং প্রভুভক্তি থেকে তাঁকে বিচলিত করা যে সম্ভব নয় আর তা করতে যাওয়াও যে নিজের দিক থেকে বিপজ্জনক হতে পারে এ কথা চিন্তা করে তিনি শঙ্কিত হলেন। তাঁর মনে হলো, যাই বলা হোক, যা কিছুই করা হোক অথবা যত ভয়ই দেখানো

হোক না কেন পীথলকে সেলিমের পক্ষভুক্ত করা সম্ভব নয়। সাফল্য লাভ হবে না জেনেও একবার তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি খোলাখুলি কথা বলার সিদ্ধান্ত তিনি নিলেন। পুরাতন বন্ধু হিসাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা কিছু অসুবিধাজনক হবে না মনে করে রাজা জগন্নাথ সাক্ষাতের সময় নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে একজন অনুচরকে তাঁর কাছে পাঠালেন। পীথলের উত্তর নিয়ে অনুচর ফিরে আসতেই রাজা জগন্নাথের দিব্যজ্ঞান লাভ হলো। উত্তরে তিনি লিখেছেন, 'আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজা জগন্নাথের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য আমি সর্বদাই আগ্রহী। কিন্তু নগর অবরোধ-কারী বাহিনীর একটি দলের নায়ক এবং রাজদ্রোহী হওয়ার ফলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষৎ করা অথবা কোন বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা তিনি অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতে যদি আমাকে বাধ্য করা হয় তবে কি ভাবে তাঁকে স্বাগত করা হবে তা তখনই স্থির করবো।'

রাজা জগন্নাথ বুঝে নিলেন যে সেলিমের প্রতিনিধি হিসাবে পীথলের সম্মুখীন হওয়া অসম্ভব এবং পাঁচজনের সামনে যদি সাক্ষাৎকার ঘটে তবে রাজদ্রোহের অপরাধে তাঁকে বন্দী করতে পীথল মোটেই সঙ্কুচিত হবেন না। তাঁর মস্তিষ্কের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হলো। অনেক চিন্তার পর তিনি বুঁদি রাজ্যের সাহায্য চাইবেন ঠিক করলেন। বুঁদিরাজ ভোজ সিংহ সে সময়কার বড় ওমরাহদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু তিনি রাজকার্য সম্বন্ধিত কোন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতেন না। কৌশল ও চাতুর্যের সাহায্যে বাদশাহ তাঁর রাজ্য অধিকার করে ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর ধৈর্য এবং নিষ্ঠায় প্রসন্ন হয়ে তাঁকে সর্বাধিক সম্মানের স্থান দিয়েছিলেন। কোন কোন সময় তিনি রাজধানীতে এসে থাকতেন আর বাদশাহ তাঁর সঙ্গে অসীম স্নেহ ও বিশ্বাস পূর্ণ ব্যবহার করতেন। রাজ্যের কোন কাজে হস্তক্ষেপ না করার দরুন রাজধানীর সামন্তবর্গ এবং পদাধিকারী ব্যক্তিবর্গ তাঁকে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র হিসাবে দেখতেন। হিন্দুরাজারা তাঁকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মত সম্মান করতেন।

রাজধানীর সমস্ত বাদবিসম্বাদের ঊর্দ্ধে বিচরণকারী এই ভোজ সিংহের

সাহায্যে কার্যোদ্ধারের আশায় রাজা জগন্নাথ তাঁর যমুনাতীরবর্তী প্রাসাদে উপস্থিত হলেন। সেলিম শাহের দূত হিসাবে সাম্রাজ্যের মধ্যকার অন্তর্বিরোধ ও কলহের অবসান করে শান্তির মধ্য দিয়ে কার্যোদ্ধারের আশায় রাজা পীথলের সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে যে তিনি এসেছেন, সেকথা মহারাজা সকাশে তিনি নিবেদন করলেন। কি কথাবার্তা হবে সে সম্বন্ধে রাজা ভোজ কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। কিছুক্ষণ চিন্তার পর তিনি বললেন, 'সেলিম শাহের ব্যবহার তাঁর অধিকার ও পদমর্যাদার উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। তিনি ভারতের বাদশাহের উত্তরাধিকারী। যদি তিনি নিজেই পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করে রাজ্যে অশান্তি বৃদ্ধি করেন তবে স্বীয় পুত্রের কাছ থেকেই বা তিনি কি আশা করতে পারেন?'

জগন্নাথ বললেন, 'আমিও তাই মনে করি। শাহজাদারও বিবাদের ইচ্ছা নেই। পীথলের আদেশে তাঁকে রাজধানীতে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি, তাই তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন।'

'এ ব্যাপারে আমাকে কি করতে বলছ?'

'গোপনে একবার পীথলের সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেতে চাই। আমি অনুমতি চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি অস্বীকৃত হয়েছেন। তাঁর ওখানে গিয়ে দেখা করা বোধ হয় ঠিক হবে না। সেই জন্য আপনি অনুগ্রহ করে তাঁকে এখানে ডাকুন--এই আমার প্রার্থনা।'

'তিনি আজকাল খুব ব্যস্ত থাকেন। এখানে ডাকলে সম্ভবত তাঁর অসুবিধা হবে।'

'আপনি আমন্ত্রণ জানালে যত অসুবিধাই হোক, তিনি আসবেন। কাজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলেই এত জোর দিয়ে বলছি।'

রাজা ভোজ শেষ পর্যন্ত রাজী হলেন এবং পীথলকে খবর পাঠালেন। তিনি সৈন্যবাহিনীর কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তবু দুজন অনুচরসহ বুঁদি রাজমহলে চলে এলেন। বিনয়নম্রতার সঙ্গে চরণ স্পর্শ করার জন্য আনত পীথলকে রাজা ভোজ হাত ধরে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভাই, তোমায় কষ্ট দিলাম বলে দুঃখিত। অসুবিধা হয়নি তো?'

পীথল উত্তর দিলেন, 'যে কোন মুহূর্তে আদেশ দেওয়ার অধিকার আপনার আছে। এত সত্বর যখন ডেকেছেন তখন নিশ্চয় কোন প্রয়োজনীয় কাজ আছে।'

'নিজের কাজে আমি ডাকিনি। জগন্নাথ সিংহ তোমার সঙ্গে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কথা বলবেন। কি কথা তা আমি জিজ্ঞেস করিনি। কিন্তু সেলিম এবং বাদশাহের মধ্যে যুদ্ধ না হোক এটা তো আমি চাই। সেই জন্য আমার ইচ্ছা, তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা কর।'

'আপনার আদেশ পালন করব কিন্তু কোন লাভ হবেনা।'

'যাই হোক, জগন্নাথ সিংহ আমাদের দুজনেরই বন্ধু। তাঁর সঙ্গে একবার দেখা তো করো। আমার বৈঠকখানায় বসে আছেন। চলো।'

'সেলিমের কথাবার্তা থেকে তাঁর চিন্তাধারায় অল্পবিস্তর পরিচয় পীথল পেয়েছিলেন। সেইজন্য তিনি বুঝে নিলেন, যে কোন রকমে তাঁকে সেলিমের পক্ষভুক্ত করার চেষ্টা চলছে। সে সম্বন্ধেই কোন কথা নিয়ে তিনি এসেছেন। সমস্ত কিছু আন্দাজ করে তার উত্তরও পীথল ঠিক করে নিলেন। জগন্নাথ সিংহের সামনে তিনি অসাধারণ গাম্ভীর্যে হঠাৎ উপস্থিত হলেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে জগন্নাথ বুঝলেন, যে কোন প্রস্তাবই অর্থহীন হবে। নিজেদের সৌজন্য সূচক কথাবার্তার পর পীথলই শুরু করলেন, 'সেলিম শাহ কুশলে আছেন তো? বিশেষ কোন কথা আছে কি?'

জগন্নাথ বললেন, 'রাজকুমার কুশলে আছেন। আপনার খবর জানতে চেয়েছেন।'

'মাত্র চার পাঁচদিন আগে দেখা হয়েছে, এর মধ্যে কি আর বিশেষ পরিবর্তন হতে পারে?'

'সেলিম শাহ আপনাকে কতখানি সস্নেহ সম্মানের চোখে দেখেন তা তো আপনি জানেন। সেই জন্য একথা বলার কোন আবশ্যকতাই নেই যে বর্তমানে যে ব্যবস্থা করেছেন তাতে কি পরিমাণ দুঃখ তাঁর হয়েছে। একথা আপনাকে জানানোর জন্যই তিনি আমাকে বলেছেন।'

'শাহজাদার প্রতি আমার হৃদয়েও কতখানি স্নেহ এবং ভক্তি রয়েছে

তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাদশাহের আজ্ঞাবহ আমি সেইজন্যই আমার প্রতি তাঁর কোন ক্রোধ থাকা অনুচিত।'

'ক্রোধ নেই কিন্তু নগরে প্রবেশ করতে দেননি বলে দুঃখ আছে।'

'তাঁর নগরে প্রবেশে আমি বাধা দিইনি। ইচ্ছা হলেই তিনি আগ্রায় এসে নিজের প্রাসাদে আরামে বাস করতে পারেন। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীকেও আজমীর ফেরৎ পাঠাতে হবে। এই বাদশাহের আদেশ।'

'আপনার কাছে তাহলে স্নেহের এবং বন্ধুত্বের কোন মূল্যই নেই?'

'এ সমস্তই মহার্ঘ। কিন্তু সবচেয়ে মূল্যবান হলো প্রভুভক্তি। শুধু তাই নয়, শাহজাদার মঙ্গল এবং উন্নতির প্রতিও আমার নজর আছে। ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী আকবরের বিরোধীতা তিনি কত দিন করতে পারবেন? সেই জন্য ফিরে গিয়ে তাঁকে নিবেদন করুন যে কুপরামর্শদাতাদের প্রভাব মুক্ত হয়ে পিতৃভক্তির কথা মনে রেখে পিতৃ-আজ্ঞা পালনকারী পুত্র হওয়াই মঙ্গলজনক— এই আমার প্রার্থনা।'

'আপনার কথা যথার্থ। বাদশাহের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তিনি চান না। আগ্রা জয়ের ইচ্ছাও তাঁর মধ্যে নেই। তিনি যা বলেছেন তা আমি আপনাকে জানিয়ে দিলাম। আপনার কথা তাঁকে জানাবো। আমি বিশ্বাস করি তিনি তা মান্য করবেন।'

যাওয়ার জন্য পীথল উঠে দাঁড়ালেন। নিজের বক্তব্য সঠিকভাবে উত্থাপনের ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় রাজা জগন্নাথ কোন রকমে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচলেন। এই সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে একটি কথা তাঁর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল এবং তা হচ্ছে সেলিমের আগ্রা আক্রমণ ব্যর্থ হবে। যেন-তেন-প্রকারেণ রাজধানী রক্ষার প্রতিজ্ঞায় পীথল অটল। এমত অবস্থায় ভগবান দাসের বক্তব্যই অনুসরণযোগ্য।

নিজের কূটনৈতিক দৌত্যের অসাফল্যের সংবাদ দিয়ে রাজা জগন্নাথ শাহজাদাকে এই উপদেশই দিলেন যে বাদশাহের সসৈন্যে ফিরে আসার আগে এলাহাবাদ পৌঁছে যাওয়াই একমাত্র উত্তম ব্যবস্থা।

দুঃসাহসী হওয়া সত্ত্বেও রাজনীতিবিদ সেলিম ভাবলেন যে পিতার বাৎসল্য পরীক্ষায় খুব বেশি দূর অগ্রসর হওয়া অনুচিত। সেইজন্য

আগ্রা জয় যখন সম্ভব নয় তখন হার স্বীকার না করে স্বেচ্ছায় সরে যাওয়াই ভাল। সুতরাং তিনি সৈন্যদলকে এলাহাবাদের দিকে রওনা হওয়ার আদেশ দিলেন।

সেলিম যাওয়ার আগে ঘোষণা করলেন যে আগ্রা জয়ের কোন সিদ্ধান্তই তিনি কখনও করেননি। প্রিয় পিতৃদেবের অনুপস্থিতিতে নগরে প্রবেশের যে বাধা দেওয়া হয়েছে তা অন্যায়। কিন্তু রাজ প্রতিনিধির আদেশ বলেই তিনি তার বিরুদ্ধাচরণ না করে ফিরে যাচ্ছেন। পিতার ফিরে না আসা পর্যন্ত এলাহাবাদে থাকার সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন।

বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করায় পীথল আনন্দিত হলেন। পিয়বন্ধু সেলিমের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁর কাছেও কাম্য ছিল না। এই অপ্রীতিকর অবস্থার সৃষ্টি না করে প্রত্যাবর্তনকারী রাজকুমারকে তিনি মনে মনে অভিনন্দন জানালেন। রাজধানীর সকলেই এতে আনন্দিত হলো। কিন্তু দানিয়াল শাহ এবং নাসির খাঁর কাছে এই অবস্থা অসহ্য লাগলো। যুদ্ধ বেধে গেলে পীথলের বিশ্বাসঘাতকতা প্রমাণ হয়ে যাবে এই ছিল তাঁদের আশা। যে দুর্দৈব এ সমস্ত ঘটতে দিলনা তাকে তাঁরা মনে মনে অভিসম্পাত দিলেন।

সেলিম সসৈন্যে এলাহাবাদ চলে যাওয়ার পর পাঁচ-ছ দিন রাজধানী উৎসবের আনন্দে কাটল। এতদিন ভীতি-বিহ্বলতার মধ্যে কাটিয়ে ওমরাহ এবং পদাধিকারীরা রাজ প্রতিনিধির এই বিজয়ে অভিনন্দন সূচক আনন্দোৎসবের অনুষ্ঠান করতে লেগে গেলেন। প্রথম দিন দানিয়াল শাহের প্রাসাদে বিরাট ভোজের পরে সংগীত নৃত্যের আয়োজন হয়েছিল। রাজধানীর তাবৎ গণ্যমান্য লোকেরা তাতে সমবেত হয়েছিলেন। রাজা পীথল এবং দলপতি সিংহও এই নিমন্ত্রণ বর্জন করেন নি। এরপর অপরাপর পদাধিকারীদের গৃহেও তাঁদের অধিকার ও পদমর্যাদার অনুরূপ উৎসব অনুষ্ঠিত হলো। কয়েকদিন অতিবাহিত হওয়ার পর কোষাধ্যক্ষ নাসির খাঁ সর্বাপেক্ষা আড়ম্বরপূর্ণ এক সমারোহের আয়োজন করলেন।

বাদশাহের শশুর হওয়ায় তিনি নিজের স্থান অন্য সকলের উপরে

বলে মনে করতেন। কিছু সংখ্যক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি তাঁর এই দাবীকে স্বীকারও করত। এই আত্মীয়তা ছাড়াও ঐশ্বর্যে তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বিপুল ঐশ্বর্যের উপযুক্ত অলঙ্কারও তাঁর মধ্যে ছিল। তাঁর সুরম্য প্রাসাদটি শিল্প বৈচিত্র্যে, বিলাসউপকরণের কমনীয়তায় এবং সামগ্রিক মহার্ঘতায় ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর দেহরক্ষী সেনাদল ছোটখাট একটি রাজ্যের সৈন্য বাহিনীর চেয়েও আয়তনে বৃহৎ ছিল। ভৃত্য, অনুচর ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের জন্য তাঁর আবাস ছিল রাজধানীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

কোষাধ্যক্ষ এবং রাজধানীর রাজ প্রতিনিধিদের অন্যতম হওয়ায় এখন তাঁর প্রতাপ দানিয়াল শাহের ঠিক পরেই হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইজন্য তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার করে সকলে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই এসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু পীথল তাঁর আমন্ত্রণ স্বীকার না করায় অভ্যাগত সকলেই আশ্চর্যান্বিত হলেন। খুব আগ্রহের সঙ্গেই নাসির খাঁ তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ছিলেন এবং অত্যন্ত ঔৎসুক্যের সঙ্গে তাঁর আগমনের প্রতীক্ষায় ছিলেন। কিন্তু দানিয়াল শাহের আসার পর আধঘণ্টা কেটে যাওয়ার পরও যখন তিনি এলেন না তখন নাসির খাঁ এই সিদ্ধান্তেই এলেন যে তিনি জ্ঞাতসারেই তাঁর অপমান করলেন।

এই উৎসবের পর দিনই দলপতি সিংহের কাছে একটি দৌত্য এলো। নিত্যকর্মাদি সেরে তিনি তাঁর প্রভুর উদ্দেশে যাত্রা করবেন এমন সময় গুল আনারার বিশ্বস্ত দূতী এসে হাজির। আরও একবার এই ভাবে এসে তাকে নিরাশ হতে হয়েছিল। সেই বৃদ্ধাটিকে দেখে দলপতি কিছুটা বিরক্ত হলেন কিন্তু বৃদ্ধার প্রতি ব্যবহারে ক্ষোভের কোন প্রকাশ ছিল না। মৃদুহাস্যের সঙ্গেই তাঁকে অভিবাদন করলেন।

দলপতি সিংহ প্রশ্ন করলেন, 'এত সকালে কি করে এলেন? আপনার মালিকের কুশল তো?'

দূতী বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ! আপনার কথা সব সময়ই বলেন।'

'আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। তাঁর নৃত্য-গীত যে আমার কত ভাল লাগে আমি তা বর্ণনা করতে পারব না!'

'আপনার মুখ থেকে একথা শুনলে তিনি খুব আনন্দ পাবেন। আর এটাই তাঁর ইচ্ছা।'

'অনেক কাজে জড়িয়ে আছি তাই যেতে পারিনি।'

'ওখানে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানাতেই এখন তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। খুব জরুরী দরকার। এক মুহূর্ত দেরি যেন না হয় এই কথা বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।'

একথা শুনে দলপতি সিংহ কিছুটা চিন্তায় পড়লেন। নিজগৃহে আহ্বানের জন্য গুল আনারার এটা একটা স্ব-কপোল কল্পিত কাহিনী কিনা সে সম্পর্কে তাঁর মনে সন্দেহ জাগল। রাজধানীর মোহিনীদের সম্বন্ধে অনেক গল্পই তাঁর শোনা ছিল। সেই জন্য এর মধ্যে প্রতারণা থাকাও সম্ভব ভেবে তিনি শঙ্কিত হলেন। দাসী এবং নর্তকীদের দ্বারা প্রলুব্ধ করে ডেকে এনে শত্রু হননের পদ্ধতিটাও এক্ষেত্রে অসাধারণ নয়। এমনও হতে পারে যে তাঁকে ডেকে নিয়ে সে কারো বিরুদ্ধে তাঁকে প্ররোচিত করতে পারে। এই সব চিন্তা করে তিনি উত্তর দিলেন, 'এত তাড়া কিসের? এখন আমাকে কাজে বেরুতে হবে। সম্ভব হলে সন্ধ্যা নাগাদ যাবো।'

দূতী নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'না, না! খুব জরুরী কাজ। আপনি অন্য কিছু মনে করবেন না। আমার মালিক অন্য নর্তকীদের মত নন। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যও আপনাকে ডেকে পাঠাননি। আপনার যাওয়া খুব দরকার, তা না হলে বড় বিপদ ঘটতে পারে।'

'কী বিপদ?'

'অহেতুক অত ভাববেন না। গুল আনারার মত মানুষদের অনেক গুপ্ত খবর জানার সুযোগ হয়। তাঁরা অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রিয় পাত্রী। রাজ গৃহেও তাঁদের প্রবেশাধিকার আছে। সুতরাং তাঁরা কাজেও লাগতে পারেন।'

দলপতি সিংহের মনে হলো কথাটা ঠিক। দূতীর কথা বার্তার মধ্যে যে সহৃদয়তা ফুটে উঠেছিল তা তাঁর সেই আশঙ্কাকে স্তিমিত করল। সকালে ডেকেছে সুতরাং তিনি বুঝলেন যে ব্যাপারটা প্রণয় সংবাদ

সংক্রান্ত নয়। পুরোপুরি বিশ্বাস না হওয়ায় এসব সত্ত্বেও তিনি আবার একটা অজুহাত খাড়া করলেন, 'বেশ, এখন মহারাজার সঙ্গে দেখা করার সময় চলে যাচ্ছে। আপনি যান, দুপুরের মধ্যে আমি পৌঁছে যাবো।'

দূতী বলল, 'না, না! মহারাজের কাছে যাওয়ার আগেই ওখানে যাওয়া দরকার। আপনার কোন রকম সন্দেহ হলে তিনি বলতে বলেছেন যে কুমারী সুরঞ্জমোহিনীর সম্বন্ধে একটা কথা বলার জন্যই তিনি আপনাকে ডেকেছেন।'

প্রেয়সীর নাম শুনেই দলপতি সিংহ চমকিত হলেন। তাকে পাওয়ার জন্য দানিয়াল শাহকে সব রকম উপায় অবলম্বন করতে পারে তা তিনি জানতেন। এই দুর্বৃত্তদের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা যদিও শেঠজী করেছেন তা সত্ত্বেও গুপ্তচরে ভরা রাজধানীতে সব সংবাদই সংগ্রহ করা সম্ভব। তা-ই যদি হয়ে থাকে তাহলে না জানি কী বিপদ এসে পড়ে? দুঃসহ দুঃখ ও দুর্ভাবনায় তাঁর মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ল। দলপতি সিংহের দুঃখ পাওয়ার ভাবান্তর লক্ষ্য করে দূতী বলল, 'আপনি দুঃখিত হবেন না। সত্বর গুল আনারার সঙ্গে দেখা করুন। আমার বুদ্ধিমতী এবং গুণবতী প্রভু বিপদ ত্রাণের উপায় বলে দেবেন।' এবার দলপতি সিংহ আর দেরি করলেন না।

সন্ধ্যায় জাজ্বল্যমান ইন্দ্রলোক দিলপসন্দ্ বীথীকে এখন অভিনয় শেষের রঙ্গমঞ্চের মত আকর্ষণহীন মনে হচ্ছিল। প্রধান প্রধান ভবনগুলির মধ্যে বেশির ভাগেরই দ্বার এখনও বন্ধ। চারদিক নির্জীব ও নির্জন মনে হচ্ছিল। নিদ্রালু দাসীদের এবং অত্যধিক মদ্যপানে আচ্ছন্ন পথিপার্শ্বে শায়িত কিছু লোক ছাড়া কাউকেই দেখা যাচ্ছিল না। যার গুণগানে মানুষ অক্লান্ত সেই দিলপসন্দ্ বীথীর এই অবস্থা দেখে তাঁর বিস্ময় জাগলো। কামার্ত মানুষেরও অবহেলিত এই সময়টিতে গুল আনারা যখন তাঁকে আহ্বান জানিয়েছে তখন নিশ্চয় কোন জরুরী কাজ আছে—এই কথা ভেবে তিনি আশ্বস্ত হলেন।

গুল আনারার বাসস্থানই ঐ রাস্তার প্রধান প্রাসাদ। উচ্চ-পদাধিকারী এবং রাজকুমার প্রভৃতিরাও এই প্রাসাদে আতিথ্য গ্রহণ

করতেন। সেইজন্য তার অন্তর্ভাগ এবং প্রধান প্রধান কক্ষগুলি রাজোচিত পদ্ধতিতে সজ্জিত ছিল। দ্বার অতিক্রম করেই দলপতি সিংহ ঐ প্রাসাদের সৌন্দর্য ও অলঙ্করণ চাতুর্যে বিস্মিত হয়ে গেলেন। গুল আনারার একজন কর্মচারী এসে তৎক্ষণে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রধান কক্ষটিতে নিয়ে গিয়ে তাঁকে একটি রত্ন খচিত মঞ্চে বসিয়ে দিল। তারপর সে বলল, 'গুল আনারা এখুনি আপনার সেবায় হাজির হবেন। ততক্ষণ একটু শরবৎ নিয়ে আসব?'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন, 'না, ধন্যবাদ! আমি এই খেয়ে এলাম।'

এরই মধ্যে গুল আনারা কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হলেন। বহুমূল্য বস্ত্রাভরণে সজ্জিত না হলেও তাকে চন্দ্রাস্তের পর চার পাঁচটি তারকাশোভিত প্রত্যূষের মতই মোহময় দেখাচ্ছিল। অলঙ্কার তাঁর স্বাভাবিক শ্রীকে বর্ধিত করেছিল। তাকে দেখে দলপতি সিংহের মনে পড়ল :

আমুক্ত ধৌত সিচয়াঞ্চল কম্বুকণ্ঠ
মানীল কীর্ণ কবরী ভর সংবৃতাংসং
গাত্রং নিরাভরণ সুন্দর কর্ণপাশং
তস্যাং ন কস্য হৃদয়ং তরলী করোতি?

অর্থাৎ সুন্দর অলঙ্কার মুক্ত শঙ্খ শ্বেতকণ্ঠ, আলুলায়িত নীল কবরী ভারাবৃত সস্কন্ধ, অলঙ্কারহীনতায় অধিকতর শ্রীমণ্ডিত কর্ণপাশ ও অঙ্গ কার হৃদয়কে তরলিত না করে?

তাঁর সন্দেহ হলো যে এই কি সেই মোহিনী যাকে তিনি দানিয়াল শাহের প্রাসাদে দেখেছিলেন? সেদিনের বস্ত্রালঙ্কার, আড়ম্বর এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কৃত্রিম সৌন্দর্য নাগরিকদের কাছে চিত্তহারী হতে পারে। সেদিন সেগুলি তার উপযুক্তও ছিল বটে। কিন্তু আজ সে ঠিক সামনে মুগ্ধা কুলবধূর মত অকৃত্রিম সৌন্দর্য, স্নিগ্ধ বিনয়মাধুর্যভরা ভাব এবং শুভ্র বস্ত্র শোভা নিয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিন নৃত্যরতা, তার ভাবভঙ্গিমা, মৃদুহাসি এবং নৃত্য ছিল কামোত্তেজক। কিন্তু আজ তার মুখে সেবা এবং বিনয় ছাড়া কোন ভাবই দৃশ্যমান নয়। সেদিনের গুল আনারা আর আজকের গুল আনারা কি একই মানুষ? এ প্রশ্ন যদি

দলপতি সিংহের মনে এসে থাকে তাহলে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে ? করজোড়ে বিনীতভাবে সে বলল, 'আপনি যে এতদূর কষ্ট স্বীকার করেছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। এ সময়ে ডেকে অসুবিধা করিনিতো ?'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন, 'কয়েকবারই আসব মনে করেছি কিন্তু ব্যস্ত থাকায় পারিনি।'

'আপনার অনুগ্রহ ! এখন আমি যে জন্য আপনাকে ডেকেছি সেটা সুখবর নয়। ঘটনাটির জন্য আমি দুঃখিত। আপনি আসতে রাজী না হলে তবেই আসল কথাটা বলার জন্য আমি দাসীকে নির্দেশ দিয়েছিলাম কারণ অনাবশ্যক মনকষ্ট পান সেটা আমি চাইনি। কর্তব্যের কথা জানার পর সমস্ত ঘটনা শোনার আগ্রহ আপনার হবে।'

উদ্বেগের সঙ্গে দলপতি সিংহ প্রশ্ন করলেন, 'তার কোন বিপদ ঘটেনি তো ।'

'ঈশ্বর রক্ষা করেছেন। আপনি শান্ত হোন।'

'এইবার ধৈর্য ধরে শুনবো। আপনি দাঁড়িয়ে কেন ? বসুন।'

নীচের রত্নমণ্ডিত গালিচার উপর গুল আনারা বসে পড়ল। তারপর সে বলল, 'নাসির খাঁ সাহেবের বাড়িতে মস্তবড় একটা নিমন্ত্রণ ছিল। দানিয়াল শাহের সামনে নৃত্যগীত সমানে চলছিল। আমি সেখানে গিয়েছিলাম। ওরা যে কিছুদিন থেকে আমার প্রতি কৃপাশীল তাতো আপনি জানেন। সর্বত্র যখন কোলাহল চলছিল সেই সময় ভিতর দিকের কক্ষে, যেখানে শাহজাদা, নাসির খাঁ এবং আরও দু একজন বন্ধু বসে কথাবার্তা বলছিলেন, দু একজন দাসীসহ আমাকে ডাকা হল। আমাদের সামনেই তাঁরা অনেক কিছু আলোচনা করলেন। আপনিও জানেন, দাসীরা এসমস্ত কথায় কান দেয় না। হীরাজান গান করছিল। আমি দানিয়াল শাহের কাছে বসেছিলাম। কথাবার্তার মধ্যে আপনার নাম শুনতে পেলাম।'

এর পরের কথাগুলি গুল আনারা লজ্জায় আনত মুখে বলল, 'আমি মনযোগ দিলাম ! প্রথমে নাসির খাঁ বললেন যে শেঠজীর পৌত্রীকে বিয়ে করবেন বলে আপনি স্থির করেছেন। এ কথায় দানিয়াল শাহ

খুব ক্রুদ্ধ হলেন। তাতে নাসির খাঁ বললেন, ঐ সিদ্ধান্তে কিছু এসে যাবে না। তার গন্তব্যস্থল আমার জানা আছে। কিছু বিশ্বস্ত লোক পাঠিয়ে তাকে অপহরণ করা খুবই সহজ। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা করার জন্য ইব্রাহিম খাঁকে ডাকা হলো। তাকে আদেশ করা হল যে কুমারী গোহড়রাণীর আশ্রয়ে ধৌলপুরে রয়েছে। সকাল হওয়ার আগেই দানিয়াল শাহের দেহরক্ষীদের মধ্য থেকে পঞ্চাশ জনকে নিয়ে গিয়ে তাকে ধরে আনতে হবে।'

দলপতি সিংহ বিহ্বল হলেন। সকাল হওয়ার আগেই ইব্রাহিম খাঁ যদি রওনা হয়ে থাকে তাহলে সুরজমোহিনীর মৃত্যু অথবা তার চেয়েও ভয়াবহ অপমান অবশ্যম্ভাবী। বিলম্ব করা আরও সঙ্কটজনক হবে চিন্তা করে তিনি যাত্রা করতে উদ্যত হলেন। তিনি বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করতে পারিনা। ফিরে এসে যথোচিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবো।'

গুল আনারা হেসে উত্তর দিল, 'আপনার দুঃখে আমি আনন্দিত হলাম। কিন্তু এত দ্রুততার প্রয়োজনীয়তা নেই। যা করা আমার পক্ষে সম্ভব আমি তা করেছি।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'বৃথা আশা আমায় দেবেন না। এই কুমারী জীবন এবং মানসম্ভ্রম জগতে আমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু।'

'ইব্রাহিম খাঁ এখনও রওনা হতে পারেনি। সুরাপানে হত চেতন হয়ে সে এই প্রাসাদেরই একটি ঘরে রয়েছে। তার চাবি আমার কাছে আছে।'

'কি ভাবে?' দলপতি সিংহের বিস্ময়ের সীমা ছিলনা।

'আপনার ভাবীপত্নী সৌভাগ্যবতীর বিরুদ্ধেই যে চক্রান্ত চলছে এটা বোধগম্য হতেই কি ভাবে তাকে বিপদ মুক্ত করা যায় সে কথা চিন্তা করলাম। সকলেই জানত যে আপনি এবং মহারাজা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেননি। সেই জন্য আপনাকে খবর দেওয়ার উপায়ও ছিল না। শেষে ইব্রাহিম খাঁকে আমি আমার গৃহে নিমন্ত্রণ করলাম। অনেক দিন থেকেই আমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার ব্যাপারে সে উৎসুক ছিল।

আপনার হয়ত মনে হবে যে আমি আমার মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলে-ছিলাম কিন্তু সে সময় আর কোন পথ ছিলনা।' মদ তার কাছে অতি প্রিয় বস্তু। সেই জন্য তার মধ্যে গাঁজা মিশ্রিত করে খাইয়ে দিলাম। তারই ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আর দানিয়াল শাহ ভাবছেন যে সে চলে গেছে।'

'আপনার অনুগ্রহ! আমার কৃতজ্ঞতা আমি কি ভাবে প্রকাশ করবো! আমার মত অপরিচিত ব্যক্তিকে যে সাহায্য আপনি করলেন তার কথা আমি জীবনে ভুলব না। এবং আমার আত্মীয়রা সকলেই আপনার কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।'

'এত কথার কোন দরকার আছে কি? নিজের প্রিয়জনের জন্য মানুষ কি না করে? আপনি যে আমাকে মনে রাখবেন এর চেয়ে বড় কৃতজ্ঞতা আর কি হতে পারে? কিন্তু একটি কথা আছে। এই ইব্রাহিমকে আমি আমার ঘরে বেশিক্ষণ রাখতে পারবো না। আমার ঘরে তার মূর্ছাভঙ্গ হলে সমস্ত কথা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তখন আমার উপর নাসির খাঁ এবং দানিয়াল শাহের ক্রোধের সীমা থাকবে না।'

'সে কখন জাগতে পারে?'

'সন্ধ্যার আগে নয়।'

'তা হলে ঠিক আছে। এখন আমি যাই?'

'দাঁড়ান। এখনও সব বলা হয়নি। আর একটি কথা আছে।'

'ঐ রকম গুরুত্বপূর্ণ?'

'সেটা আপনিই ঠিক করবেন। মহারাজা পৃথ্বী সিংহের বিরুদ্ধে বহু দোষারোপ করে দানিয়াল শাহ বাদশাহকে চিঠি দিয়েছেন। তাতে লেখা হয়েছে যে উনি বিষ দিয়ে শেখ মুবারককে হত্যা করেছেন, সেলিমের সহযোগিতায় বাদশাহের বিরুদ্ধে বহু কিছু করছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। দূত গতকাল নাগাত তাঁর কাছে পৌঁছে গেছে। মহারাজকে ধ্বংস করার সমস্ত ব্যবস্থাই তাঁরা করেছেন। শেষ পর্যন্ত কি হবে কে জানে।'

'দুর্বৃত্ত! এদের শত্রুতার কোন সীমা নেই! কিন্তু রাজা পীথলের কাছে এসব চলবেনা। সত্যেরই জয় হবে।'

'সত্য কথা। কিন্তু সাবধান থাকাও দরকার। অর্ধেক কাজ আমরা করলে তবে ঈশ্বর বাকি অর্ধেক করবেন।'

'এসব খবর পেলেই তিনি আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করে নেবেন। এবার তাহলে চলি ?'

'একটি আর্জি আছে। আমার বাড়িতে এলেন আর এক ফোঁটা জলও না খেয়ে চলে যাচ্ছেন—এতে আমি খুব ব্যথা পাবো। একটু শরবৎ আর কিছু ফল খেয়ে আমাকে বাধিত করুন।'

'ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করুন। কথার মধ্যে আমি ভদ্রতা ভুলে গেছি।'

আনন্দে গুল আনারার মুখ উৎফুল্ল হয়ে উঠল। সত্বর বাইরে গিয়ে সে কি যেন আদেশ করল। মুহূর্তের মধ্যে নানা রকমের ফল এবং নানা বর্ণের শরবতের পাত্র তাঁর সামনে এনে রাখা হলো। মাণিক্যের মত উজ্জ্বল কয়েকটি আনারের দানা তার মধ্য থেকে দলপতি সিংহ তুলে নিলেন। এটা তার নামের প্রতি সম্মান নিবেদন মনে করে গুল আনারা আনন্দের সঙ্গে বলল, 'এই আনারের প্রতি আপনার কৃপাদৃষ্টি পড়েছে দেখে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবতী মনে করছি। এই সাক্ষাৎকার ভবিষ্যতের স্নেহ বন্ধনের মূল হয়ে থাকবে এই আশাই রাখি।'

দলপতি সিংহ সস্নেহে উত্তর দিলেন, 'একটি ব্যাপারে আমি ক্ষমা প্রার্থী। মনে মনে আমি আপনার প্রতি ক্ষমার অযোগ্য একটি অপরাধ করেছি। রাজধানীর নর্তকীদের সম্বন্ধে আমি অনেক কাহিনী শুনেছি। আপনাকেও আমি তাদেরই মধ্যে একজন ভেবেছিলাম। সর্বত্র, সব মানুষের মধ্যেই ভাল মন্দ আছে। এই সত্য আমি বিস্মৃত হয়েছিলাম। এর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমাকেও আপনার বন্ধু হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে অনুগৃহীত করুন।'

'আপনি কিছু ভুল করেননি। বিনা পরীক্ষায় বন্ধুর স্বীকৃতি দেওয়া আপনার মত ব্যক্তির দিক থেকে অনুচিত। এখন এসব কথা বলছেন কেন ? আপনি যে আমায় ঘৃণা করেন না এটাই মস্ত বড় কথা।'

'কি ? ঘৃণা ? সব সময়, আমরা উভয়ে উভয়ের বন্ধু ছিলাম এবং

থাকবো। শীঘ্রই আবার আসব। এইবার যাওয়ার অনুমতি দিন।'

গুল আনারা আর কোন বাধা দিল না। তার গৃহ থেকে বাইরে এসেই দলপতি সিংহ তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার সম্বন্ধে ভাবতে লাগলেন। প্রথমে ইচ্ছা হলো সুরজমোহিনীর বিষয়টি শেঠজীর গোচরে এনে যা কিছু করা সম্ভব করা। কিন্তু তিনি ভাবলেন, ব্যক্তিগত কাজ এবং রাষ্ট্রীয় কাজের মধ্যে দ্বিতীয়টিকেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সুতরাং পীথল সম্পর্কিত সংবাদটি তাঁকে জানানো সর্বাগ্রে প্রয়োজন বলে তিনি স্থির করলেন। গুল আনারার প্রাসাদ থেকে ইব্রাহিম খাঁকে বের করে আনার সুবিধাও পীথলেরই বেশি। সেই জন্য তিনি সত্বর তাঁর আবাসে পৌঁছলেন এবং প্রয়োজনীয় রাজকার্যে মহারাজের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতে প্রয়োজনীয়তার কথা জানানোর জন্য একজন অনুচর পাঠালেন। তিনি যখন পীথলের সামনে উপস্থিত হলেন তখন বিগত দিনগুলির কার্যধারার বিবরণ দিয়ে তিনি বাদশাহের উদ্দেশ্যে চিঠি লিখছিলেন। দলপতিকে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কি দলপতি? তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কোন দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছ। তা যদি হয় তো শীঘ্র বল।'

গুল আনারার কাছে শোনা কথা দলপতি সংক্ষেপে বর্ণনা করলেন।

বিরোধীদল তাঁকে নিঃশেষ করার যে ষড়যন্ত্র করেছে তা শুনে পীথল অবিচল নির্বিকার রইলেন। স্থিরবুদ্ধি সেই রাজপুতবীরের প্রতি দলপতি সিংহ মনে মনে শ্রদ্ধা জানালেন। তিনি বলতে লাগলে, 'বাদশাহ এই সব কথায় বিশ্বাস করে যদি কিছু করে বসেন? প্রথমত তিনি দাক্ষিণাত্যে রয়েছেন। দ্বিতীয়ত আপনার বিরুদ্ধে আরোপিত অপরাধ তাঁর কাছে খুব দুঃখজনক হবে। তৃতীয়ত আপনার পক্ষ সমর্থন করার সাহস কার হবে? সত্যি কথা বলতে কি, বাদশাহের সঙ্গে পরিচিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সভা প্রভৃতির কথা চিন্তা করে ভীত হচ্ছি।'

একটু চিন্তা করে পীথল বললেন, 'তোমার কথা ঠিক। এরা এমন ভাবে এমন কথা লিখেছে যা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহ ক্রোধে ফেটে পড়বেন। ক্রুদ্ধ হলে তিনি কি যে করেন আর কী যে বলেন তা কেউ জানেনা। মুবারকের মৃত্যুতে তাঁর আরও দুঃখ হবে। দুঃখের আবেগে

তিনি হঠকারী কিছু একটা করে ফেলতে পারেন। কিন্তু তাতে আমার ভয়ের কিছু নেই। জালালুদ্দীন আকবর একজন সাধারণ মানুষ নন। তাঁর মধ্যে এমনি এক শক্তি আছে যার দ্বারা তিনি শত্রুর এবং বন্ধুর অন্তরতম প্রদেশের খবর পড়ে নিতে পারেন। তাঁর ন্যায় নিষ্ঠা এবং বোধ শক্তির কথা চিন্তা করে বিস্ময়াভিভূত হয়ে যাই। তাঁর কাজ সাধারণ মানুষের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে তুলনীয় নয়। তিনি কোন অন্যায় করবেন না। সেই জন্য এ ব্যাপারে আমার অজ্ঞের মত থাকাই ভাল।'

'তবুও একথা তো ভাবিইনি যে এই সমস্ত লোকেরা এতখানি ধৃষ্টতা দেখাবে। আপনাকে হত্যার চেষ্টা করল, রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী করল। এখন আবার এই অপবাদ রটনা করছে যে আপনি শেখ সাহেবকে হত্যা করেছেন।'

'এর কারণ তুমি বোধ হয় বুঝতে পারবে না। প্রথম কথা হলো, বাদশাহ শেখ মুবারককে পিতার মত স্নেহ ও আদরের চোখে দেখেন। সেই জন্য তাঁর মৃত্যু বাদশাহকে খুবই দুঃখিত করবে। আর তাঁর কাছে আমার সমর্থক যিনি আছেন, তিনি হলেন আবুল ফজল। তিনি যখন জানবেন যে তাঁর পিতার মৃত্যুর কারণ আমি, অস্থায়ী ভাবে হলেও তখন তিনি আমায় বিরোধী হয়ে যাবেন। যাই হোক, বাদশাহের আদেশ না আসা পর্যন্ত আমার কিছু করার নেই। এখানকার অবস্থা বিচারে মনে হয় তিনি অবিলম্বে ফিরে আসবেন। আচ্ছা, তুমি এসব জানলে কি করে?'

গুল আনারার কথা দলপতি সিংহ অসঙ্কোচে বলে দিলেন।

পীথল বললেন, 'হাঁ, মেয়েটি ভাল। অনেক দিন ধরেই আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। তার সদগুণের কথা চিন্তা করলে তাকে যে তার কুলধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে সে জন্য দুঃখ হয়। তোমার কি আরও কিছু বক্তব্য রয়ে গেছে? বলনা, কি বলবে।'

একটি ভূমিকা সহযোগে দলপতি সিংহ সুরজমোহিনীর খবরটাও দিয়ে দিলেন। ইব্রাহিম খাঁয়ের গুল আনারার ঘরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে রয়েছে এবং তাকে যে অপসারিত করতে হবে সে কথাও জানিয়ে দিলেন।

পাঁথলের মুখমণ্ডলে ভাবের পরিবর্তন হলো। যে মুখে এ পর্যন্ত কোন ভাবান্তর দৃষ্ট হয়নি তা এবার ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দলপতি সিংহও চমকে উঠলেন।

তিনি তখন বললেন, 'এত বড় গুরুত্বপূর্ণ কাজের কথা আগে কেন বলোনি? বাদশাহের বিশিষ্ট বন্ধু কল্যাণমলের' পৌত্রী আমার মেয়ের মত। তাকে নির্যাতন করার অর্থ আমার পৌরুষকে আহত করা। তারা যদি এই ধরনের কোন অসঙ্গত আচরণ করে তাহলে তিনি শাহজাদাই হোন অথবা বাদশাহের শ্বশুরই হোন কৃতকর্মের ফল ভোগ তাঁকে করতেই হবে। তুমি যাও। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আমি করছি।'

দলপতি সিংহ গমনোদ্যত হতেই পাঁথল বললেন, 'দাঁড়াও! শীঘ্র একটি পাল্কি নিয়ে কয়েকজন অনুচরকে গুল আনারার বাড়িতে পাঠিয়ে যাতে তারা ইব্রাহিম খাঁকে গোপনে এখানে নিয়ে আসে তার ব্যবস্থা কর। আর যা কিছু করার এখানেই করে নেবো।'

দলপতি সিংহ বিদায় নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কল্যাণমলকে ডেকে পাঠানো হল। আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেঠজী রাজা পাঁথলের গৃহে এসে পৌঁছলেন। তাঁদের কথাবার্তা অনেকক্ষণ ধরে স্থায়ী হলো। বিকালে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

বিধি বাম হওয়ায় এবং মানুষের কুটিলতার জন্য ধারাবাহিক দুঃখ-দুর্দশা গ্রস্ত গজরাজ তার আঘাতের বিপদ থেকে আজ চার পাঁচ দিন হলো সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। কন্যার ভক্তিপূর্ণ সেবা এবং গুলাবের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা তার স্বাস্থ্য ফিরিয়ে দিল। বিশ্রাম, এবং নিয়মিত ও পুষ্টিকর খাদ্য অধিক রক্তক্ষরণ জনিত দুর্বলতা দূর করল। ঘুরে ফিরে নিজের কাজ নিজে করার ক্ষমতা সে লাভ করল। পদ্মিনীর সঙ্গে আলোচনার মধ্য দিয়ে সে জানতে পারল যে কাশিম বেগ নামক জনৈক মুসলমান যুবকই তার কন্যার সমস্ত বিপদের কারণ। সে একথাও জানতে পারল যে এব্যাপারে কাশিমবেগের সাহায্যকারী হচ্ছে হীরাজান নামের এক নর্তকী। কি করে এদের কাজের প্রতিশোধ নেওয়া

যায় এই হলো এখন তার একমাত্র চিন্তা। প্রতিদিন সে হীরাজানের বাড়ির সামনে গিয়ে কোন রকম সন্দেহ যাতে কেউ না করে সেই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। সন্ধ্যা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটা পর্যন্ত ঐ বাড়িতে যাতায়াতকারী প্রত্যেককে সতর্কভাবে দেখা তার একটা দৈনন্দিন কাজে পরিণত হয়েছিল। শেঠ কল্যাণমলও গজরাজকে ভোলেননি। তাঁর অনুচরদের মধ্যে একজন কেউ প্রত্যহ দলপতি সিংহের বাড়িতে এসে রোজকার অবস্থা জেনে যেতে। তাকে বরাবর এই সান্ত্বনাও দেওয়া হতো যে তার পত্নীর সন্ধান করা হচ্ছে এবং যত সুরক্ষিত অশোক কাননেই তাকে রাখা হোক না কেন একবার জানা গেলেই তাকে বের করে আনা হবে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনার পরদিন সকালেও শেঠজীর অনুচর এসেছিল। তার সঙ্গে কথাবার্তায় গজরাজ এবার আনন্দিত হলো।

অনুচর প্রশ্ন করল, 'আপনার পত্নীর অপহরণকারীকে দেখলে আপনি চিনতে পারবেন?'

'বাঃ! চিনবো না কেন?' গজানন বলল, 'যে নরকেই দেখা হোক না ঠিক চিনতে পারবো।'

'তাহলে আজ আটটা নটার সময় আপনি তাকে দেখতে পাবেন।'

'তাহলে তার জীবনও ঐ সময়ই শেষ হয়ে যাবে।'

'আপনার দ্বারা কতদূর কি সম্ভব হবে তা আমি বলতে পারি না।'

'সেই দুর্বৃত্তকে কোথায় পাবো? আমি সারা শহর খুঁজেছি; কোথাও তাকে পাইনি।'

'জায়গাটা আমি বলবনা। আপনার সামনে দিয়েই যাবে। শুধু এইটুকু খেয়াল রাখবেন যে রাস্তায় যেন কোন গোলমাল না হয়।'

এই কথোপকথনের পর সারা দিনটা গজরাজের যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে কেটে গেল। সে তার তলোয়ার এবং ছোরা শানিত করে সঙ্গে নিল। কোন ব্যাপারে তার কোন উৎসাহ নেই এবং তাকে খুব চিন্তামগ্ন দেখে পদ্মিনী ভীত হলো কিন্তু আজকাল প্রায়ই তার এইরকম খেয়ালী ভাব দেখা যায় বলে সে আর বেশি চিন্তিত হলোনা। কাজে যাওয়ার

আগে দলপতি সিংহ যখন তাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে তখন তার উত্তরটা বেশ বেসুরো এবং রহস্যপূর্ণ বলে মনে হলো। খুব দুঃখের সঙ্গে সে বলল, 'মহারাজ! আপনার এবং মাহারাজ পৃথ্বী সিংহের বিরুদ্ধে অজ্ঞতা বশত যে অপরাধ আমি করেছি তার কলঙ্ক আমাকে নিজের রক্ত দিয়েই ধুয়ে ফেলতে হবে। আপনার কৃপায় এখন আমি সম্পূর্ণরূপে সুস্থ। এখন আর এখানে থাকা অনুচিত। সেই জন্য আজ থেকে যদি আমার সন্ধান আর না পান তা হলে বুঝবেন যে আপনার উন্নতিও কল্যাণ কামনা করতে করতেই মরেছি। আমার এই অনাথিনী কন্যা পদ্মিনীকে আমি আপনার হাতেই দিয়ে যাচ্ছি। আমি জানি আপনি তাকে রক্ষা করবেন।'

একথার উত্তরে কিছু বলার অবসরই দলপতি সিংহ পেলেন না। কথাগুলি তাঁকে অবশ্যই বিস্মিত করেছিল কিন্তু তার কাহিনীর মধ্য দিয়ে তার স্বভাবের কিছু পরিচয়ও তিনি পেয়েছিলেন বলে বাধা দেওয়ার কোন রকম চেষ্টা করলেন না।

সেদিন সন্ধ্যা হতেই গজরাজ নিত্যকার মত তার জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। দিলপসন্দ বীথী তার প্রতিদিনের সৌন্দর্যে নিমজ্জমান ছিল। হীরাজানের বাড়িতে সেদিন অসাধারণ সাজ সজ্জা দেখা গেল। অলিন্দে, দালানে এবং অঙ্গনে রত্নদীপের বর্ণসমারোহ দর্শনীয় হয়ে উঠেছিল। দ্বারে দণ্ডায়মান সেবক এবং দাসীরাও সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত ছিল। গৃহাভ্যন্তর থেকে ভেসে আসা সঙ্গীত স্বরলহরী পথিকদের জানিয়ে দিচ্ছিল যে আজ কোন শুভদিন। রাস্তার দিককার সাদা ফরাসের উপর কোন স্ত্রীলোককে আজ দেখা যাচ্ছে না। এর অর্থ হচ্ছে এই যে আজ কারো ভিতরে আসার অনুমতি নেই। অন্য দিনের সঙ্গে আজকের পার্থক্য নজরে পড়ার মতো।

কোন রাজকুমার অথবা মস্তবড় পদাধিকারী কোন পুরুষকে স্বাগত জানানোর সৌভাগ্য আজ যে হীরাজানের হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিন চার বছর হলো রসিক ব্যক্তিরা তাকে ছেড়ে দিয়েছে এবং শাহজাদাও তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন। এমত অবস্থায় ব্যথিত হয়ে

হীরার দিন কাটছিল। আবার দানিয়াল শাহের নজরে পড়ে নিজের কার্যোদ্ধারের যে চেষ্টা সে কাশিম বেগ মারফৎ করেছিল তা সফল হয়নি। সেলিম শাহের পরাজয় উপলক্ষ্যে নগরে যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার মধ্যে একটা ভাল সুযোগ করে দেওয়ার যে আশ্বাস কাশিম বেগ দিয়েছিল তা সম্পূর্ণরূপে সাফল্য মণ্ডিত হয়নি। নাসির খাঁর গৃহে দানিয়াল শাহ এবং তাঁর পরমবন্ধুদের সামনে গান করার সুযোগ যদিও তার হয়েছিল কিন্তু অন্য ব্যাপারে খুব ব্যস্ত থাকার দরুন তাঁদের মধ্যে কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিদান করার অবসর পাননি। এই ভাবে সে চেষ্টাও বৃথা গেল। বন্ধু কাশিমবেগের কৃপাতেই আর একটি দুর্লভ সুযোগ তার হাতে এসেছে বাদশাহ সালামতের শ্বশুর, বণিক কুলচূড়ামণি সাম্রাজ্যের কুবের নাসির খাঁ স্বয়ং আজ ওই ভবনে পায়ের ধুলো দেবেন।

হতাশার তাপে শুষ্ক হীরার দুরাশা বৃক্ষে আবার অঙ্কুরোদ্গমের সম্ভাবনা দেখা দিল। নাসির খাঁর সাহায্য পেলে অন্য গণিকাদের চেয়ে ভাল ভাবে জীবন যাত্রা নির্বাহ করার আর অসুবিধা কোথায়? ঐশ্বর্যে তিনি কুবের তুল্য, ক্ষমতায় অগ্রগণ্য, সম্মানে শ্রেষ্ঠ এবং প্রভাব প্রতিপত্তিতে মহত্তর। তাঁকে বশে আনলে সব কিছুই সম্ভব। এ ব্যাপারে এখন আর কোন বাধাবিপত্তি হীরা দেখতে পেল না। নাসির খাঁ ষাট বছর পার করেছেন এবং সেও জানে যে বৃদ্ধ কামুকেরা স্ত্রৈণ হয়। ফলে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে তার সৌভাগ্য সূর্য উদয়াচলে আবার দেখা দিয়েছেন।

নাসির খাঁর আগমনের নির্দিষ্ট সময়ের দু ঘণ্টা পূর্বেই হীরাজান গৃহের সজ্জা এবং অতিথির আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে কৃত বিশেষ ববস্থা পরিদর্শনে এলো। অঙ্গনের রত্নখচিত দীপগুলির সৌন্দর্য পর্যাপ্ত না হওয়ায় সে ভৃত্যদের তিরস্কার করলো। দালানে বিছানো গালিচাটিকে নিজের হাতেই ঠিক করলো। নিম্নভাগের বৈঠকখানার ব্যবস্থাবলী ভাল না লাগায় ভৃত্যদের ডেকে সে যথাযথ ব্যবস্থা করিয়ে নিল। রৌপ্য-নির্মিত পানের বাটা প্রভৃতির ঔজ্জ্বল্য মনোমত না হওয়ায় সে অসন্তুষ্ট হলো। ব্যবহার্য বস্ত্র সমূহের জন্য নির্দিষ্ট দাসীদের সে বিশেষ রকমের কতকগুলি

নির্দেশ দিল। এইভাবে প্রত্যেকটি কথা পরীক্ষার পর সে নিজে বাসর ঘরের রূপসী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

অসাধারণ মনোযোগের সঙ্গে সে সেদিন কেশ বিন্যাস করলো। সৃষ্টির আদি থেকেই সৌন্দর্য বৃদ্ধির স্বাভাবিক বুদ্ধি মেয়েদের অগণিত পদ্ধতির সন্ধান দিয়েছে। অসভ্য মানব গোষ্ঠীর মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়। মিশরে পাঁচ হাজার বছর পূর্বেকার এমন সব বস্তু পাওয়া গেছে যা থেকে প্রমাণিত হয় যে সেখানকার মেয়েরা তৎকালে কাজল প্রভৃতির ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিল। যে ভারতে কামসূত্র ঋষির সৃষ্টি সেখানে এই বিদ্যাটির বহুল প্রচার প্রাচীন কাল থেকেই রয়েছে। বাল্মিকীই বলেছেন যে মহর্ষি-পত্নীর বরে সীতাদেবী সব সময়ই তাঁর পতির দৃষ্টিতে অলঙ্কৃত প্রতিভাত হতেন।

পুরুষের মনে আনন্দ সঞ্চার করার জন্যই যেন নারী জীবনের সার্থক রূপায়ণ ও আবির্ভাব।

বংশপরম্পরায় পেশায় যারা বারবণিতা তাদের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টির কৃত্রিম উপায়গুলি খুব বেশি রকম প্রচলিত ছিল। মুখের লাবণ্য বর্দ্ধক সুগন্ধ চূর্ণ, নয়নের সৌন্দর্য বৃদ্ধির সহায়ক অঞ্জন ওষ্ঠের রক্তিমতা বর্ধক বিশেষ বস্তু, বিশেষ বিশেষ অঙ্গগুলিকে আবরণের অন্তরালে রেখে তাদের আকর্ষণ বৃদ্ধির উপায় সুবাসিত প্রলেপ এবং প্রতি অঙ্গের সুষমা বৃদ্ধিতে সহায়ক অলঙ্কার প্রভৃতির সুষ্ঠু প্রয়োগে গণিকারা ছিল সুদক্ষ। এই ব্যাপারে হীরাজানও অপটু ছিলনা। খুব সাবধানতার সঙ্গে রূপসজ্জা সাঙ্গ হলে অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বস্ত্রালঙ্কার ধারণ করে নিজের কক্ষের বৃহৎ দর্পণের সামনে গিয়ে সে দাঁড়াল। নিজের রূপে মুগ্ধ হীরাজান নিজেই নিজেকে অভিনন্দিত করতে লাগল। সে যেন 'হেম পট্টাম্বর কঞ্চুক প্রভৃতি দ্বারা নিজ সৌন্দর্যের দ্যুতিকে বর্ধিত করে।

'সিন্দুর বিন্দু-লিপ্ত হয়ে, দুর্লভ সৌরভলিপ্ত দেহ নিয়ে কার্মণচূর্ণে গণ্ডদ্বয় উজ্জ্বল করে, মণিমাণিক্যমণ্ডিত অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হয়ে সুন্দর নীল কবরী ভারে পুষ্পমাল্য গ্রথিত করে, সবদিক দিয়ে সর্বজগতের সম্মোহনাস্ত্র হয়ে সকল হৃদয়কে উন্মত্ত করার আয়ক রূপে, কামদেবের

মহাত্ম্য প্রচারক আম্র মঞ্জরীর মূর্ততায় ঘনীভূত মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে * সে নিজেকে নিজেই দেখলো।

এইভাবে আত্ম-অভিনন্দন রতা বারবণিতা আত্ম-সৌন্দর্যে বিহ্বল হয়ে সেই কামুকের আগমন প্রতীক্ষায় রইল।

আটটা-নটা নাগাদ কাশিম বেগ ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে সেখানে এলো। দাসীরা তাকে হীরাজানের সমীপে নিয়ে গেল। চিরপরিচিত সেই সৈনিকও হীরাজানের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল। কোন অপ্সরাকেই বুঝি সে দেখছে এমন একটা সন্দেহ তার হলো। বাক্‌শক্তি রহিত হওয়ায় সে তাকে আলিঙ্গন করতে উদ্যত হলো। আজ কিন্তু হীরা এতে রাজী নয়। সে বলল, 'থামুন, মির্জা সাহেব! স্বামীর জন্য নির্দিষ্ট বস্তুকে সেবকের উচ্ছিষ্ট করা উচিত নয়। বলুন, কি খবর?'

হতচকিত কাশিম বেগ বলল, 'প্রভু এখনই আসছেন। সঙ্গে আসা অনুচিত মনে করে সব ব্যবস্থা দেখার জন্য আগেই চলে এলাম।'

'এই উপকারের কৃতজ্ঞতা আমি কি ভাবে ব্যক্ত করবো? এর দ্বারা আমরা দুজনেই যে উপকৃত হবো সেটাই বড় কথা।'

'আমি একটা কথাই বলব। খুব নিয়ম মেনে সহৃদয়তার সঙ্গে ব্যবহার করবে। তিনি খুব সন্দেহ প্রবণ এবং বৃদ্ধও বটে। অবশিষ্ট সব কিছুই তোমার উপর নির্ভরশীল।'

'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এখন সব দায়িত্ব আমার। উনি যদি

---

* হেমপট্টধর কূর্পাস কাদিয়াল
কোমলিম যকোলী কুচি কুচি,
সিন্দুঃপেট্টু ভোট্টোবোরো দুর্লভ
গন্ধবৎ দ্রবাঙ্গ পূণি পূণি
কার্মণাচূর্ণত্তাল পুণ্ডকবিল কম্মাটি—
কাশ্মট্টু কণ পকিট্টে কি যেকী
ওমন কাবোলি কুণ্ডলিলোগোয়ো
তুমলঃ মাল্যঙ্গল চুচি চুন্তী
সর্বত্র সর্বেশী সম্মোহনাত্মবায়—সর্বদ্রব্যভক্ষাদপোষধমায়
সাম্বথমাহাত্ম্য মাকন্দ-মঞ্জরী—মাংসষ্ঠ মাণিকা মাধুরিমান—

আজ খুশী হন তা হলে ভবিষ্যতে কোন অসুবিধা হবে না।'

এরই মধ্যে একটি দাসী ঊর্ধ্বশ্বাসে এসে খবর দিল যে নাসির খাঁ গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়েছেন। অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবরোহণরত নাসির খাঁকে সম্বর্ধিত করার জন্য দাস দাসীরা দৌড়ে গেল। ততক্ষণে হীরাও এসে গেল। কাশিম বেগকে আসতে দেখে নিজের কন্যার অপহরণকারী এবং পীথলকে আক্রমণে উৎসাহদাতা তাকে আক্রমণ করবে বলে গজরাজ স্থির করে ছিল। কিন্তু সে জানত যে তার সকল দুঃখের মূল, কাশিম বেগের প্রভু, শীঘ্রই সেই পথে আসবে। সুতরাং সুযোগের অপেক্ষায় সে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। বেশিক্ষণ তাকে পথ চেয়ে বসে থাকতে হয়নি।

কাশিম বেগ হাজির হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই হীরার গৃহদ্বারে আগত অশ্বারোহীকে দেখে তার দেহ কম্পিত হলো। তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে তারই পত্নীকে অপহরণ করেছিল যে দুর্বৃত্ত দেখা মাত্র গজরাজ তাকে চিনতে পারল। কিন্তু লোকটিকে যে কে তা সে জানত না। যে-ই হোক, আর ওকে বাঁচতে দেওয়া হবেনা এই সিদ্ধান্ত করে মুক্ত কৃপাণে গজরাজ অগ্রসর হলো। কিন্তু লোকটি ততক্ষণে প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। নিরাশ না হয়ে পরবর্তী কার্যক্রম সম্বন্ধে ভাবতে লাগল। সেই রাত্রেই লোকটি যখন হীরার বাড়ি থেকে বেরুবে তখন সে নিশ্চয় নিঃসঙ্গ থাকবে এবং তখন আক্রমণ করলে কৃতকার্য হওয়া যাবে, এই কথাই সে চিন্তা করল। অশ্বারোহীর সঙ্গে লড়তে হলে নিজেও অশ্বারূঢ় হওয়া অধিকতর সুবিধাজনক হবে এবং ঐ বাড়ি থেকে বেরুতেও লোকটির দু-এক ঘণ্টা লাগবে এই কথা চিন্তা করে কোথা থেকে ও এক অশ্ব সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে সে দলপতি সিংহের কাছে গেল। গুলাব তাকে তার ঘোড়াটা দিয়ে দিল। সে তখন কোন এক উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তির সেবকের ভঙ্গীতে হীরার বাড়ির কাছের এক জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। দুপুর রাতে হীরার কোমল শয্যা ত্যাগ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করার কথা নাসির খাঁ চিন্তা করলেন। পানাসক্তের মদিরা তাঁকে সংজ্ঞাহীন করেনি কিন্তু বুদ্ধি ভ্রংশ

এবং শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। যৌবনের সম্ভোগশক্তি এখন লুপ্ত হওয়ায় তাঁর দুঃখ হলো এবং নিরুৎসাহিত হয়ে তিনি বাইরে এলেন। দ্বার পর্যন্ত তাঁর অনুগামিনী হীরাকে তিনি আর একবার আলিঙ্গন করলেন এবং শীঘ্র আবার আসার কথা দিয়ে অশ্বারোহণ করে রওনা হলেন।

অদূরে প্রতীক্ষারত গজরাজও তাঁকে অনুসরণ করল। 'দিলপসন্দ্ বীথীর' উজ্জ্বল আলোকমালার জন্য ঐখানেই তাঁর উপর আক্রমণ করা সম্ভব ছিল না। ঐ বীথী অতিক্রম করে প্রধান সড়কে এসেই নাসির খাঁ বেশ সহজ গতিতে চলতে লাগলেন। নির্জন হওয়া সত্ত্বেও রাজপথটি নিজের কাজের উপযুক্ত নয় মনে করে গজরাজও পেছনে পেছনে চলতে লাগল। নাসির খাঁ বুঝতে পারলেন যে কেউ তাঁর পিছু নিয়েছে। সেই জন্য তিনি পিছন ফিরে না দেখেই হাতলে হাত রেখে তলোয়ার নিষ্কাসিত করে প্রস্তুত রইলেন। রাজপ্রাসাদ অতিক্রম করে তিনি যখন নিজের ভবনের পথ ধরলেন গজরাজ সেই সময় অশ্বকে দ্রুততর গতিতে চালিত করে তাঁর পিছনে পৌঁছে গেলেন। বহু যুদ্ধখ্যাত ঐ সৈনিকটি তলোয়ার হস্তে তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালেন। প্রশ্ন করলেন, 'কে তুই? প্রাণের মায়া না করে আমাকে আক্রমণ করতে চাস?'

'আমি কে?' প্রতিদ্বন্দ্বীর দৃঢ়কণ্ঠে গজরাজ জবাব দিল, 'ভাল করে দেখ। এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলি?' কথা শেষ না করেই সে তার তলোয়ার চালিয়ে দিল।

নাসির খাঁ বুঝতে পারলেন না যে আক্রমণকারী কে। কিন্তু আক্রমণকারীর আক্রমণ তিনি সহজেই প্রতিহত করলেন এবং দুজনেই সমান বিক্রমে লড়তে লাগলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধের গতি যত তীব্র থেকে তীব্রতর হলো নাসির খাঁর আচ্ছন্নতার ঘোরও তত কেটে এলো। প্রতিদ্বন্দ্বী যে অসি চালনায় দক্ষ তা ভালভবেই বুঝতে পারলেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি তাকে নিরস্ত্র করতে পারলেন না। এই অক্ষমতার জন্য সত্যই তার দুঃখ হলো। বেশ্যালয় প্রত্যাগত নাসির খাঁ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যোদ্ধার মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্রে শুধু অভ্যাস এবং শিক্ষাতেই যে কাজ চলে না এটা তাঁর বোধগম্য হতে লাগল। অবশেষে পারস্য দেশীয় একটি

কৌশলের প্রয়োগ করবেন বলে তিনি স্থির করলেন। কিন্তু ঘোড়াকে না নুইয়ে সেটি করা অসম্ভব ছিল। সুতরাং জুতোর গোড়ালি দিয়ে তিনি ঘোড়ার বুকে আঘাত করলেন। ফলে তার সামনের পা দুটো নুয়ে পড়ল। সেই সুযোগে তিনি গজরাজের বুক লক্ষ্য করে অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। এই আকস্মিক আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে তরবারিটি গজরাজের হস্তচ্যুত হলো। কিন্তু তাতে লাভবান হতে পারলেন না। নিজের তরবারিটি দ্বিখণ্ডিত হয়ে হাতলটি মাত্র তাঁর হাতে রইল।

প্রাণের মায়া না করে এখন দুজনেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভীম-দুঃশাসনের মত তাঁদের মধ্যে শুরু হলো মুষ্টিযুদ্ধ। শারীরিক দুর্বলতার জন্য নাসির খাঁ শীঘ্রই পরাজিত হতে লাগলেন। গজরাজ তাঁকে মাটিতে আছড়ে ফেলে বুকের উপর চড়ে বসলো। সে তাঁর গলা টিপে শ্বাস রুদ্ধ করতে করতে বলল, 'কি? এখনও কি মনে পড়ছে না আমি কে? আমার অন্ন ধ্বংস করে আমারই পত্নীকে অপহরণকারী কুকুর, মনে পড়ছে না?'

শ্বাসকষ্টে বিস্ফারিত-চক্ষু নাসির খাঁর জ্ঞানলুপ্ত হওয়ার পূর্বক্ষণে সব কথা মনে পড়ল। এ তার উচিত শাস্তি বলেই সে অনুভব করল। হস্তের বন্ধন শ্লথ করে গজরাজ প্রশ্ন করল, 'বল! আমার প্রাণেশ্বরী কোথায়? তাকে তুই হত্যা করেছিস?'

নাসির খাঁ উত্তর দিলেন, 'আমি তোর হাতের মুঠোয় এসে গেছি। কিন্তু মিথ্যা কথা বলছি না। তোর পত্নী আমার গৃহ থেকে অপহৃত হয়েছে। আমি তাকে অপহরণ করে এনেছিলাম বটে কিন্তু তার শ্লীলতা নষ্ট হয়নি। আমি যখন তাকে আনি তখন সে ছিল গর্ভবতী। অশ্বারোহণে গর্ভপাত হয়েছিল। তারপর সে রুগ্না ছিল। অল্প কিছু দিন হলো সে সেরে উঠেছিল। অন্তঃপুরের চিকিৎসালয় থেকে এনে নিকাহ করার নির্দিষ্ট দিন ছিল কাল। কিন্তু গতকাল সে নিখোঁজ হয়েছে। এখন সে কোথায় আমি জানি না।'

খড়্গ হস্তে গজরাজ বলল, 'এসব কি সত্য? তোর জীবনের

কয়েকটি মুহূর্ত মাত্র অবশিষ্ট আছে। ঈশ্বরের নামে সত্য কথা বল।'

'ছিঃ! আমি মিথ্যা কথা বলব?' নাসির খাঁ বললেন, 'আমার কথায় অবিশ্বাস করার সাহস এই সাম্রাজ্যে কার আছে? মৃত্যু তো সৈনিকের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকে। আমি অন্যায় করেছি, ভীরু নই।'

কথা বলার অবসরে নিজের বক্ষোপরি উপবিষ্ট যোদ্ধাকে স্থানচ্যুত করার উদ্দেশ্যে তিনি যথাসম্ভব জোরে একটি ঝটকা দিলেন। এত বিপন্ন হওয়া সত্ত্বেও যে দুর্বৃত্ত এতখানি শক্তি রাখে তাকে আর জীবিতাবস্থায় না রাখার জন্য গজরাজ তার খঞ্জরটি তাঁর বুকে আমূল বিদ্ধ করে দিল। আকবর বাদশাহের শ্বশুর, সাম্রাজ্যের প্রধানতম সামন্ত, বাদশাহ সালামতের প্রতিনিধি প্রবল শক্তি সম্পন্ন সেই তুর্কী এই ভাবেই তার নিদারুণ পাপের ঋণ শোধ করল।

প্রতিশোধের প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতেই গজরাজও মরণোন্মুখ শত্রুর দিকে দৃষ্টিপাত না করে স্থান ত্যাগ করল।

নাসির খাঁর মৃত্যুতে সারা শহরে শোরগোল পড়ে গেল। সাম্রাজ্যের পদাধিকারী ব্যক্তি বর্গের মধ্যে এক বৃহৎ সংখ্যক তুর্কী ছিল। তাঁদের নেতা একজন সাধারণ দুবৃত্তের মত রাজপথে নিহত হয়েছেন একথা কানে যেতেই তাঁরা ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন। তাঁদের অসংখ্য দেহরক্ষী এবং অনুচর শহরে ছিল। তাদের মধ্যে রটে গেল যে পীথলই নাসির খাঁর হত্যা ঘটিয়েছেন। নাসির খাঁর প্রতি পীথলের শত্রুতা এবং বাদশাহের বিরুদ্ধে সেলিমের সঙ্গে পীথলের সহযোগিতার ক্ষেত্রে নাসির খাঁর বিরোধিতাকেই কারণ হিসাবে দেখান হল। এ সমস্তই যে সত্য এবং দানিয়াল শাহ যে তা জানেন সে কথা বলতে তিনি নিজে কোন সঙ্কোচ বোধ করলেন না। শাহজাদার আদেশে পীথলের হাত থেকে সমস্ত ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার জন্য এবং তাঁকে কারারুদ্ধ করার জন্য শাহের তুর্কী সম্প্রদায় উৎসুক হয়ে উঠলো। স্পষ্টতঃ রাজধানীতে দুটি দল গড়ে উঠল। সর্বত্রই অস্ত্র হাতে সৈনিক দৃষ্টি-গোচর হতে লাগল। সেলিমের পক্ষভুক্ত সকল পদাধিকারী এবং হিন্দুরাজারা পীথলের পক্ষে থাকায় তুর্কী সৈন্যরা বিশেষ কোন অত্যাচার

করতে পারল না। কিন্তু দু দলই বিশ্বাস করল যে পীথলই নাসির খাঁর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিয়েছেন।

সমস্ত জনসাধারণ এইভাবে তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও রাজপুত শ্রেষ্ঠ পীথল চিন্তিত হননি। তিনি জানতেন, নগর রক্ষী সেনাদল তাকে আক্রমণ করবে না। শত্রুপক্ষের ভ্রষ্টাচার বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অসঙ্গত কোন কাজ সেই জন্য তিনি করতে রাজী হলেন না। নিজের গুপ্তচরদের মারফৎ তুর্কী পদাধিকারীদের উদ্দেশ্যের কথা জ্ঞাত হয়ে শহরের আভ্যন্তরীন রক্ষা কার্যের আবশ্যক ব্যবস্থা অবলম্বন করলেন। সৈন্যদের ছোট ছোট দলগুলিকে তিনি শহরের প্রধান প্রধান স্থানে প্রহরায় নিযুক্ত করলেন, বড়বড় কামানগুলির মুখ তুর্কী আমলাদের প্রাসাদের দিকে ঘুরিয়ে দিলেন এবং রাজপথে ও বাদশাহের প্রাসাদের চতুর্দিকে আবশ্যক সৈনিক শক্তির সুব্যবস্থা করলেন। এইসব দেখে বিরোধীরা বুঝলেন যে রাজধানীকে স্বাধীন করার চেষ্টা এবং আত্মনাশ একই বস্তু।

শুধু তাই নয়, ঢোল সহরতের মাধ্যমে পীথল ঘোষণা করলেন, যে 'মহামান্য বাদশাহের সম্মানিত শ্বশুর মহাশয় এবং পদাধিকারীদের প্রধান নাসির খাঁয়ের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার দৃঢ় প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এই মহাপাপ যে-ই করে থাক না কেন, তাকে খুঁজে বের করে হাতীর পায়ের তলায় পিষে মারা হবে। আততায়ীকে ধরার ব্যাপারে যে ব্যক্তি সাহায্য করবে অথবা তার সন্ধান দেবে তাকে উপযুক্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। এই কর্তব্য সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত নাগরিকদের শান্ত থাকতে হবে।'

পীথলের সম্বন্ধে যে সন্দেহ সাধারণের মনে জেগেছিল এই ঘোষণার ফলে তা দূর হলো। কিন্তু নাসির খাঁর অনুচরদের, তুর্কী সৈনিকদের এবং দানিয়াল শাহের অনুরাগীদের কিন্তু এসব ভাল লাগল না। তা সত্ত্বেও সৈন্যবাহিনী পীথলের হাতে থাকায় বাদশাহ না আসা পর্যন্ত চুপ করে থাকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিলনা। আকবর বাদশাহ নাসির খাঁকে সম্মানের চোখে দেখতেন এবং তাঁর রাজভক্তির উপর আস্থাশীল ছিলেন। নাসির খাঁর কন্যা তাঁর পাটরাণীদের অন্যতমা ছিলেন। চার পাঁচ বছর মাত্র হল ঐ সুন্দরী যুবতীকে রাজপুরীতে এনে বিয়ে দেওয়া হয়েছে।

লোকের ধারণা আকবর ঐ বেগমকে খুব ভালবাসেন এবং তারই ফলে নাসির খাঁ রাজধানীতে এত প্রবল প্রতাপান্বিত। তুর্কীরা 'রক্তের বদলে রক্ত' পন্থায় বিশ্বাসী এবং প্রতিশোধস্পৃহা বংশ পরম্পরা প্রবহমান। সেই কারণে পিতার ঘাতককে হত্যা না করা পর্যন্ত ঐ বেগম কোন মতেই ক্ষান্ত হবেন না। বাদশাহও যা হয় কিছু করে তবেই তাঁর প্রাণ প্রিয়াকে শান্ত করবেন। জনসাধারণ এ সবকথা বিশ্বাস করতো। রাজা পীথলের কঠোর নির্দেশ এবং ব্যবস্থার ফলে রাজধানী উপর থেকে শান্ত মনে হচ্ছিল। কিন্তু ঐ শান্তি ছিল বিস্ফোরণোন্মুখ আগ্নেয়গিরির শান্তি। ফলে সাধারণের মনে ভয় ও আতঙ্কের ভাব বাড়তেই থাকল। পীথলও জানতেন যে নাসির খাঁর এই অকাল মৃত্যু তাঁর পক্ষেও বিপজ্জনক। সেই জন্য শুভেচ্ছুদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বেশির ভাগ সময় স্বগৃহেই কাটাতেন। নগর রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে এবং পর্যবেক্ষণের জন্য যখন বাইরে যেতেন তখন প্রয়োজন মত দেহরক্ষী সঙ্গে নিতেন। এসব তিনি প্রাণভয়ে করতেন না। সংঘর্ষ অথবা যুদ্ধ হওয়া বাদশাহ এবং সাম্রাজ্যের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে এই ভাবনা থেকেই তিনি সতর্ক থাকা উচিত মনে করেছিলেন।

নাসির খাঁর হত্যাকাণ্ডের পর তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে পীথল যখন অনুচরদের সঙ্গে স্বগৃহে ছিলেন সেই সময় বাদশাহের মুদ্রাবাহক রক্ষী এসে পৌছল। বাদশাহের কাছ থেকে জরুরী নির্দেশ নিয়ে খানখানা সাহেব যে নগর দ্বারে উপস্থিত হয়েছেন এই খবর সে নিয়ে এসেছিল। দ্বাররক্ষী সৈন্যদল তাঁর বাহিনীর পথরোধ করায় তিনি নগর দ্বারে অপেক্ষা করছেন। খানখানার আগমনবার্তা শুনেই পীথল বুঝলেন যে ব্যাপার গুরুতর। খানখানা ছিলেন বাদশাহের বিশ্বস্ত বন্ধুদের মধ্যে একজন। তিনি সাম্রাজ্যের প্রধান সেনাপতি এবং পদমর্যাদায় তিন হাজার সৈন্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি যখন সংবাদবাহক হয়ে এসেছেন তখন ব্যাপার যে গুরুত্বপূর্ণ তাতে কোন সন্দেহ ছিলনা। সেই জন্য পীথল ছোট একটি দেহরক্ষী সেনাদল নিয়ে নগর দ্বার অভিমুখে যাত্রা করলেন। নানা চিন্তায় তাঁর মন অধীর হয়ে উঠছিল। তা সত্ত্বেও

মুখের ভাব ছিল শান্ত এবং নির্বিকার।

সিংহদ্বারে পৌঁছেই অশ্বপৃষ্ঠ থেকে অবতরণ করে দেহরক্ষী সৈনিকদের সেখানেই থাকার আদেশ দিয়ে দলপতি সিংহ তিনি খানখানার কাছে গেলেন। রাজার আগমন সংবাদ পেয়ে খানখানা নিজে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে অর্ধপথেই তাঁকে স্বাগত জানালেন। পারস্পারিক অভিবাদনের পর পীথল প্রশ্ন করলেন, 'মহানুভব মহামান্য বাদশাহের কুশলে আছেন তো?'

'তিনি কুশলে আছেন। পরশু রওনা হয়ে এক হপ্তার মধ্যে তিনি এখানে পৌঁছে যাবেন।'

'আপনার কুশল প্রশ্ন করা অনাবশ্যক। এতদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরও মনে হচ্ছে আপনি যেন আপনার প্রাসাদের উদ্যান থেকে বেড়িয়ে এলেন। পথে কোন অসুবিধা হয়নি তো?'

'না। আপনারও কুশল তো?'

'শারীরিক কুশলে আছি বটে কিন্তু এখানকার অবস্থায় কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছে। আপনি এখন ফিরে এসেছেন। মহামান্য বাদশাহ আসছেন। এইবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি আমার বন্ধু। আপনার সঙ্গে মিলিত হয়ে সব সময় আনন্দ লাভ করি। আপনার সঙ্গে মিলিত হতে পেরে যতটা আনন্দিত হয়েছি ততটা কখনও হইনি।'

'তার কারণ?'

'আপনি মহামান্য বাদশাহের আদেশ বহন করে এনেছেন। নগর রক্ষার ভার আমার উপর ন্যস্ত করে যে দিন থেকে তিনি গেছেন সেই দিন থেকে একদিনের জন্য ও আমি শান্তিতে থাকতে পারিনি। এ বিষয়ে আর কি বলব? বাদশাহের প্রিয়তম সেনাপতিই যখন এসে গেছেন তখন আমার ভার কিছুটা লাঘব তো হবেই।'

'আপনি সত্যিই আমার মনের ভার কিছুটা কমিয়ে দিচ্ছেন। আমি আপনাকে যা বলব তা খুব গোপনীয়। দয়া করে আমার সঙ্গে এক্ষুণি তাঁবুতে আসুন।'

খানখানার জন্য নতুন খাটানো তাঁবুতে দুজন চলে এলেন। চতুর্দিকে

প্রহরারত সৈনিকদের এবং প্রহরীদের দূরে সরিয়ে দিয়ে খানখানা বলতে শুরু করলেন, 'বন্ধু পীথল, আমার কথায় আপনি যে দুঃখ পাবেন তা আমি জানি। আমি শুধু মাত্র বাদশাহের আদেশবাহী এই টুকু মনে করে আমাকে ক্ষমা করবেন এই আমার প্রার্থনা।'

পীথল মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, 'বাদশার আদেশ যাই হোক না কেন, আমি তাকে নির্ভুল মনে করি। আপনি জানেন আমি তার বিরুদ্ধাচরণও করি না। সুতরাং অসঙ্কোচে তাঁর আদেশ পালন করুন।'

'রাজধানীর সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করার জন্যই বাদশাহ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। এই তাঁর ফরমান—পড়ুন।'

কাগজটি হাতে নিয়ে পীথল বললেন, 'এ সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই। আপনার কথাই আমার কাছে আদেশ।'

'তবুও পড়ুন। বাদশাহের মুদ্রাঙ্কিত বলেই পড়ে দেখা কর্তব্য।'

সতর্কতার সঙ্গে পীথল ফরমানটি পড়লেন।

সংক্ষেপে জালালুদ্দীন আকবর বাদশাহের হুকুম হচ্ছে, 'আমি আগ্রা ত্যাগের পূর্বে রাজকার্য পরিচালনার জন্য যে ব্যবস্থা করেছিলাম এই ফরমান দিয়ে তা রদ করা হচ্ছে। রাজধানীতে আমার প্রতিনিধি হিসাবে সমস্ত কার্য পরিচালনার জন্য আমীর-উল-ওমরাহ আসমনজাহ খানখানাকে এই ফরমানের দ্বারা নিযুক্ত করা হচ্ছে। শাহজাদা, ওমরাহ, পদস্থ ব্যক্তিবর্গ সকলকে খানখানার অধীনে থাকতে হবে।' ফরমান পাঠ করে পীথল বললেন, 'বন্ধুবর! নিজের সমস্ত ক্ষমতা আমি এই মুহূর্তে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছি। এই দায়িত্ব আর কারো কাছে সমর্পণ করতে হয়নি বলে আমি আনন্দিত।'

খানখানা বললেন, 'মহারাজ পৃথ্বী সিংহ রাঠোর এতখানি আনন্দের সঙ্গে নিজের ক্ষমতা ত্যাগ করায় আমি বিন্দুমাত্র আশ্চর্য হইনি। কিন্তু এতে আমি কম দুঃখিত হলাম না। বাদশাহের ইচ্ছা এই অবসরটুকু আপনি তাঁর নগরকেচ রাজপুরীতে সুখে অতিবাহিত করুন।'

এই কথাটির প্রকৃত অর্থ পীথলের বোধগম্য হলো। শুধুমাত্র ক্ষমতাচ্যুত করা নয় তাঁকে বন্দীকরার আদেশও বাদশাহ দিয়েছেন।

আত্মমর্যাদার প্রতিমূর্তি সেই পুরুষসিংহের এতে অসাধারণ ক্রোধ হলো। কিন্তু তার কোন লক্ষণ চেহারায় প্রতিফলিত হতে না দিয়ে তিনি বললেন, 'তাহলে আমি বন্দী হলাম, তাই না ?'

'মহারাজ ! বাদশাহের প্রমোদভবন নগরকেচ কারাগার হলো কবে থেকে ? আমার এইমাত্র প্রার্থনা যে বাদশাহের প্রিয় বন্ধুর মত সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে আপনি ঐ রাজপুরীতে বাস করুন। রাজধানীতে আপনার অসংখ্য শত্রু। সেই জন্য আপনার প্রাণরক্ষার উপায় হিসাবে বাদশাহ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেছেন। তিনি একথাও শুনেছেন যে একদিন রাত্রে কয়েকজন আততায়ী আপনাকে হত্যার চেষ্টাও করেছিল। সেই কারণে আপনার রক্ষার জন্য তিনি এই উপায়ের কথা চিন্তা করেছেন।'

নিজের বন্ধুর রাজনীতিজ্ঞানে মুগ্ধ হয়ে পীথল তাঁকে অভিনন্দিত করলেন, 'বেশ, বেশ ! খানখানা সাহেব ! রাজ্যের প্রধান রাজনীতি বিদ আপনাকে বৃথাই বলা হয়না। আমাকে নগরকেচ প্রাসাদে থাকতে বলার অর্থ আমরা উভয়েই বুঝি। এ ব্যাপারে বিতর্ক কেন ? বাদশাহ সালামত এক হপ্তার মধ্যেই যখন আসছেন তখন এটা একটা এমন কিছু নয়। আমি একটা প্রশ্ন করবো ? শত্রুরা আমার বিরুদ্ধে কি কি অভিযোগ এনেছে ?'

খানখানা হেসে ফেললেন। 'মহারাজ। আপনি অত্যন্ত ধীর চিত্ত এবং বীর পুরুষ। একটি বড় রাজবংশের সন্তান। কপটতা আপনি জানেন না। এই দু মুখোদের কপটতার কথা জেনে কি করবেন ? জেনে লাভই বা কি ?'

'তবুও, আমার সম্বন্ধে বাদশাহের কাছে কি কি খবর গেছে তা তো জানা দরকার। কে বলেছে তা বলবেন না ?'

'অনেক কিছু লিখেছিল। আপনি সেলিমের হাতে আগ্রাকে তুলে দিতে যাচ্ছেন এটাই ছিল প্রধান বক্তব্য।'

পীথল হেসে বললেন, 'সেই জন্যই বোধ হয় সেলিমশাহ একটি তোপও না দেগে ফিরে গেলেন।'

'হ্যাঁ, আপনি হাসতে পারেন। কিন্তু বাদশাহ এখনও জানেন না

যে সেলিম চলে গেছে। আমিও পথে আসতে জানলাম। এখবর পাওয়ার আগেই বাদশাহ বোধ হয় রওনা হয়ে গেছেন।'

'বেশ, তারপর ?'

'শেখ মুবারককে আপনি বিষ দিয়েছেন। আপনি তাই যদি করে থাকেন তা হলে আমি বলব সাম্রাজ্যকে আপনি রক্ষা করেছেন। সত্য-সত্যই ঐ দুষ্ট শেখ বাদশাহকে উল্টোপাল্টা শেখাত। তার দুর্বুদ্ধিতেই বাদশাহ ইসলাম ধর্মকে পর্যন্ত ছেড়েছেন। সেই জঘন্য ব্যক্তির আত্মাকে কৃতকর্মের ফলভোগের জন্য যদি রওনা করে দিয়ে থাকেন তার জন্য আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।'

'আর ?'

'অন্তঃপুর সংক্রান্ত কাজেও আপনি হস্তক্ষেপ করতেন। সব মিলিয়ে দানিয়াল শাহ এবং নাসির খাঁ আপনার বাধা পেয়েছেন।'

'নাসির খাঁর মৃত্যুর জন্য আমাকে দায়ী করা হয়নি ?'

আশ্চর্য হয়ে খানখানা প্রশ্ন করলেন, 'কি ? নাসির খাঁ মারা গেছে ? কবে ? কি ভাবে ?'

পীথল বললেন, 'আরে ! আপনি জানেন না ? দুদিন আগে নাসির খাঁর মৃতদেহ রাজপথে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। একটি ছুরিকা তাঁর বুকে বিদ্ধ ছিল। সেদিন রাত্রে সে বেশ্যা হীরার বাড়ি গিয়েছিল। অর্ধেক রাত্রে ফিরছিল। মনে হয় কোন শত্রু পথেই তাকে হত্যা করেছে। এই ব্যাপারেও আমার নাম প্রচার করা হয়েছে। তুর্কী অভিজাতরা এবং দানিয়াল শাহ আমার মাথা নেওয়ার জন্য অধীর হয়ে উঠেছে।'

এই সংবাদে খানখানা খুবই দুঃখিত হলেন। নাসির খাঁ ছিলেন তাঁর পরমবন্ধু। বাদশাহের আত্মীয় হওয়ায় তিনি খানখানার কাছেও সম্মানিত ছিলেন। কেবলমাত্র এই কারণেই তিনি যে দুঃখিত হয়েছিলেন তাই নয়, নাসির খাঁর মৃত্যুর ফলে রাজকার্যে ব্যাঘাত ঘটার সম্ভাবনাও ছিল। এবং দানিয়াল শাহের সাহায্যকারী দু ব্যক্তি এত অল্প সময়ের ব্যবধানে নিহত হলেন সে কি কোন ষড়যন্ত্রের ফলে ? দানিয়াল শাহকে

উত্তরাধিকারী করার ব্যাপারে এই দুজনই ছিলেন সবচেয়ে বেশি আগ্রহশীল। এক্ষেত্রে পরামর্শদাতার ভূমিকায় ছিলেন শেখ মুবারক এবং প্রতিপত্তি শালী ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের দ্বারা প্রয়োজনীয় সৈন্যবাহিনী সংগঠনের কাজ ছিল নাসির খাঁর। বাদশাহ ও তাঁদের দিকেই ঝুঁকে ছিলেন। সেলিমের বিদ্রোহের কারণও এই। সেই জন্য শেখ মুবারক যদি স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করে থাকেন এবং ইতিমধ্যে নাসির খাঁ যদি আততায়ীর ছুরিকার শিকার হন তাহলে এসমস্তই সেলিমকে শক্তিশালী করে এবং বাদশাহের পক্ষকে দুর্বল করে। খানখানা বললেন, 'মহারাজ! এতো বড়ই দুঃখের কথা। যে দোষই নাসির খাঁর মধ্যে থেকে থাকুক না কেন, সে ছিল একজন বীর এবং বিশ্বাসভাজন রাজভৃত্য। এই সময় তার মৃত্যু বহু বিপদের কারণ হতে পারে।'

পীথল উত্তর দিলেন, 'আমিও তাই মনে করি। তুর্কীদের মত আপনিও কি মনে করেন যে আমিই তাঁকে হত্যা করিয়েছি? আপনি কি আমাকে এতটা মূর্খ মনে করেন?'

'একথা আমি ভাবিওনি। আপনি কি মনে করেন যে আমি আপনার সম্বন্ধে এভাবে ভাবতে পারি? কিন্তু একথাও যখন শুনবেন, বাদশাহ তখন কি ভাববেন চিন্তা করে আমি ভীত হচ্ছি। বাজারের গালগল্পই যে অন্তঃপুরে প্রকৃত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায় একথা তো আপনি জানেন। বিবেকবান আকবরকেও এসমস্ত হঠকারিতার পথে ঠেলে দিতে পারে।'

'আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করব? আমার সম্বন্ধে আরোপিত এই সমস্ত কথা বাদশাহ কি বিশ্বাস করেছেন?'

'এই প্রশ্ন আপনি কেন করছেন? আপনি বাদশাহের পরম প্রিয় বন্ধু। আপনার সম্বন্ধে এসব কথা তিনি কি করে বিশ্বাস করতে পারেন? আর যদি বিশ্বাসই করে থাকতেন তাহলে তাঁর আদেশের চেহারাটা কি এই রকম হতো?'

'তা হলে আমাকে বন্দীদশায় রাখতে চান কেন?'

'বন্দী? এই শব্দটির ব্যবহার করবেন না। আমি বলেছি না,

আপনার নিরাপত্তার জন্যই তিনি এ ব্যবস্থা করেছেন। আপনিই ভেবে দেখুন না, যাঁকে তিনি গুরু হিসাবে স্বীকার করতেন এবং সেই হিসাবে যাঁকে তিনি পূজা করতেন, তাঁকে আপনি হত্যা করেছেন এই যদি তাঁর বিশ্বাস হতো তাহলে তার শাস্তি কি শুধু বন্ধনই হতো?' পীথলেরও মনে হলো কথাটা সত্য। বাদশাহের মনে যদি সন্দেহও হতো তাহলে দণ্ড হতো আরও কঠোর। পীথলের ভাবান্তরে যখন মনে হলো যে তিনি তাঁর কথাকে বিশ্বাস করেছেন তখন খানখানা বললেন, 'সেলিম শাহের ব্যবহারে বাদশাহ সত্য সত্যই দুঃখিত হয়েছেন। আপনি যে রাজধানী তাঁর হাতে ছেড়ে দেবেন এ ভয় তাঁর ছিল না। কিন্তু তাঁর ধারণা এই যে কেবল মাত্র রাজধানী দখলই সেলিমের উদ্দেশ্য নয়, বিরাট সৈন্যবাহিনী হাতে থাকায় এবং শাবাস খাঁ-এর অর্থভাণ্ডার হস্তগত হওয়ায় সিংহাসন দখলেই সে উদ্যোগী হবে। কতিপয় ওমরাহ ও মৌলবী তাঁকে এই ব্যাপারে সর্বদাই উৎসাহিত করে থাকে। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে উপদ্রবের আধিক্য বিবেচনা করেই বাদশাহ ফিরে আসছেন। আপনার উপর অবিশ্বাস এর কারণ নয়।

'যাই হোক। সে তো শীঘ্রই বোঝা যাবে। এখন আমার কি করনীয় আপনিই বলুন।'

'বন্ধুবর! ন্যায়-অন্যায় বোধ আপনার আছে এবং রাজকার্যেও আপনি অভিজ্ঞ।'

ভূমিকা শুনেই পীথল বুঝলেন বিপদের আরও বাকি আছে। তাঁর মনের খবর খানখানার কাছেও গোপন রইল না। খানখানা বললেন, 'বাদশাহের আর কোন নির্দেশ নেই। আপনি আমার প্রাণের বন্ধু। আমি আপনাকে কি আদেশ করতে পারি? সেই জন্য আপনিই স্থির করুন। আপনি যদি শহরেই থাকতে চান তাহলে আমারই অতিথি হয়ে থাকতে পারেন। আর যদি স্বগৃহেই থাকার মনস্থ করেন তা হলেও আপত্তির কিছু নেই। আমাকেও আপনার অতিথি হিসাবে গ্রহণ করতে আপনার দিক থেকে যে কোন রকম আপত্তি যে থাকবে না তা আমি জানি। যদি শহরে না থাকেন তাহলে নগরকেচ মহলে

সুখে বাস করুন।'

শিষ্টাচারপূর্ণ এই কথাগুলির অর্থ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। যেখানেই থাকুন না কেন তিনি যে স্বাধীন নন একথা বুঝে পীথল বললেন 'খাঁ সাহেব, আপনার এই সহৃদয় কথাগুলির প্রকৃত অর্থ আমি বুঝেছি। আমার গৃহে আপনার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে আপনি তা জানেন। আপনাকে নিজের অতিথি হিসাবে পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করবো। কিন্তু তার সময় এ নয়। সেই জন্য নগর-কেচ প্রাসাদেই আমি নির্জনে বাস করবো আমার ভৃত্য এবং অনুচরদের সঙ্গে নেওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন আপত্তি হবে না তো ?'

'বাদশাহ বলেছেন, ওটিকে আপনি আপনার স্বগৃহ বলেই মনে করবেন। যতজন সেবকের দরকার আপনি আপনার সঙ্গে নিতে পারেন। কিন্তু বাদশাহের প্রাসাদে পদাধিকারী ব্যক্তিদের দেহরক্ষীদের তো প্রবেশাধিকার নেই। ওখানকার রক্ষী সেনাদলকে আপনার আজ্ঞাবাহী হওয়ার নির্দেশ দিয়ে দিচ্ছি।'

'তা হলে আর দেরি করবো না। আপনি অনুমতি দিলে একজনকে পাঠিয়ে বাড়িতে খবর দিয়ে দি। আমার সঙ্গের রাজকুমার দলপতি সিংহকে একবার ডেকে পাঠান।'

দলপতি সিংহকে ডেকে দেওয়া হলো। পীথল তাঁকে বললেন, 'তুমি সুন্দর শহরে গিয়ে নগরকেচ মহলে আমার বস্ত্রাদি আবশ্যক জিনিসপত্র নিয়ে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমার ভৃত্যদের বল। আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার দেহরক্ষী সৈনিকদের ছুটি দিয়ে দিও এবং দেওয়ানজীকে বলে তাদের একমাসের বেতন অগ্রিম পাইয়ে দিও।'

দলপতি সিংহ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পীথল আবার বললেন, 'এখন ইনিই হচ্ছেন আগ্রায় রাজপ্রতিনিধি। অল্পকালের জন্য আমি রাজধানীর বাইরে যাচ্ছি।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আমিও আপনার সেবায় যেতে পারি তো ?'

'না, এখন সম্ভব নয়।'

খানখানা বললেন, 'মহারাজ! এই যুবককে কিছু দিনের জন্য

আমার অধীনে ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আপনার আপত্তি আছে ?'

পীথল বললেন, 'খাঁ সাহেব এই যুবক আমার সংকর্মী বটে কিন্তু ভৃত্য নয়। সমমর্যাদা সম্পন্ন রাজপুত রাজকুমার ইনি। স্নেহের টানেই আমার সঙ্গে আছেন। কারো হাতে সমর্পণের অধিকার আমার নেই।'

দলপতি সিংহের দিকে পরীক্ষকের দৃষ্টিতে দেখে খানখানা বললেন, 'রাজকুমার, মহারাজ এবং আমি—এই দুজন আমরা ভাই-ভাই। তাঁর ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনি যদি আমার সঙ্গে থাকতেন তাহলে তার চেয়ে আনন্দদায়ক আর কি হতে পারে ?'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন 'হুজুর! আপনার আদেশ আমার পক্ষে অনুগ্রহের সমান। কিন্তু আমার নিজের কিছু কাজ আছে। সেই জন্য এই সময় ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পৃথ্বী সিংহের বন্ধুদের আমি আমার প্রভু মনে করি। আপনার আজ্ঞানুবর্তী হওয়ার সৌভাগ্য যে এবারকার মত লাভ করতে পারলাম না সেটা আমার দুর্ভাগ্য।'

খানখানা বললেন, 'শাবাস। তবু, সময় পেলেই আমার কাছে অবশ্যই আসবেন।'

দলপতি সিংহ রাজা পীথলের চরণ স্পর্শ করলেন। অতঃপর খানখানার অনুমতি নিয়ে তিনি শহরের দিকে যাত্রা করলেন। দুই বন্ধুর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর পীথল বললেন, 'আমি জানি, আপনার সামনে বৃহৎ কর্তব্য রয়েছে। আমার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাজ তো হয়ে গেল। কিন্তু দানিয়াল শাহকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে দায়িত্ব ভার গ্রহণ করার কাজ আপনার পক্ষে অসুবিধাজনকই হবে। আচ্ছা, এইবার আমাকে অনুমতি দিন। নগরকেচে আমার সঙ্গে কাকে পাঠাচ্ছেন ?'

বিচলিত হয়ে খানখানা উত্তর দিলেন, 'মহানুভব পীথল! আপনার চরিত্রের মহত্ত্বকে আমি কিভাবে অভিনন্দিত করব ? আজ পর্যন্ত আমরা বন্ধু ছিলাম। আজ থেকে আপনি আমার কাছে অগ্রজের তুল্য আদর ও ভালবাসার অধিকারী হলেন। এই ব্যাপারে দুঃখিত হবেন না। বাদশাহের এই আদেশ আপনার আত্মসম্মানকে যে আহত করবে তা

আমি জানি। কিন্তু এ সমস্তই অল্প দিনের ব্যাপার। বাদশাহের দরবারে আপনার অনেক প্রতিপত্তিশালী বন্ধু রয়েছেন, সে কথা ভুলবেন না।'

পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন এবং পরে শীখল বিদায় নিলেন।

সেলিমের যুদ্ধ প্রচেষ্টার খবর পেয়েই আকবর আগ্রার দিকে ফিরলেন। দাক্ষিণাত্যে থাকার সময়টুকুর মধ্যেই তিনি বাহাদুর শাহকে পরাজিত করে আমার গড় দুর্গ দখল করলেন। ওদিকে খানখানার প্রতাপের সামনে আহমদনগর মাথা নত করল। এই সব জয়লাভের আনন্দে যখন তাঁরা উচ্ছল তখনই মুবারক শাহের মৃত্যু সংবাদ এবং সেলিমের যুদ্ধ প্রচেষ্টার সংবাদ তিনি পেলেন। আকবরের বয়স তখন প্রায় উনষাট। শরীরও ক্রমশ দুর্বল হচ্ছিল। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে যে বিবাদ ছিল তাকে তিনি গুরুত্বের দৃষ্টিতে দেখেন নি। তাঁর মৃত্যুর প্রতীক্ষায় শাহজাদাদের সঙ্গে সামন্তরাও যে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে সেটা তিনি জানতেন। বৃদ্ধ বয়সে আকবর যে 'দীন ইলাহি' ধর্মের স্থাপন করেছিলেন সেটাই এই বিভাজনের কারণ হলো। প্রধান প্রধান মুসলমান পদাধিকারী এবং মৌলবী মোল্লাদের মনে বাদশাহের এই ধর্মপরিবর্তন ও প্রচার গভীর বিদ্বেষের সৃষ্টি করল। বাদশাহ চাইলেন ইসলামের অতিরিক্ত এমন একটি ধর্ম যার ছত্রছায়ায় সকলে এসে মিলিত হতে পারে। মুসলমানরা তাঁকেই ভেবে বসল ধর্মদ্বেষ এই নতুন মতবাদ সম্পর্কে বাদশাহের প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন শেখমুবারক। তিনি এবং তাঁর পুত্র আবুল ফজলের ইচ্ছা ছিল যে আকবরের পরে দানিয়াল শাহই বাদশাহ হোন। দীন ইলাহির বিরোধী সেলিম বাদশাহ হলে আকবরের আদর্শ লুপ্ত হবে এই ভয় তাঁদের ছিল। কিন্তু সেলিমের ন্যায় সঙ্গত অধিকারকে অস্বীকার করতে বাদশাহ এখন পর্যন্ত তৈরী ছিলেন না। সেই জন্য কিছুই স্থিরীকৃত হয়নি।

এখন বাদশাহ একটি বৃহৎ বাহিনীসহ যখন দাক্ষিণাত্যে রয়েছেন, সামরিক শক্তির ভিত্তিতে সেলিম তাঁর ভবিষ্যৎ নির্ধারণের উপযুক্ত সময় বলে মনে করলেন। রাজধানী দখলে এলে সিংহাসন অধিকারের দ্বারা নিজেকে বাদশাহ বলে ঘোষণার উচ্চাকাঙ্খাও তাঁর ছিল। কিন্তু শীখলের

প্রভু ভক্তি এবং চাতুরীর ফলে তা সম্ভব হলো না। ফলে লোকে ভাবল যে গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত হলো। বাদশাহের দূর-দৃষ্টি কিন্তু সেলিমের প্রচেষ্টার মর্ম অনুধাবন করল। খানখানাকে নিজের প্রতিনিধি হিসাবে নিয়োগ করে বাদশাহ একটি ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে যাত্রা করলেন। আগেকার মত স্থানে স্থানে বিরতি দিয়ে এবং খোঁজ খবর নিতে আসার বদলে তিনি সরাসরি আগ্রার দিকে অগ্রসর হলেন। ধারানগরের কাছে মাণ্ডুতে তিনি খবর পেলেন যে আগ্রা আক্রমণ না করেই সেলিম এলাহাবাদের দিকে চলে গেছেন। এলাহাবাদে অবস্থানকারীর অধীনেই যে সমগ্র গঙ্গাতটের প্রদেশগুলি থাকবে এটা তিনি জানতেন। এই সমস্ত চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে তিনি রাজধানীতে পৌঁছলেন। প্রজাদের আদর আপ্যায়ন লাভ করে রাজধানীতে আসার পর চার পাঁচ দিন তাঁর সেলিমকে আয়ত্বে আনার মত রাজনৈতিক কৌশলের কথা ভাবতে ভাবতেই কেটে গেল। অবশেষে অবাধ্য পুত্রকে আরও ক্রুদ্ধ না করার উদ্দেশ্যে তাঁকে তৎক্ষণাৎ বাংলার সুবেদার নিযুক্ত করে আদেশপত্র পাঠিয়ে দিলেন।

নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করে সেলিম এই আদেশের প্রত্যুত্তর দিলেন। এতেও যখন বাদশাহের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো না তখন তিনি নিজের নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা তাঁকে উপহার পাঠালেন। সেলিম যখন খোলাখুলিভাবে বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছেন তখন তাঁকে শাস্তি দেওয়াই যে বিধেয় এই উপদেশ দেওয়ার মত বহু লোকই ছিলেন। বাদশাহ কিন্তু কোন অবিবেচনার কাজ করতে রাজী হলেন না। তাঁর এই ভাবে শান্ত থাকার বহু কারণ অন্তঃপুরে ছিল যার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে বাদশাহের মাতা হামীমাবানু বেগমের প্রভাব। আকবর কোন কাজ, তা সে যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, তাঁর মাতার মতের বিরুদ্ধে করতেন না। সেলিম ছিলেন তাঁর খুবই আদরের এবং কোন অবস্থাতেই তিনি সেলিমের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাতে নিষেধ করেছিলেন। সেই জন্য বাদশাহ অন্য পন্থা খুঁজে বের করতে বাধ্য ছিলেন। সেলিম কোন প্রকারেই নত হচ্ছেন না দেখে বাদশাহ তাঁর বন্ধু আবুলফজলকে ডেকে

পাঠালেন। নিজের অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার ভার যে বন্ধুর উপর তিনি ন্যস্ত করে এসেছিলেন তাঁকেই আবার ডেকে পাঠানোয় লোকে আশ্চর্যান্বিত হলো। আবুল-ফজল যে প্রখ্যাত পণ্ডিত, কুশাগ্রবুদ্ধি এবং রাজনীতি নিপুণ ছিলেন সে কথা সকলেই জানত। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সর্বজনবিদিত ছিল যে সেলিমবিরোধী দলের তিনিই ছিলেন নায়ক। এইসব কারণে গুজব রটল যে বাদশাহের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে এবং আবুলফজলকে সেলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধে পাঠানো হবে। কিন্তু একথা কেউই জানত না যে আবুলফজলকে ডেকে আনার আদেশ যেদিন দেওয়া হলো ঠিক সেই দিনই বাদশাহের প্রিয় পাটরাণীদের অন্যতমা সেলিম বেগম গোপনে এলাহাবাদ যাত্রা করলেন।

আজ তিনমাস হলো বাদশাহ রাজধানীতে ফিরেছেন। কিন্তু নগর কেচের নির্জনতার অধিবাসী রাজা পৃথ্বী সিংহ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। রাজগুরু শেখ মুবারকের মৃত্যুতে শোকাচরণই সর্বত্র চলছিল। কোথাও কোন উৎসব আনন্দের প্রকাশ ছিলনা। প্রতিদিনের দরবার যখন দরকার মাত্র তখনই অনুষ্ঠিত হতো। খানখানা প্রভৃতি মিত্রবর্গের সঙ্গে প্রয়োজনমত দেখা সাক্ষাৎ চলছিল কিন্তু সাধারণের সঙ্গে সাক্ষাৎকার বন্ধ ছিল। বেশির ভাগ সময়ই বাদশাহ অন্তঃপুরে থাকতেন। জনসাধারণ এটাকে সেলিমের বিদ্রোহজাত বাদশাহের মনোভঙ্গ বলে ধরে নিল। কিন্তু তাঁর চেহারার মধ্যে দুঃখের কোন প্রকাশ ছিলনা।

পিতার ভীতি প্রদর্শন এবং শাসনকে সেলিম উপেক্ষা করলেন। এলাহাবাদকে রাজধানী করে বাদশাহের উপযুক্ত আড়ম্বরের সঙ্গে তিনি শাসন কার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। অধীনস্থ অঞ্চলগুলিতে আকবরের পরিবর্তে স্বঘোষিত নিজনাম 'জাহাঙ্গীর' প্রচলনের আদেশ তিনি জারি করে দিলেন। পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলিতে কর আদায়ের জন্য এবং সেগুলির প্রতিরক্ষা কার্যে সাহায্যের জন্য তিনি নিজস্ব কর্মচারী নিয়োগ করলেন। সমস্ত কিলাদারদের কাছে এই মর্মে ফরমান পাঠালেন যে ভবিষ্যতে বাদশাহ হিসাবে তাঁর আদেশই মাননীয়।

পূর্ব-প্রদেশ এবং সেখানকার কর্মচারীরা তাঁর সঙ্গে যোগ দিল।

এত সবের পরও বাদশাকে অবিচলিত দেখে সেলিম সেনাবাহিনীর সংগঠন কার্যে মনোনিবেশ করলেন। ঠিক এই সময়টিতেই তাঁর পিতামহীর কাছ থেকে সংবাদ নিয়ে সেলিমা বেগম এলাহাবাদে উপস্থিত হলেন। নিজের মায়ের মতই সেলিম তাঁকে ভালবাসতেন। তিনি তাঁর কথা মত সব কিছু করতে স্বীকৃত হলেন। পিতার যে তাঁর উপর বিন্দুমাত্র ক্রোধ নেই এবং তিনি যদি সামনাসামনি ক্ষমা প্রার্থনা করেন তবে স্নেহশীল ও দয়ালু বাদশাহ তা মেনে নেবেন একথা তাঁর মুখে শুনে সেলিম খুব আনন্দিত হলেন। প্রকৃত পক্ষে আমার অধিকারকে ধূলিস্যাৎ করে বাদশাহ দানিয়ালকেই উত্তরাধিকার করবেন, এই একটি মাত্র ধারণাই সেলিমের বিদ্রোহের কারণ। আবার তিনি চিন্তা করলেন যে তাঁর অবিবেচনা প্রসূত কাজের ফলে প্রবল প্রতাপান্বিত বাদশাহ অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং ক্ষমা প্রার্থনা সত্ত্বেও তার জন্য প্রাপ্য কঠোর দণ্ড তাঁকে ভোগ করতেই হবে। সুতরাং বাঁচার একমাত্র রাস্তা হচ্ছে দূরে থাকা। এই চিন্তার পরিণাম স্বরূপ তিনি স্থায়ীভাবে এলাহাবাদে থাকারই সিদ্ধান্ত করলেন। পিতার ক্রোধ যে বেশি নয় সে কথা জেনে তিনি কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করলেন। তবুও তাঁর আত্ম-শ্লাঘতে মাথা তুলে ছিল। গোড়াতেই সব কিছু মেনে নেওয়া ঠিক হবেনা ভেবে এবং নিজের পক্ষভুক্ত সৈন্য ও লোকজনের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বেগমের পরামর্শক্রমে তিনি বাদশাহের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠালেন। তাতে তিনি লিখলেন :

'সর্বলোকাশ্রয়, দেবোপম সার্বভৌম বাদশাহ সালামতের কাছে নিবেদন এই যে অজ্ঞতা ও অবিবেচনার কারণে পুত্র যে দুর্বিনীতভাব প্রকাশ করেছে তার জন্য সে ক্ষমাপ্রার্থী। ভবিষ্যতে পিতার আদেশানুসারে সাম্রাজ্যের নিয়মানুবর্তী হয়ে চলার প্রতিজ্ঞা সে করছে।' এই রকম নম্রতার সঙ্গে যে পত্রের সূচনা তার সুর ক্রমে পরিবর্তিত হতে থাকলো। সেলিমের সঙ্গে অনেক ওমরাহ এবং রাজা-মহারাজা ছিলেন। যথাযোগ্য স্থান ও পদমর্যাদা তাঁদের দেওয়া হয়েছিল। সেগুলিকে স্থায়িত্বের মর্যাদা দেবার প্রার্থনা তিনি করলেন। রাজ ক্ষমতায়

হস্তক্ষেপের দ্বারা যা কিছু করা হয়েছিল কঠোর অনুশাসনপ্রিয় তাঁর পিতা যে কোন মতেই সেগুলি মেনে নেবেন না একথা তিনি জানতেন। আর এই প্রার্থনা ন্যায় সঙ্গতও নয়। কিন্তু বেশ ভেবে চিন্তেই সেলিম প্রার্থনার ক্ষেত্রে মাত্রার এই আধিক্য দেখালেন। তাঁর ধারণা ছিল যে শূণ্যে শর নিক্ষেপ করলে তা অন্ততঃ বৃক্ষচূড়াকেও বিদ্ধ করবে। তাঁর সহযোগীদের বাদশাহ যেন দণ্ডিত না করেন এটা প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাম্য ছিল। তিনি এতেই ক্ষান্ত হলেন না। চাইছি যখন, সবকিছু চাইতেই বা দোষ কি? অতএব, সাজসরঞ্জামের অভাবের কথা জানিয়ে লিখলেন, আগ্রা পৌঁছে পিতার চরণ স্পর্শ করে ধন্য হওয়ার জন্য রাহা খরচ প্রভৃতি বাবদ পঞ্চাশ লক্ষ মুদ্রা তাঁকে পাঠানো হোক। শাবাস খাঁর পাঁচকোটি টাকা হস্তগত করার কথা বাদশাহ জানতেন এবং তিনি তার হিসাব চাইবেন বলে সেলিমের ভয় ছিল। এই জবাবদিহির হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই টাকার প্রার্থনা জানানো হলো। দুষ্টামির শেষ এখানেই নয়। শেষকালে তিনি লিখলেন যে দানিয়াল এবং তাঁর মধ্যে শত্রুতা আছে, সুতরাং সে থাকতেই যদি তিনি যান তাহলে বহু রকমের বিবাদ এবং যুদ্ধে আশঙ্কা থেকে যাবে। সে কারণে ঐ শাহজাদাকে দাক্ষিণাত্যে আবুল ফজলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়াই ঠিক হবে। খুব বিনয়পূর্ণ ভাষায়, অনেক ক্ষমা প্রার্থনার পর এই কথাগুলি লেখা হলো।

পত্রপাঠে বাদশাহের ক্রোধের সীমা রইল না। ধৈর্যশীল হওয়া সত্বেও ভারত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধীশ্বর হওয়ায় কারো রূঢ় কথাকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। পত্রের প্রতিটি শব্দ তাঁর পৌরুষে আঘাত হানছে বলে তাঁর মনে হলো। সাথীদের সম্মান দেওয়ার এবং রাহা খরচ চাওয়ার কথা অন্যায় হলেও অসহ্য নয়। কিন্তু দানিয়ালকে দূরে পাঠিয়ে দেওয়ার কথাটা যেন প্রার্থনা নয়, আদেশ বলে তাঁর মনে হলো। আগেকার সব কথাগুলিই সমমর্যাদাসম্পন্ন ছুটো রাজার সন্ধিপত্রের শর্তের মত। কিন্তু শেষের কথাটা তাঁর কাছে পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর বিজয়ী রাজার নির্দেশের মত হলো। সানুচর সেলিমকে

পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়ার মত দাবানল তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত হলো। তৎক্ষণাৎ তিনি আগ্রার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে আদেশ দিলেন। ধৃষ্ট সন্তানকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন।

কিন্তু মহারাজাধিরাজদের সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাও মাতৃস্নেহের সামনে অকার্যকরী হয়ে পড়ে। নিজের সিদ্ধান্তের কথা অন্তঃপুরে জানিয়ে দেওয়ার জন্য তিনি সেখানে গেলেন। তাঁর দৃষ্টি এবং মুখের ভাব দেখে অন্তঃপুরের পরিচারিকা ও হিজড়ার দল পালিয়ে গেল।

আকবরের অন্তঃপুর ছিল একটি ছোটখাটো শহর বিশেষ। তাঁর পত্নী হিসাবে বিভিন্ন দেশ থেকে পাঁচ-হাজার রমনীর প্রাসাদ সমূহ, উদ্যান, ক্রীড়াস্থল প্রভৃতি রাজোচিত ঐশ্বর্য এবং শিল্পচাতুর্যের নিদর্শন-স্বরূপ ছিল। পাটরাণীদের রত্নগ্রথিত মহল ছিল একপ্রান্তে। অন্যান্য রাণীদের আবাসস্থান ছিল মঙ্গল-মহল এবং জুম্মামহল নামক দুটি বিশাল ভবন। মঙ্গল ও বুধবারে বাদশাহ এই দুটি মহলে যেতেন বলে তাদের এই নাম। এতদ্‌ব্যতীত, আর্মেনিয়া, চীন, জর্জিয়া এবং ইউরোপীয় দেশ সমূহ থেকে আনীত স্ত্রীলোকদের বাসস্থানের নাম ছিল বাঙ্‌লা মহল।

প্রধানা মহিষী যোধাবাঈ এর সঙ্গে দেখা করার জন্য বাদশাহ এ সময় অন্তঃপুরে এসেছিলেন। অম্বরের রাজকন্যা এই ক্ষত্রিয় রাণীই ছিলেন সেলিমের গর্ভধারিণী। আকবরের অন্তঃপুরেও ইনি স্বধর্ম আচরণ করতেন। বহুরাণী থাকা সত্ত্বেও আকবর এঁকেই নিজ বংশধারার ধাত্রী বলে মনে করতেন। পুত্রের বিষাক্ত পত্র পাঠ করে শুনিয়ে তাকে দণ্ডদানের সম্মতি তাঁর কাছ থেকে নেওয়ার জন্যই এ সময় তিনি এসেছেন। ভারত সাম্রাজ্ঞী যোধাবাঈ সেই সময় এক রাজ ঘরণীর সঙ্গে দাবা খেলায় মগ্ন ছিলেন। দাসীবৃন্দ এবং অপরাপর রমণীরা বহুমূল্য রত্নলঙ্কারে ভূষিতা হলেও তাঁর গলদেশে একগাছি মুক্তামালা এবং বাহুতে কাঞ্চন ভিন্ন আর কিছুই ছিল না। অপ্সরার মত সুন্দরী একটি কন্যা পিছনে দাঁড়িয়ে চামর ব্যজন করছিল। তাঁর প্রতি অন্যান্য রমণীদের প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার এবং তাঁর মুখমণ্ডলে প্রতিভাত সাত্বিক তেজোপুঞ্জই ঘোষণা করছে যে ইনিই ভারত সাম্রাজ্ঞী।

যোধাবাঈ-এর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ। তবু যৌবনের স্বর্গীয় সৌন্দর্য তাঁর দেহে পূর্ণরূপে প্রকাশমান। বাদশাহের সমাদরে এবং ভালবাসায় তিনি তাঁর জাতি-কুল ত্যাগ করে মুসলমান বাদশাহের অন্তঃপুরে বাস করার দুঃখকে প্রায় ভুলে গেছেন। নানাবিধ ব্রত উপবাস পালনের মধ্যে দিয়ে যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে রজোগুণ ও সাত্ত্বিক তার অধিকার অর্পণ করেছে।

দাসীরা বাদশাহ সালামতের আগমণবার্তা দিতেই যোধাবাঈ উঠে দাঁড়ালেন। অন্যান্য রমণীরা দূরে সরে গেল। দাবা খেলার সঙ্গিনী অপর মহিষীটি বাদশাহকে দর্শনের এই সুযোগের লোভে বললেন, 'দেবী, আমার তো এখন এখান থেকে যাওয়া উচিত, কিন্তু আমার একটি প্রার্থনা আছে—দূরে দাঁড়িয়ে হলেও বাদশাহকে দর্শনের অনুমতি দিন! আপনার দাক্ষিণ্য ছাড়া আমাদের সকলের আর কী আছে?'

সস্নেহে তাঁর দুটি হাত ধরে যোধাবাঈ বললেন, 'বোন! তোমাকে যেতে কে বলেছে? আমার সঙ্গে থেকেই ওঁকে দেখো।'

সম্রাটকে আসতে দেখে যোধাবাঈ বিনয় নম্রতার সঙ্গে করজোড়ে অভিবাদন জানাতে জানাতে তাঁর কাছে গেলেন। কাজের গুরুত্ব অনুসারে যে মুখমণ্ডল এতক্ষণ গাম্ভীর্যের আচরণে আবৃত ছিল, পাটরাণীর দিঘল নয়ন হতে বিচ্ছুরিত প্রেম-রশ্মি স্পর্শে তা মন্দ হাসিতে বিকশিত হলো। যা বলতে এলেন এই সাধ্বী-স্ত্রীরত্নের কাছে কিভাবে তা প্রকাশ করবেন বিজ্ঞ কূটনীতিবিদ জালালুদ্দীন আকবর ভেবে স্থির করতে পারলেন না। আনুষ্ঠানিকতা সাঙ্গ হলে দুজনে বসলেন। অদূরেই দণ্ডায়মান নিজের প্রাণেশ্বর মুগ্ধদৃষ্টিদর্শক সেই রাজপত্নীকে যোধাবাঈ ভোলেননি। বাদশাহকে তিনি নিম্নস্বরে প্রশ্ন করলেন, 'এই মেয়েটিকে আপনি এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন?' আকবর তার দিকে চাইলেন। যুবতীর দেহ রোমাঞ্চিত হলো। তিনি যেন কোন স্বর্গীয় সুখানুভূতিতে মুহ্যমান। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে বাদশাহের পাঁচ হাজার পত্নী তিনি তাঁকে মনে রাখবেন কী ভাবে!

বাদশাহ বললেন, 'এ কে? নতুন কোন দাসী?'

যোধাবাঈ উত্তর দিলেন, 'বা! বেশ। রাজাদের প্রেম বড়ই বিচিত্র বস্তু! কাশ্মীর থেকে আগতা রাজমহিষীদের মধ্যে ইনি একজন। নাম জোহরা। এ-ও ভুলে গেলেন?'

'সত্য কথা বলব? আমার মনে নেই।' বলতে বলতে বাদশাহ তার দিকে ভাল করে দেখে নিয়ে আবার বললেন, 'আগে কোনদিন দেখেছি বলেও মনে হচ্ছে না।'

'এইবার আমার কপালেও এই রকমই হবে! মেয়েটি বড় ভাল। একে আমি বড্ড ভালবাসি।'

'তাহলে ডাকো। দেবীর সখিদের অপমান করতে পারি না।'

যোধাবাঈ সঙ্কেতে আহ্বান জানাতেই মেয়েটি এসে পাদস্পর্শ করে বাদশাহকে অভিবাদন করল। বাদশাহ প্রসন্নভাবে হাস্যমুখে বললেন, 'অন্যদের তুলনায় তুমি ভাগ্যবতী। দেবী নিজেই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। রাজাদের প্রেমের উপর নির্ভর করা যায় না কিন্তু দেবী প্রসন্ন হলে তোমার কোন ভয় নেই।' এরপর বিদায়ের নির্দেশ সূচিত করে নিজের গলদেশ হতে একটি রত্নহার তাকে উপহার দিলেন।

জোহরা চলে যেতেই যোধাবাঈ হাসতে হাসতে বললেন, 'আমার সখী হিসাবে ওকে একটা মালা দিলেন, আমাকেও কিছু পুরস্কার তো দিতে হয়।'

আকবর জোরে হেসে উঠলেন। 'দেবীকে আমি দেবো পুরস্কার? এই সাম্রাজ্যই তো তোমার। আচ্ছা, আমি এখন এসেছি একটা জরুরী কথা বলতে। কিন্তু বুঝতে পারছি না তোমাকে কি করে বলি?'

'আমাকে বলার অসুবিধা কোথায়? এমন কি কথা আছে যা আপনি আমায় বলতে পারেন না?'

সেলিমের কথা। তার ধৃষ্টতা অসহ্য হয়ে উঠেছে। সব ক্ষেত্রে আমার বিরোধীতা করো, আমি সহ্য করি। কিন্তু এখন সে বড্ড বেড়ে উঠেছে। দেখো কি লিখেছে!

'আমি কেন পড়ব? সে আপনার ছেলে। হয় বাঁচান নয়তো শাস্তি দিন। আমি জানি আপনি অন্যায় করবেন না।'

'আমি অনেক সহ্য করেছি। অনেকবার ক্ষমা করেছি। আর চুপ করে থাকলে কাজ হবে না। সেইজন্য সরাসরি যুদ্ধ করে তাকে দমিয়ে দিতে চাই।'

যোধাবাঈ এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। ভৃত্যদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে গেল। বিনা অনুমতিতে বাদশাহের সামনে কে আসছে দেখার জন্য অগ্রসর হতে যোধাবাঈ বাদশাহের সম্মানিতা মাতাকে সামনে পেলেন! 'মা!' বলেই তিনি থেমে গেলেন। আকবরও তাড়াতাড়ি এসে মাথা নত করলেন।

হুমায়ুন যখন রাজ্যভ্রষ্ট হলেন আকবর তখন ছিলেন মাতৃগর্ভে। রাজ্য থেকে পলাতক অবস্থায় মরুভূমির মাঝে সে কষ্টের কথা অবর্ণনীয়। সেই যাত্রাপথেই অমরকোটের যুদ্ধের সময় আকবরের জন্ম হয়েছিল। কয়েক দিনের মধ্যেই আবার যাত্রা শুরু করতে হলো। কত যন্ত্রণা সহ্য করার পরই না সামনের এই সৌভাগ্যবতী আবার সাম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। শৈশবেই আকবর পিতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁকে লালন পালন করা এবং শিক্ষা দেওয়ার ভার মায়ের উপরই ছিল। সেই আকবরই আজ ভারত সম্রাট। কাবুল থেকে বঙ্গদেশ এবং হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত তাঁর অধিকার ভুক্ত। তবুও মায়ের কাছে তিনি সেই অবোধ বালকই রয়ে গেছেন। অমর কোটে জন্মলাভকারী সেই কোমল শিশুটিই যে আজ ভারতের রাজাধিরাজ হয়েছেন স্নেহময়ী মা যেন কোন দিনই তা অনুভব করেননি। পুত্রের পারিবারিক কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে এবং পুত্রকে সঠিক পথে চালানোর জন্য তিরস্কার করার ব্যাপারে তাঁর অধিকার পূর্ববৎ অক্ষুন্নই রয়ে গেছে।

আকবরের হৃদয়েও মাতার প্রতি অসীম ভক্তি ছিল। পারিবারিক ব্যাপারে তাঁর পরামর্শ ব্যতীত তিনি একপদ ও অগ্রসর হতেন না। সার্বভৌম এবং দেবেন্দ্রতুল্য পরাক্রান্ত আকবর মায়ের সম্মুখে শান্ত সন্তান। তবু সেখানে মায়ের আগমন তাঁর ভাল লাগল না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আম্মাজান! এখানে তুমি এলে কেন?'

'চার পাঁচ দিন যোধাবাঈ এর সঙ্গে দেখা হয়নি সেইজন্য তাকে

দেখতে এলাম। আর শুনেছিলাম এলাহাবাদ থেকে লোক এসেছে। তাই সেলিমের খবর জানার ইচ্ছা ছিল।'

আকবর এবং যোধাবাঈয়ের মুখ ম্লান হয়ে এলো। তা দেখে মা প্রশ্ন করলেন, 'কেন? বাছার কি হয়েছে? তাড়াতাড়ি বলো। এক্ষুণি বলো!'

আকবর বললেন, 'তেমন কিছু নয়। সে ধৃষ্টতাপূর্ণ চিঠি লিখেছে।'

মা ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কি? ধৃষ্টতা?' দানিয়ালের জন্য তুমি আমার বাছাকে রাজধানীতে আসতে দাও না! তাকে কোথায় না পাঠিয়েছ! আগে আজমীরে, এখন এলাহাবাদে! দাসীর ব্যাটা দানিয়াল! আসুক একবার আমার সামনে! সিংহাসনে বসাবো! ও যত দিন শহরে আছে ততদিন বিবাদ হতেই থাকবে। মেয়েদের মত পোশাক পরে এখানে ওখানে ঢং করে ঘুরে বেড়ায় কেন? সে যদি হুমায়ুন বাদশাহের নাতি হয়ে থাকে তাহলে যুদ্ধ করে নিজের ক্ষমতা দেখাক না কেন!'

যোধাবাঈ বললেন, 'আমার কাছে সেলিম আর দানিয়াল একই। যা ইচ্ছা করুন। একজনকে বনে পাঠিয়ে অন্যের জন্য রাজত্ব চাইনা।'

রাণীর কথাটা মোটেই ভাল ঠেকল না। তিনি জোরে বললেন, 'আমি ভাল করে জানি এই হিন্দু মেয়েদের সাহস থাকে না। পতিতো এঁদের দেবতা, না? যা বলবে তাই শুনবে! এটা যেদিন থেকে মেয়েরা স্বীকার করে নিয়েছে সেই দিন থেকেই হিন্দুদের ধ্বংসও শুরু হয়েছে।'

তারপর তিনি আকবরের দিকে ফিরে বললেন, 'জালালুদ্দীন! শুনছ! তুমি যদি সেলিমের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাও আমিও তাহলে এলাহাবাদে যাচ্ছি!'

'কি জন্যে মা?'

'তোমার বিরুদ্ধে লড়ার জন্যে। বাবা যদি ছেলের বিরুদ্ধে লড়ে, মাও তা হলে ছেলের সঙ্গে লড়তে পারে।'

আকবর উত্তর দিলেন, 'আপনার কথা আমি কবে শুনিনি?

আপনি যদি বলেন যে তার সব কথা ভুলে যাও এবং তাকে ক্ষমা করো তা হলে তার জন্যও আমি প্রস্তুত।'

শান্তভাবে এই উত্তর দেওয়ার পর নিজের মত বদলে তিনি নিজেই অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আবুলফজল আসুক।'

মায়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাদশাহ রওনা হলেন। দরজা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে আগতা যোধাবাঈকে তিনি বললেন, 'আব্বাজানের সামনে মা আমার ভিজে বেড়ালটির মত থাকতেন, বুঝলে? সেলিম বাদশাহ হলে তোমার প্রতাপও এই রকমই হবে।'

যোধাবাঈ তখন একথার কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু রাজমাতার কাছে ফিরে নিজপুত্রের হয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। সস্নেহে রাণীর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বৃদ্ধা বললেন, 'জালালুদ্দীন রাগী হলেও ভাল ছেলে। মাকে বড্ড ভাল বাসে। ওর প্রতি তোমার শ্রদ্ধা দেখে আমি খুবই খুশী হই। তোমার মধ্যে একটি মাত্র দোষ আছে, তোমার শক্তি নেই।'

যোধাবাঈ বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন কিন্তু বাদশাহ সালামত বলেছেন, স্বর্গীয় বাদশাহের সামনে আপনি এই ভাবেই থাকতেন।'

'হ্যাঁ, বাছা, সময় এলে তুমিও আমার মতই কথা বলবে।' জোহরা এই সমস্ত কথাবার্তার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। এই বার সে এগিয়ে এসে রাজমাতা ও রাণীর পাদস্পর্শ করল।

রাজমাতা বললেন, 'এটি কে? রাজমহিষীদের গোপনে কথা বলার জায়গায় এ এলো কি করে?'

যোধাবাঈ উত্তর দিলেন, 'রাজ ঘরনীদের মধ্যে এও একজন। আমার খুব প্রিয়। বিদায় নিতে এসেছে বোধ হয়।'

জোহরা বলল, 'দেবী প্রসন্ন হোন। আমার একটি প্রার্থনা আছে। সেবার জন্য আমাকে আপনার কাছে থাকার অনুমতি দিন।'

যোধাবাঈ বললেন, 'তাতো নিয়ম নয় বোন। পাটরাণীদের মহলে এসে থাকতে হলে রাজমহিষীদের বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন হয়।'

'সে অনুমতি তো স্বয়ং বাদশাহ সালামত দিয়েই দিলেন। আপনার

আশ্রয়ে থাকার অনুমোদন দিলেন।'

মা বললেন, 'ওর যদি তাই ইচ্ছা হয় তা হলে তুমি অহেতুক নিষেধ করছ কেন যোধাবাঈ ?'

যোধাবাই বললেন, 'আমার তাতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু বাদশাহের আদেশ।

মা বললেন, আদেশ তো পাওয়া গেছে। আর তা না হলে আমি আদেশ করছি। মেয়েটি খুব ভাল মনে হচ্ছে। তুমি একে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাও।

কিছুক্ষণ ধরে তিনজন বসে বসে বার্তালাপ করলেন। তারপর রাজমাতা নিজের মহলে ফিরে গেলেন। বাদশাহের দাক্ষিণ্যে খুশী হয়ে যোধাবাঈ জোহরাকে সঙ্গে নিয়ে স্বস্থানে ফিরে এলেন।

মহারাজ পৃথ্বীসিংহ যেদিন থেকে নগরকেচ রাজপ্রাসাদে বাদশাহের অতিথি হিসেবে থাকতে শুরু করলেন, সেই দিন থেকেই দলপতি সিংহ একটা কাজ নিয়ে নিজের বাড়িতেই ছিলেন। তিনি অনুমান করেছিলেন যে আকবর ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই পীথল মুক্ত হবেন। কিন্তু তাঁর আসার পর প্রায় তিন মাস অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যখন তিনি ছাড়া পেলেন না তখন দলপতি সিংহ দুঃখিত ও আশ্চর্যান্বিত হলেন। বড়বড় রাজকার্যে লিপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যে এই রকমই ঘটে থাকে সে সম্বন্ধে তিনি অজ্ঞ ছিলেন। এখন তাঁর মনে হতে লাগল যে রাজভক্তির মত অস্থায়ী আর কিছু জগতে নেই। তবুও নীতিনিষ্ঠা এবং মহানুভবতার জন্য খ্যাতিমান আকবর কেন যে তাঁর অনুগত ও বিশ্বস্ত সামন্তটিকে এতদিন বিনা বিচারে আটক রেখেছেন তা তাঁর বোধগম্য হলো না।

অতি সতর্কতার সঙ্গে অনুসন্ধান করেও রাজধানীর কোন কাজেরই কোন হদিশ তিনি পেতেন না। নিজের সব বন্ধুর কাছেই তিনি গেলেন, শেঠজীকে জিজ্ঞাসা করলেন, বুঁদির মহারাজা ভোজ সিংহকে বার কয়েক প্রশ্ন করলেন কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি কেবল এইটুকু বুঝলেন যে এসব এক গোপন রাজনৈতিক কৌশল। এই উদ্বিগ্ন অবস্থার

মধ্যে খানখানার কথা তাঁর মনে পড়ল। কিছু জানা যেতে পারে এই আশায় তিনি একদিন তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দেখা মাত্র খানখানা তাঁকে চিনলেন এবং কাছে ডেকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন নিজের প্রভুর সংবাদ তিনি নিতে এসেছেন একথা জেনে খানখানা আনন্দের সঙ্গে উত্তর দিলেন, 'দুদিন আগে আমি পীথলের ওখানে গিয়েছিলাম। তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। তোমাকে বলতে পারি, আমি বার্তাবহ হয়েই গিয়েছিলাম। পীথলের প্রতি তাঁর কোন ক্রোধ বা অবিশ্বাস নেই।' দলপতি সিংহ আশ্চর্য হলেন। বাদশাহ রুষ্ট যদি না হন তবে তাঁকে এভাবে বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন? বাদশাহের পরামর্শদাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছে, তাঁর খবরও আনছে, এসব বিচিত্র ব্যাপার? তাঁর চিন্তার গতিধারার হদিশ পেয়ে খানখানা বললেন, 'সাম্রাজ্যের পরিচালকদের উদ্দেশ্য এত সহজে অনুধাবন করতে পারবে না কুমার! তুমিও একজন রাজার উত্তরাধিকারী। সেই দায়িত্ব যখন তোমার উপর ন্যস্ত হবে তখন তোমার আচরণের উদ্দেশ্যও লোকের বোধগম্য হবে না। তাই শান্ত থাকো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তোমার সম্বন্ধে শেঠ কল্যাণমল আমায় অনেক কথা বলেছেন।'

দলপতি সিংহ আনন্দিত মনে বিদায় নিলেন। শেঠজী তাঁর বিষয়ে খানখানার সঙ্গে কথা বলেছেন শুনে তিনি বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন, 'এই জহুরী কোথায় কোথায় কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। যাইহোক, আজকের আলোচনার খবর শেঠজীকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে তিনি সরাসরি তাঁর বাড়িতেই গেলেন। ভোজনাদি সেরে কল্যাণমল নিজস্ব কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। দলপতি সিংহকে দেখে আনন্দের সঙ্গে তিনি বললেন, 'দলপতি সিংহ, তুমি বড় সময়মত এসেছ। তোমাকে ডেকে আনার জন্য এখনই লোক পাঠাবো ভাবছিলাম।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আজ সকালে প্রভুর বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য আমি খানখানার বাড়িতে গিয়েছিলাম।'

'তিনি কি বললেন?'

'তিনি বললেন যে, মহারাজা বেশ ভাল আছেন এবং শীঘ্রই সব

ঠিক হয়ে যাবে।'

'পীথলের সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। তাঁর সম্বন্ধে বাদশাহ কখনও সন্দেহ করেননি। সে সমস্ত তুমি ভুলে যাও। তোমার সঙ্গে একটা খুব জরুরী প্রয়োজন আছে। এখন কিছু করছ না তো?'

'এখন আমি নিষ্কর্মা। বসে বসে আমি বিরক্ত হয়ে গেছি। যতদিন মহারাজ না আসছেন, আপনার অধীনে আছি।'

'তা হলে আমার সঙ্গে এসো। আমাদের এক জায়গায় যেতে হবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাঁরা পদব্রজেই চলতে লাগলেন। অনেক সঙ্কীর্ণ পথ পার হয়ে তাঁরা শহর প্রান্তের একটি গলিতে এসে পড়লেন। সে স্থানটিতে কাঁচের চুড়ি তৈরী হতো। গলির দু ধারে ছিল মেটে ঘরের সারি। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল ভারতরমনীদের সৌভাগ্যের প্রতীক যত চুড়ি সব এই কুটীরগুলিতে তৈরী হতো। প্রতিটি কুটীরের সামনে বিচিত্র বর্ণের ও বিভিন্ন মাপের চুড়ি টাঙ্গানো ছিল। মনে হচ্ছিল চারিদিকে যেন ইন্দ্রধনুচ্ছটার সমারোহ। কাঁচগলিয়ে সুতোর মত লম্বা করে তাকে চক্রের আকৃতি দেওয়ার বিদ্যায় আগ্রার মত পারদর্শী বিশ্বে আর কেউ ছিলনা। নানা দেশের লোক এসে এই শিল্প শিখে যেতো। নোংরা এবং কুৎসিৎ দর্শন কুটীরগুলিতে এই কাজ চলত। এখানকার বাসিন্দারা কিন্তু অর্থবান ছিল। প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিস বিদেশে পাঠাতো এমন ব্যবসাদারও এখানে বাস করত। মেয়েদের নিত্যব্যবহার্য এই বস্তুগুলির বিক্রেতা নানা দেশের ব্যবসায়ীদের এখনো যাতায়াত ছিল।

দরিদ্রনারায়ণের আবাসস্থল সদৃশ এই গলিপথে প্রবেশ করেই দলপতি সিংহের মনে নানা সন্দেহ উঁকিঝুঁকি মারতে আরম্ভ করল। বড়বড় রাজামহারাজার বন্ধু শেঠ কল্যাণমল পদব্রজে এই দরিদ্রদের পাড়ায় কেন এলেন? এই প্রশ্ন তাঁর মনে এলো। কাঁচের চুড়িওয়ালাদের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ এই জহুরীর কী প্রয়োজন থাকতে পারে? প্রাণ ভয়ে দৌড়ানোর মতই প্রায় ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শেঠজী চলছিলেন। পথচলার মাঝে তাঁরা কোন বার্তালাপ করার অবসর পেলেন না। গভীর চিন্তার

বাহনে চড়ে শেঠজী কোন এক দূর দেশে চলে গেছেন বলে দলপতি সিংহের মনে হলো। কিন্তু শেঠজীর বুদ্ধি বিবেচনার উপর তাঁর আস্থা এমনই সুদৃঢ় ছিল যে তিনি নিজের আশঙ্কাকে সম্পূর্ণ চেপে রেখে বিনা প্রশ্নে তাঁর অনুসরণ করে চললেন।

গলির গায়েই ছিল ছোট্ট একটি কালী মন্দির। মন্দির পার্শ্ববর্তী বাড়িটি অন্যান্য গৃহগুলির তুলনায় বেশি সজ্জিত ছিল। কোন ধনী ব্যবসায়ীর বাড়ি বলেই সেটিকে মনে হচ্ছিল। বাড়িটি মৃন্ময় হলেও তার প্রস্তর সোপান এবং জানালা প্রভৃতি এই কথাই ঘোষণা করছিল যে এর বাসিন্দা বেশ মাতব্বর ধরনের ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে বাড়িটি ছিল চুড়িওয়ালাদের চৌধুরীর। অর্থ নৈতিক নিয়মানুসারে পাইকারী মূল্য নির্ণয়। ব্যবসায়ের নিয়ন্ত্রণ, ঐ সম্প্রদায়ের নিজেদের মধ্যকার বিপদের মীমাংসা, তাদের অভিযোগগুলি কর্তৃপক্ষের গোচরী ভূত করা, এই সব ছিল চৌধুরীদের কাজ। সেকালে বাণিজ্যের প্রতিটি শাখায় এই ধরণের চৌধুরী নিয়োগ করা হতো। ফলে বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আজকের মত কঠিন ব্যাপার ছিল না।

চৌধুরীর গৃহদ্বারে পৌঁছেই শেঠজী দলপতি সিংহকে বললেন, 'আমরা খুব গোপনীয় একটি কর্তব্য করতে যাচ্ছি। তোমার উপর আস্থা আছে বলেই তোমাকে এখানে এনেছি। এই বাড়িতে যে কাজ হচ্ছে তার খবর অন্যে যেন না পায়।'

দলপতি সিংহ সম্মতি জানালেন।

'শেঠজী দরজায় তিনবার আঘাত করলেন। একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তি এসে দরজা উন্মুক্ত করলো। তাঁরা ভিতরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভৃত্যটি দরজা বন্ধ করে লোহার একটি খিল লাগিয়ে তালাবন্ধ করে দিল। পরিচ্ছন্ন ভাবে গোময়লিপ্ত একটি কক্ষে লোকটি তাঁদের পৌঁছে দিতেই অপর একজন ভৃত্য এসে জানালো যে চৌধুরী সাহেব ভিতরে আছেন এবং আসা মাত্র আপনাদের নিয়ে যাওয়ার আদেশ দিয়ে রেখেছেন।'

'একলা আছেন, না আর কেউ আছেন?'

'এই মাত্র কয়েকজন এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন।'

শেঠজী এবং দলপতি সিংহ ভৃত্যটিকে অনুসরণ করে একটি বৃহত্তর কক্ষে এসে হাজির হলেন। সাধারণ ধনী ব্যক্তিদের গৃহের মতই সেটি সুসজ্জিত ছিল। দলপতি সিংহের বিস্ময় বর্ধিত হলো। মেঝেতে বিছানো গালিচা, উপরে লাগানো চাঁদোয়া প্রভৃতি সজ্জার উপকরণগুলি দেখে গৃহস্বামীকে পদাধিকারী নাগরিক বলেই মনে হলো। রেশমী গদীতে জরির কাজ করা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে এক ব্যক্তি প্রায় চল্লিশ বছর বয়স্ক অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে আলাপরত ছিলেন। শেঠজীকে দেখে দুজনেই উঠে দাঁড়ালেন। তাঁদের মধ্যে একজনকে দেখে দলপতি সিংহ চমকিত হলেন। ভাবলেন--স্বপ্ন দেখছি না তো? চোখ রগড়ে আবার দেখলেন। কারণ, গৃহস্বামীর পাশে উপবিষ্ট আলোচনারত ব্যক্তি ছিলেন বুঁদিত মহারাজা ভোজ সিংহ! উচ্চতম পদাধিকারী ব্যক্তিদের গৃহেও যিনি কচিৎ কদাচিৎ পদার্পণ করে থাকেন সেই রাজ শ্রেষ্ঠ সামান্য চুড়ি ওয়ালার বাড়িতে এলেন কি ভাবে? রাজধানীর সমস্ত ষড়যন্ত্র এবং দলাদলি থেকে তিনি বহু দূরে অবস্থান করতেন বলেই সুপ্রচারিত জনমত ছিল। এবং রাজধানীতে থাকতেনও খুব কম। বাদশাহের আগ্রহে বছরে তিন চার বার আগ্রায় আসতেন। তবে সেবা ও রাজভক্তির জন্য তিনি রাজধানীতে আসায় অভ্যস্ত ছিলেন না। আকবর ভোজ সিংহকে অত্যন্ত সম্মান করতেন। যে প্রস্তাব তিনি বাদশাহের কাছে নিয়ে যেতেন বাদশাহ নির্বিচারে তাতে সম্মতি দিয়ে দিতেন। একথা দলপতি সিংহ শেঠজীর কাছে শুনেছিলেন। এতবড় প্রতাপশালী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি মহারাজা ভোজ সিংহ স্বয়ং একজন নগণ্য চুড়িওয়ালার সঙ্গে বসে কথা বলছেন আর রত্নব্যবসায়ীদের অগ্রগণ্য শেঠ কল্যাণমলও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সারা পথ পদ পরিক্রমা করে এখানে হাজির হলেন, রাজনীতির গূঢ় ব্যাপারের সঙ্গে অপরিচিত দলপতি সিংহের কাছে এ সমস্তই বিচিত্র মনে হলো। কিন্তু ভোজ সিংহ এবং কল্যাণমলের প্রতি তাঁর ভক্তি ও ভালবাসা তাঁকে ধৈর্য ধারণের শক্তি যোগালো।

ভোজ সিংহ এবং চৌধুরী অভ্যাগতদের যথাবিধি স্বাগত সম্ভাষণ

জানালেন। রাজা ভোজ কথা পাড়লেন। তিনি দলপতি সিংহকে বললেন, 'দলপতি, আমাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শে তোমাকেও যুক্ত করার প্রয়োজন হয়েছে। আ'মাদের উভয়ের বন্ধু এই মহানুভবের সুপারিশ ক্রমেই এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। সুতরা' আমরা' যে তোমার উপর পূর্ণ আস্থা রাখি সেকথার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন 'প্রভু ফিরে না আসা পর্যন্ত আপনাদের আজ্ঞানুবর্তী থাকাই আমার অভিপ্রেত। আপনারা, গুরুজনেরও যে সেই সিদ্ধান্তই করেছেন তাতে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

শেঠজী বললেন, 'সীথলও আমাদের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং আমাদের আদেশকে ত'াঁরই আদেশ মনে করো।'

'আমায় কি করতে হবে?'

রাজা ভোজ বললেন 'সংক্ষেপে কথা হচ্ছে এই, সেলিম শাহ যে বাদশাহের সঙ্গে বিবাদ করে এলাহাবাদে আছেন এবং সৈন্য সংগঠিত করছেন, একথা তুমি জান। আমাদের সবার পক্ষেই এটা একটা দুঃখজনক ঘটনা। আকবরের পর সেলিম যদি উত্তরাধিকারী না হন তাহলে রাজ্যে ভয়ানক বিপদ এবং ধ্বংস আসবে। শুধু তাই নয়— রক্তের সম্পর্কেও তিনি আমাদের রাজপুতদের ঘনিষ্ঠ। ভারত সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্যই বাদশাহ আকবর এই রক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছেন। সেলিমের বাদশাহ হওয়ার মধ্যে সেইজন্য হিন্দুদের শক্তি বৃদ্ধি ও সাম্রাজ্যের মঙ্গল নিহিত রয়েছে। সেলিমের ব্যবহারে বাদশাহ অসন্তুষ্ট। কিন্তু ত'াঁকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ইচ্ছা ত'াঁর এখন পর্যন্ত নেই। আবার দানিয়াল শাহের সমর্থকদের প্রধান হচ্ছেন বাদশাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের অন্যতম। সেলিমের এই বিদ্রোহও বাদশাহের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে আরম্ভ করেছে। একরোখা শাহজাদা বাদশাহের নির্দেশই যে শুধু অমান্য করছেন তাই নয় তিনি সেগুলির প্রতি তাচ্ছিল্যও প্রদর্শন করছেন। কয়েকদিন আগে পুত্রের সঙ্গে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্তও বাদশাহ গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাজমাতার বাধায় তা বন্ধ হয়েছে। মাতার এই হস্তক্ষেপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বাদশাহের ক্রোধকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। ফলে আবুলফজল দাক্ষিণাত্য থেকে

ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই গোলমাল শুরু হবে।

'এ সমস্ত কথা সেলিমও অবগত আছেন। নিজের শক্তি এবং সাহস পিতাকে দেখানোই তাঁর উদ্দেশ্য—তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করা নয়। পিতা তাঁকে তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেন, তাঁর গুণাবলীর প্রতি তাঁর নজর নেই এবং তাঁর শত্রুদের তিনি পক্ষপাতী—এই হচ্ছে সেলিমের অভিযোগ। বাদশাহও এগুলির খবর রাখেন। সেই জন্য তিনি চুপ করে রয়েছেন। কিন্তু সেলিম মনে করেন যে আবুলফজল ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ঘটনা অন্য ধারায় প্রবাহিত হবে। তিনি শেখের এক নম্বর শত্রু এবং শেখও তাঁকে দেখতে পারেন না। লোকে তাঁকে একথাও বুঝিয়ে দিয়েছে যে সেলিমই বিষ প্রয়োগ করে তাঁর পিতাকে হত্যা করিয়েছেন। এই সব কারণে সেলিম পথেই আবলফজলের হত্যার আয়োজন করেছেন। আজ সকালে আমরা এই খবর পেয়েছি।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'কি? মহাপণ্ডিত এবং মহানুভব আবুলফজলকে আততায়ীকে দিয়ে হত্যা করানোর ষড়যন্ত্র?'

ভোজ সিংহ বললেন, 'সেলিম তাই স্থির করেছেন। এটা ন্যায় অথবা অন্যায় এই বিচারের প্রয়োজন আমাদের দিক থেকে নেই। অশ্বথমা কি নিদ্রিত শত্রুদের হনন করেন নি? নিরস্ত্র কর্ণকে বধ করার আদেশ স্বয়ং ভগবান কি দেননি? এ সমস্তই রাজনীতির ব্যাপার। কিন্তু এক্ষেত্রে ঘটনা অন্য রকমের। সেলিমের জন্য সত্য সত্যই আবুলফজলের যদি মৃত্যু হয় তাহলে বাদশাহ চিরদিনের মত তাঁর পুত্রের শত্রুতে পরিণত হবেন। আবুলফজলকে আকবর সহোদর ভাই বলে মনে করেন। সেলিম তাঁকে হত্যা করিয়ে দিলে আর কোন আশাই থাকবে না।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'একথা সরাসরি যদি বাদশাহকেই বলা হয় তাহলে তিনি আবুলফজলকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে পারেন না কি?'

ভোজ সিংহ বললেন, 'আমারা সে কথা ভেবেছি। কিন্তু সেলিমের এই চক্রান্তের কথা তাঁর কানে তুললে তিনি কি করে বসেন কিছুই বলা যায় না। সেইজন্য সেলিমের গোয়ার্তুমি বন্ধ করাই আমাদের কর্তব্য হওয়া উচিত। এই ব্যাপারেই তোমার সাহায্য দরকার।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আদেশ করুন, আমি প্রস্তুত।'

ভোজ সিংহ শেঠজীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আক্রমণটা ঠিক কোথায় হবে তা নিশ্চিত ভাবে বলা যাচ্ছে না। কিন্তু যে লোকটি এই কাজের দায়িত্ব নিয়েছে সে তোমার পরিচিত।'

শেঠজী বললেন, 'সে আর কেউ নয়, তোমার ছোট ভাই-এর শ্যালক বীর সিংহ।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'কী! ওর্ছার রাজা?'

শেঠজী বললেন, 'হ্যাঁ, সে-ই! তার সঙ্গে তোমার ভাইও থাকতে পারে। কিন্তু এই মহাপাপের জন্য প্রস্তুত দুর্বৃত্ত হচ্ছে বীর সিংহ বুঁদেলা। সেইজন্য উজ্জয়িনী থেকে বেরিয়ে গোয়ালিয়রে প্রবেশ করার আগেই বুঁদেলা রাজ্যের নিকটবর্তী কোন স্থানই নির্বাচিত হয়েছে। আবুলফজল কাল সন্ধ্যায় উজ্জয়িনী পৌঁছচ্ছেন। বিশ্রাম এবং কিছু কাজে তিনি সেখানে দুদিন থাকবেন। সেখান থেকে আসবেন সিপ্রা এবং সিপ্রা থেকে গোয়ালিয়র। সিপ্রা থেকে শুরু করে গোয়ালিয়র পর্যন্ত পথটা খুব নির্জন এবং স্থানটি বুঁদেলার সীমান্তেও বটে। সেইজন্য আমার ধারণা বীর সিংহ তাঁর উপর ঐখানেই আক্রমণ করবে। আবুলফজলের সঙ্গে মাত্র তিনশো অশ্বারোহী সৈন্য আছে। বুঁদেলা তিন হাজার অশ্বারোহী এবং দু হাজার পদাতিক সৈন্য নিয়ে নিজে রাজধানী থেকে যাত্রা করেছে।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'এক্ষেত্রে আমায় কী করতে হবে?'

শেঠজী বললেন, 'এই সমস্ত কথা আবুলফজলকে জানানোই প্রথম কর্তব্য। এখনই যাত্রা করলে সন্ধ্যা নাগাদ ধোলপুরে পৌঁছে যাবে। সকালে সেখান থেকে রওনা হতে পারলে, ভাল ঘোড়া যদি থাকে, দুপুরবেলায় গোয়ালিয়র পৌঁছুতে পার। বুঁদেলার হাতে না ধরা পড়ে উজ্জয়িনী পর্যন্ত যেতে পারলেই কাজ সফল হবে।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আমি এইবার রওনা হতে পারি?'

রাজা ভোজ সিংহ বললেন, 'একা যাওয়াই যে ঠিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এক্ষেত্রে প্রয়োজন সৈন্যের নয়, বুদ্ধি এবং

প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের। এই দুটিই তোমার মধ্যে আছে বলে তোমাকে এই কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। রাস্তার সমস্ত বন্দোবস্ত…'

এতক্ষণ চৌধুরী নির্বাক ছিলেন। কথাটিকে তিনি সম্পূর্ণ করলেন। বললেন, 'রাস্তার সমস্ত আয়োজন ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। ধৌলপুর, গোয়ালিয়র, নরবর এবং সিপ্রায় বদলে নেওয়ার উপযুক্ত ভাল আরবী ঘোড়া তৈরী পাবেন। অন্য যে কোন সাহায্য চাইলেই পাবেন।'

বিশেষ বক্তব্যের জন্য অনুমতি চাওয়ার ভঙ্গিতে তিনি শেঠজী এবং ভোজরাজের দিকে তাকালেন। চোখের ইশারায় অনুমতি পেতেই তিনি বললেন, 'রাস্তায় এখানে-সেখানে বৈরাগী ধরনের কিছু লোক দেখা যাবে। তাদের মধ্যে যারা ত্রিশূলধারী তাদের সাক্ষাৎ পেলে জিজ্ঞেস করবেন, কর্পূর আছে? যদি উত্তর আসে, কাশ্মীরী আছে, তাহলে এই চুড়ি দেখাবেন। তাহলেই সব রকম সাহায্য পাবেন। এই চুড়ি খুব সতর্কতার সঙ্গে রাখবেন। দেখলে কাঁচের মনে হবে, কিন্তু কিছুতেই ভাঙবার নয়।' এই কথা বলতে বলতে চৌধুরী নিজের পকেট থেকে একটা চুড়ি বের করে ভোজ সিংহের হাতে দিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ সেটি দলপতি সিংহের হাতে দিয়ে দিলেন।

'তাহলে আর দেরি করবেন না। শেঠজীর আপনাকে অনেক কিছু বলার আছে।' এই অনুমতি পাওয়া মাত্র শেঠ কল্যাণকল ও দলপতি সিংহ সেখান থেকে রওনা হলেন। পথে কোন কথা হলো না। বাড়ি পৌঁছেই শেঠজী বললেন, 'আজ অন্ধকার হওয়ার আগেই ধৌলপুর পৌঁছতে হবে। সেইজন্য আর দেরি করোনা। সুরঙ্গমোহিনী ও তার দিদিমা পৌহড়-এর রাণার প্রাসাদে রয়েছে। তাদের আমি চিঠি দিচ্ছি। মোহিনীকে দিও।'

আনন্দে দলপতি সিংহের হৃদয় নৃত্যে মেতে উঠলো। প্রাণেশ্বরীর সঙ্গে এতদিন দেখা না হওয়ার দুঃখ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। ধৌলপুর থেকে তাকে অপহরণের চেষ্টা দানিয়াল শাহ করেছিলেন। তার পরে তিন মাস কেটে গেছে। এর মধ্যে দলপতি বারকতক শেঠজীর কাছে কুমারীর কথা জিজ্ঞেস করেছেন কিন্তু সন্তোষজনক কোন উত্তর

পাওয়া যায়নি। 'সব ঠিক আছে।' কেবল এই কথায়ই তাঁকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। শেঠজী নিজের থেকেই কখন কখন বলেছেন, সুরজ-মোহিনীর দিদিমা, তুমি কেমন আছ জানতে চেয়েছেন। আজ চিঠি এসেছে। ইত্যাদি ইত্যাদি। এই যাত্রায় তার সঙ্গে দেখা করারও সুযোগ হবে জেনে তাঁর খুব আনন্দ হলো। চিঠি নিয়ে যাওয়া প্রকৃত-পক্ষে একটা অজুহাত মাত্র, ওরা দুজনে মিলিত হোক এই ছিল শেঠজীর ইচ্ছা। এই কথাবার্তার পর দলপতি সিংহ আত্মচিন্তায় মগ্ন হলেন। শেঠজী একটু পরেই তাঁকে তাঁর দিবাস্বপ্ন থেকে জাগিয়ে দিয়ে বললেন, 'আর একটি কথা আছে। রামগড়ে কিছু পরিবর্তনের সূচনা দেখা যাচ্ছে। তোমার ভাই প্রজাদের প্রিয় হয়নি। শুনেছি বুঁদেলার সাহায্যকারী হয়ে প্রজাপীড়নে অত্যাচারী রাবণকেও অতিক্রম করেছে। জনসাধারণ সেখানকার শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। সে বোধ হয় এই হত্যাকাণ্ডের জন্য বীর সিংহের সঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। যাওয়ার পথে খোঁজ নিও এ ব্যাপারে তার কতখানি হাত আছে।' শেঠজীর কথায় তাঁর সুপ্ত আশাগুলি আবার জেগে উঠলো। রামগড়ের উত্তরাধিকারের বিষয়ে তিনি আগ্রা এসেছিলেন। মৃত্যু-শয্যায় শায়িত পিতা তাঁর পিতৃব্য অথবা পিতৃব্য পুত্রের অনুসন্ধানের যে ভার তাঁর উপর ন্যস্ত করেছিলেন সে দায়িত্ব আজও পালিত হয়নি। আগ্রার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে তাঁর মনোযোগ নানা খাতে প্রবাহিত হয়েছে। এখন তাঁর মনে হলো যে শেঠজী এই সময় তাঁর কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। তিনি বললেন, 'রামগড়ের রাজা হওয়ার সাধ আমার নেই। তবুও রাজ্যে যাই ঘটুক না কেন তার দায়িত্ব আংশিকভাবে আমারও। পিতৃব্য অথবা তাঁর সন্তানদের সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত রাজকার্য পরিচালনার ভার পিতা এবং ঈশ্বর আমার হাতে সমর্পণ করেছেন। জনতার সহযোগী হয়ে আমি তো বংশ-দ্রোহী হতে পারিনা। বাদশাহের আদেশ অবশ্যই আমি পালন করবো। আপনার কথা অনুযায়ী এখন সত্য ঘটনা যে কী তাও জানার চেষ্টাও করব।'

শেঠজী প্রসন্ন হলেন। দলপতি সিংহের পৃষ্ঠদেশে হস্ত সঞ্চালন

করে তিনি বললেন, 'হে রাজকুমার, বংশগৌরব এবং মহৎ-স্বভাবের উপযুক্তই হয়েছে তোমার উত্তর। যা-ই ঘটুক না কেন বংশ-দ্রোহী হওয়া চলবে না। রামগড়ের রাজারা কোন কালে তেমন ছিলেন না। তোমার স্বর্গীয় পিতা কিছু দুষ্ট-প্রকৃতির লোকের প্রভাবে পড়ে যৌবনে কয়েকটি অনুচিত কাজ করেছিলেন কিন্তু শেষ সময়ে অনুতাপের আগুনে তাঁকে জ্বলতে হয়েছিল। তার প্রমাণ হচ্ছে মৃত্যু শয্যায় তোমাকে দেওয়া তাঁর আদেশ। তোমার বিবেকও যখন ঐ কাজে এতখানি জাগ্রত রয়েছে তখন সমাপ্তি শুভই হবে। ঐ খামটা সুরজমোহিনীকে দিও। তাকে বলবে যে সত্বরই তাকে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করছি। আচ্ছা, এইবার তাহলে যাও।'

দলপতি সিংহ অবশ্যম্ভাবী প্রিয়া-মিলনের আশায় আনন্দেবিভোর হয়ে সেই দিনই যাত্রা করলেন।

সন্ধ্যা আসছিল। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আলো বৃক্ষলতাদিকে সিঁদুর লিপ্ত এবং ধরিত্রীকে রক্তাম্বরা করে তুলেছিল। সূর্যালোক ম্লান হতে ম্লানতর হচ্ছিল। দিবা অবসান ছিল বড়ই মনোরম। জীব-জগতের আনন্দদায়ক চৈত্রের সূচনা মাত্র হয়েছে। চম্বল উপত্যকার বৃক্ষলতাদি ফুল্লকুসুম শোভায় পুলকিত হয়ে উঠেছিল। মরুময় রাজস্থান এবং জলাভাব জনিত উদ্ভিদ দারিদ্র্যে পীড়িত গোয়ালিয়রের মধ্যবর্তী এই ভূমিখণ্ড চম্বলের দাক্ষিণ্যে শস্যশ্যামলা হয়ে উঠেছিল।

একটি সুন্দর প্রাসাদ এই নদীতটের শোভা বর্ধন করছিল। শ্বেত-প্রস্তর-নির্মিত এই প্রাসাদের শীর্ষ-স্থান বহু দূর থেকে দৃষ্টিগোচর হতো। চারদিকের প্রস্তর-নির্মিত কুঠরিগুলি দেখেই বোঝা যেত যে সেটি একটি রাজপ্রাসাদ। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ খাদ, প্রবেশদ্বারের সৈনিকরক্ষী, স্থানে স্থানে সজ্জিত কামানশ্রেণী প্রভৃতি স্পষ্টই ঘোষণা করছিল যে শত্রুর দুর্গটি অজেয় না হলেও দুর্গম তো বটেই। ভিতরের দিকে ঘুরে গেছে যে সাঁকোটি সেটি পার হলেই দুর্গদ্বার। মদমত্ত হাতীও যাকে নড়াতে পারে না এমনই সুদৃঢ় সিংহদ্বারটি তীক্ষ্ণাগ্র হুকে আচ্ছন্ন আর সেটি খোলা বা বন্ধ করার সময় এক অনেক সংখ্যক জনসমষ্টির প্রয়োজন হতো।

দুর্গমধ্যস্থ বৃহৎ অট্টালিকাগুলির মধ্যে প্রধানটি ছিল রাজপ্রাসাদ। ভারতীয় শিল্পকলার সেটি ছিল শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তিনমহলা ঐ প্রাসাদের প্রথম মহলে ছিল সিংহাসন বেদী, সভাগৃহ, বৈঠকখানা প্রভৃতি। সভা-মণ্ডপের চতুর্দিকের দেয়ালে ভাগবতের কাহিনী চিত্রিত ছিল। কাঞ্চনবর্ণে রঞ্জিত ছাদে রজত দীপাবলী, মেঝেতে বিছানো রত্নময় গালিচা এবং মধ্যবর্তী রত্নসিংহাসন মহারাজের ঐশ্বর্যের মহিমা প্রকাশ করছিল। অন্যান্য কক্ষগুলি এই ভাবেই অলঙ্কৃত ছিল।

দ্বিতীয় অংশে ছিল শয়নকক্ষ আর তার লাগোয়া একটি বড় চাঁদোয়া খাটানো ছিল। ওটা ছিল রাজপ্রাসাদের মহিলাদের প্রয়োজনে। তৃতীয় অংশে বাসকক্ষ এবং শয়নকক্ষ ছিল।

অশ্বশালা, হস্তীশালা, পরিচারকদের গৃহ প্রভৃতি অনেক ধরনের ঘর পিছনের দিকে ছিল। এতদ্ব্যতীত বিশাল একটি উদ্যানের মধ্যে ছিল অতিথিদের জন্য নির্মিত অতিথিশালার সুন্দর ভবনটি। উদ্যানটি ছিল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত। আকবর বাদশাহের প্রবল প্রতাপান্বিত পিতামহ বাবর শাহ যে উদ্যান গঠন প্রণালী ভারতে প্রচার করেছিলেন হিন্দুরাজাদের তা অনুপ্রাণিত করেছিল। পারস্য ও সমরকন্দ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আনীত সুরভিত পুষ্প, লতা-গুল্ম, বিভিন্ন বর্ণের পত্রাবলী সমৃদ্ধ লতা, কমল-কুমুদ প্রভৃতি শোভিত জলাশয় উদ্যানের শোভাবর্ধন করছিল। ওই বিশাল বাগানের লতাকুঞ্জে দ্বিপ্রহরে অসহ্য তাপের প্রবেশাধিকার ছিল না। ধোলপুর থেকে প্রায় চার ক্রোশ দূরবর্তী এই প্রাসাদটি ছিল গোহড়া রাণা নামধারী সুপ্রসিদ্ধ জাঠ রাজার। প্রাসাদের প্রধান কক্ষে তখন কেউ থাকত না। গোহড়া রাণা নিজের রাজধানীতেই থাকতেন। তিনি কেবল গ্রীষ্মকালের তিনমাস এখানে থাকতেন। অতিথিশালার উদ্যানে দুটি স্ত্রীলোক আরণ্য-সৌন্দর্য উপভোগ করে বেড়াচ্ছিলেন। এরা হচ্ছেন সুরজমোহিনী এবং তার মাতামহী দুর্গাদেবী। অন্যত্র আমরা জেনেছি যে যখন এঁরা হরিদ্বার যাচ্ছিলেন সেই সময় দানিয়াল শাহের উৎপাতে রাজধানী থেকে দূরে কোথায় যেন এঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তেমন এক ব্যক্তির

আশ্রয়েই এঁদের পাঠানো যেত যিনি শাহজাদার আক্রমণকে রোধ করতে সক্ষম। সেই জন্যই শেঠজী তাঁর বন্ধু গোহড় রাণাকে বেছে নিয়েছিলেন।

সর্বপ্রকার সুবিধাযুক্ত হলেও স্থানটি সুরজমোহিনীর কাছে ছিল কারাগার বিশেষ। দাদুর কাছ থেকে দূরে থাকা দিন দিন তার কাছে অসহ্য মনে হচ্ছিল। এরজন্য একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ এবং কয়েকজন সখিকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সংস্কৃতের সাধারণজ্ঞান তার ছিল। এইবার সেই পণ্ডিতের সাহায্যে গ্রন্থপাঠের মাধ্যমে নিজেকে সে আরও সমৃদ্ধ করতে লাগল। তবুও দাদুর বাড়ির স্বাধীনতাভোগী এই মেয়েটির পক্ষে এই একাকীত্ব সুখকর লাগছিল না। আজ তিন মাস হয়ে গেল সে ধৌলপুর থেকে এসেছে। খুব বেশি হলে একমাস থাকার মত মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে সে এসেছিল। শেঠজী বলেছিলেন বাদশাহ ফেরার সঙ্গে সঙ্গে তাকে নিয়ে যাওয়া হবে। এখন সে ভাবে, বাদশাহ এসেছেন তিন মাস হয়ে গেল তবু কেন দাদু আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন না? উল্লিখিত সন্ধ্যায়ও সে এই চিন্তাতেই মগ্ন ছিল। চারদিকে পদচারণা করে এবং বাগানের সৌন্দর্য দেখে সে তার মনকে সংযত করার চেষ্টায় ব্যাপৃত ছিল। কিন্তু মন মানে কই? শেষে সে দিদিমাকে প্রশ্ন করল, 'দিদিমা, দাদু আমাদের কতদিন আর এখানে রাখবেন? আর বেশি দিন থাকলে আমি অসুখে পড়ব।'

'প্রয়োজনের অতিরিক্ত একদিনও তিনি আমাদের এখানে রাখবেন না।' 'দিদিমা বললেন, 'তুমি ধৈর্য ধরো। অকারণে মনকে কষ্ট দিওনা।'

'দাদু বলেছিলেন না যে এখানে আমাদের এক মাসের বেশি থাকতে হবে না! বলেছিলেন বাদশাহ এলেই নিয়ে যাবেন। তিনি ফিরেছেন সে-ও তো বহু দিন হয়ে গেল। দাদু আসছেনই না। এতদিন আমাদের দূরে রাখার কী প্রয়োজন দিদিমা? আপনি জানেন না?'

'তাঁর সিদ্ধান্ত এবং উদ্দেশ্যের কথা আমি কি করে জানবো বাছা?'

'তবুও, আপনাকে কি কিছুই বলেন নি? আপনার পরামর্শ ছাড়া দাদু যে কিছু করেন না তা আমি জানি।'

'তুমি জেনেই বা কী করবে ?'

'তবুও, বলুন না।'

এই ধরনের কথোপকথন প্রতিদিনের যেন নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের বনবাসের কারণ জানার জন্য সুরজমোহিনী বার বার আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তাকে সবকিছু খুলে বলার কথাও মাঝে মাঝে দুর্গাদেবী চিন্তা করেছেন। কিন্তু বলি-বলি করেও এ পর্যন্ত তিনি এড়িয়ে গেছেন। ও যদি জানে তাহলেই বা ক্ষতি কি ? এই কথা ভেবে সেদিন সমস্ত কথা বলে ফেলবেন স্থির করলেন। সেইজন্য সুরজমোহিনী আবার পীড়াপীড়ি করতেই দুর্গাদেবী বললেন, 'আমি তোমাকে না হয় দুঃখ দিতে চাইনি সেইজন্য এতদিন গোপন রেখেছি। অনুমানে তুমি নিশ্চয় জেনেছ যে তুমি এক উচ্চ ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান। আমার এবং শেঠজীর ইচ্ছা যে অনুরূপ উচ্চ বংশীয় কোন ক্ষত্রিয় যুবকের সঙ্গেই তোমার বিয়ে হোক। এপর্যন্ত তাতে অনেক বাধা ছিল। প্রথমত, লোকে শেঠজীকে বৈশ্য বলে জানে। তাই ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা তারা ভাবেই না। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এখন একজন ক্ষত্রিয় কুমার তোমার সঙ্গে বিয়ে করতে ইচ্ছুক হয়েছে। আমরাও রাজী আছি। আর আমরা দেখছি যে তুমিও তাকে পছন্দ কর।'

লজ্জায় সুরজমোহিনীর মুখ আনত হলো। কিন্তু সে কোন কথা বলল না। দুর্গাদেবী বলতে থাকলেন, 'এমন সময় বিপদের একটা কালো মেঘ দেখা দিল। বাদশাহের পুত্র দানিয়াল শাহ অনেক দিন থেকে তোমায় তাঁর অন্তঃপুরে পাঠিয়ে দেবার জন্য বলছেন। শেঠজীকে ডেকে প্রকাশ্যেই একবার বলেছিলেন। ভারতের বহু রাজা মহারাজাদের মেয়ে বউ যখন তাঁদের অন্তঃপুরে রয়েছে তখন এই আদেশকে সরাসরি অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই তখনকার মত বাঁচার জন্য শেঠজী বলেছিলেন যে এ ব্যাপারে বাদশাহের অনুমতি চাই। সেই সময় বাদশাহ দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। দানিয়াল শাহ অন্তঃপুরের পূর্ণ কর্তৃত্ব পেলেন। সময় বুঝে শেঠজী আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

ক্রোধের আবেগে সুরজমোহিনীর মুখ দিয়ে কথা সরলো না।

যবনের অন্তঃপুরে প্রবেশের আগে প্রাণত্যাগই শ্রেয় বলে তার মনে হলো। চক্ষু থেকে তার যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বেরুতে লাগল। কোমল-প্রকৃতির ওই কন্যাকে মুহূর্তের জন্য অসুর নাশিনী দুর্গার মত মনে হলো। তবু শান্ত স্বরে সে উত্তর দিল, 'ম্লেচ্ছদের অন্তঃপুরে কোন অবস্থাতেই যাবো না। তেমন সময় যদি আসেই তাহলে বিষ খেয়ে মরবো। দেবী দুর্গার শপথ নিয়ে বলছি।'

ইতিমধ্যে একজন ভৃত্য এসে খবর দিল যে আগ্রা থেকে শেঠজীর চিঠি নিয়ে একজন সৈনিক এসেছে। ফলে আলোচনা মাঝ পথে বন্ধ হলো। সৈনিকটিকে ডেকে দেওয়ার আদেশ হলো।

দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত ধূলিধুসরিত দেহ দলপতি সিংহ তখন তাঁদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁকে দেখে দুজনেই খুব আনন্দিত হলেন। ক্রোধজনিত মুখের বিকৃতি সঙ্গে সঙ্গে কোথায় বিলীন হলো। কুমারীর মুখ কমলের মত বিকশিত হয়ে উঠলো। পূর্ব প্রসঙ্গের কথা সে যেন একেবারে বিস্মৃত হলো। কেবল একটি কথাই তার মন জুড়ে রইল আর তা হলো --দলপতি সিংহ আমার কাছে এসেছে।

রাজপুত যুবকটিও তো যাত্রার শুরু থেকেই প্রাণপ্রিয়ার দর্শনাভিলাষের আনন্দে আত্মহারা। পথে কোথাও তিনি থামেন নি। হ্যাঁ, একজন পথিকের কাছে তিনি গোহড় রাণার প্রাসাদের খোঁজটা নিয়েছিলেন বটে। তাঁর উপর নির্ভরশীল কাজের গুরুত্ব এবং প্রিয়া-সমাগমের আশা যথাসম্ভব সত্বর পৌঁছানোর ব্যাপারে তাঁর প্রেরণা দিয়েছে। এই আগ্রহের অধীরতায় তিনি পুত্রতুল্য প্রিয় অশ্বটিকে দু-একবার আঘাতও দিয়েছেন। আপ্রাণ চেষ্টায় তিনি সন্ধ্যার আগেই সুরজমোহিনীর বাসস্থানে পৌঁছে গেছেন।

দীর্ঘ তিন মাস পরের এই মিলন দিনেও প্রিয়তমার মুখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে দেখার সাহস আত্মমর্যাদা সম্পন্ন ওই যুবকের হলো না। সে যে কাছেই আছে এই সন্তোষে দলপতি সিংহ দুর্গাদেবীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলেন। নারীসুলভ লজ্জায় সুরজমোহিনীও তাঁর দিকে চাইতে পারলেন না। তরুণ হৃদয় দুটির হৃদয়চাঞ্চল্য অনুভব

করে দুর্গাদেবী মৃদু হাসলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'শেঠজী ভাল আছেন তো? আপনিও ভাল আছেন?'

দলপতি সিংহ উত্তর দিলেন, 'আপনারা দুজন দূরে থাকার ফলেই শেঠজীর যা দুঃখ। অন্য সব দিক থেকে তাঁর খবর ভাল। আপনার আশীর্বাদে আমিও ভাল আছি।'

'মহারাজ পৃথ্বী সিংহেরও কুশল তো?'

'অজ্ঞাত কারণে তাঁকে বন্দী করা হয়েছে। প্রায় তিন মাস হলো।'

'কী, রাজা পীথল বন্দী?' সূরজমোহিনী তার উদ্বেগ ব্যক্ত না করে থাকতে পারল না।

'রাজধানীতে অনেক পরিবর্তন হয়েছে।'

দুর্গাদেবী তার কথার উত্তর দিয়ে বললেন, 'মোহিনী! রাজনীতি দিয়ে আমাদের কি দরকার?' তিনি আবার দলপতি সিংহের দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁ, রাজকুমার, রাজা পীথলকে যখন বন্দী করা হয়েছে রাজধানীতে তখন বহু অসাধারণ ঘটনাই ঘটেছে? বোধহয় সেই জন্যই শেঠজী আমাদের এখন পর্যন্ত নিয়ে যাননি। তিনি আমাদের জন্য কি খবর পাঠিয়েছেন?'

'কুমারীর জন্য তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছেন এবং আপনাকে বলতে বলেছেন যে শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে। দুচার দিনের মধ্যে তিনি স্বয়ং এসে আপনাদের দুজনকে আগ্রা নিয়ে যাবেন।'

অতি যত্নের সঙ্গে সূরজমোহিনী চিঠিটি নিলো। পড়তে পড়তে আনন্দে মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে বলল, 'দিদিমা, শুনুন, দাদু কি লিখেছেন!' এবং সে পড়ে শোনাতে লাগল, 'আমার পরম প্রিয় পৌত্রী সূরজ মোহিনীকে কল্যাণমলের শুভ আশীর্বাদ! আশাকরি তুমি এবং দিদিমা কুশলে আছ। আমি জানি, এখানে আমার দেরির জন্য তোমরা দুঃখিত হবে। কিন্তু দেবীর কৃপা দৃষ্টির আর বেশি বিলম্ব নেই। বাদশাহের আদেশে পরশু আমি রাজপুরী গিয়েছিলাম। মহামান্য বাদশাহ অনুগ্রহ করে তোমাদের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। সাম্রাজ্ঞী যোধাবাঈও তোমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন এবং কিছু বস্ত্রালঙ্কার

উপহার স্বরূপ পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, বাদশাহের কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'রাজকুমার দলপতি সিংহ একটি প্রয়োজনীয় কাজে যাচ্ছেন। রাত্রে তাঁকে ওখানে রেখে সকালেই রওনা করে দিও। ঈশ্বরেচ্ছায় কোন অসুবিধা হবেনা।' চিঠি পড়ে সকলের আনন্দ হলো। বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাতের অর্থ অনুমান করতে সুরজমোহিনী ও দুর্গাদেবীর অসুবিধা হলো না। দুর্গাদেবী বুঝলেন যে দানিয়াল শাহ সম্ভবত নিজের ইচ্ছা বাদশাহকে জানিয়েছিলেন এবং তিনিও শেঠজীকে সেই প্রসঙ্গেই ডেকে ছিলেন। সুরজমোহিনী অনুমান করল যে বিয়ের সব বাধা দূর হয়ে গেছে। কিন্তু ঘটনা যা ঘটেছিল তা হচ্ছে এই দানিয়াল শাহ সুরজ-মোহিনীকে করায়ত্ত করার বাসনা বাদশাহের এক বেগম মারফৎ তাঁর কাছে পেশ করিয়েছিলেন। যেহেতু বাদশাহের অনুমতি ছাড়া শেঠজী রাজী নন তাই তিনি বাদশাহের অনুমতি প্রার্থনা করেছিলেন। বাদশাহ প্রথমে এর বিরোধিতা করলেন কিন্তু দানিয়ালের অত্যধিক আগ্রহ দেখে তিনি শেঠজীকে ডেকে ছিলেন। তাঁকে যে ডাকা হবে এখবর দেওয়ান দীনদয়াল মারফৎ পূর্বাহ্ণেই জানতে পারায় শেঠজী সব কথা রাণী যোধাবাঈকে বলেছিলেন। শেঠজী যখন বাদশাহের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন মহারাণী তখন কাছেই পর্দার আড়ালে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কোন রকম জোর না দিয়ে বাদশাহ কল্যাণমলকে বললেন যে দানিয়ালের ইচ্ছা পূর্ণ হলে তিনি আনন্দিত হবেন। শেঠজী জানালেন যে তাঁর অবস্থার তুলনায় এই সম্মান অত্যাধিক এবং বালিকাটি অন্য এক যুবকের প্রতি আসক্ত হওয়ায়ও কাজটি উচিত হবে না। তবু বাদশাহের আদেশ সর্বদা মান্য। শেঠজী যখন দেখলেন যে এ ব্যাপারে বাদশাহের বিশেষ আগ্রহ নেই তখন বালিকাটি সম্বন্ধে সত্য কথা তিনি তাঁকে জানালেন। সমস্ত কথা শোনার পর বাদশাহ বললেন, 'তাহলে তো বেশ ভেবে-চিন্তে কাজ করতে হয়। এতবড় মহৎ ব্যক্তির কন্যাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করানো যায় না। আপনি তার জন্য যে ছেলেটিকে

দেখেছেন সে কি মেয়ের উপযুক্ত ?

শেঠজী বললেন যে সে সবদিক থেকেই যোগ্য। কিন্তু তার নাম, বংশ ইত্যাদির কথা তিনি বাদশাহকে জানালেন না। কথা দিলেন যে শীঘ্র তাকে তিনি দরবারে আনবেন।

দুর্গাদেবী কথা বাড়ালেন না। 'দাদুতো শীঘ্রই আসছেন, তখন সব কথা জানা যাবে। রাজকুমার অনেকদূর থেকে আসছেন, তিনি ক্লান্ত। আমি ওঁর ব্যবস্থা করছি।' এই কথা বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। সুরজমোহিনী এবং দলপতি সিংহ পরস্পরের প্রতি বহুদিন থেকে আকৃষ্ট হলেও তৃতীয় ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে কথা বলার সুযোগ তাঁদের এ পর্যন্ত হয়নি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় সেই প্রথমবার যে কথা হয়েছিল তারই স্মৃতি তাদের মনে জাগ্রত ছিল। সেই জন্য এই দুর্লভ সুযোগের সদ্ব্যবহার কিভাবে করা যায় তা তারা ভেবেই পেল না। শেষে সুরজমোহিনীই নীরবতা ভঙ্গ করল, 'পথশ্রমে ক্লান্ত হয়েছেন নিশ্চয়। ভিতরে চলুন বিশ্রাম করবেন।'

দলপতিসিংহ উত্তর দিলেন, 'আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার ক্লান্তি দূর হয়েছে। কত দিন পরে দেখা। এখানে কষ্ট হচ্ছে না তো ?'

'প্রিয়জনের থেকে দূরে কি কেউ কুশলে থাকতে পারে ?'

'প্রিয়জন' শব্দটির মধ্যে নিজেও অন্তর্ভুক্ত মনে করে দলপতি সিংহ আনন্দিত হলেন। সুরজমোহিনী বলতে থাকল, 'শহর থেকে দূরে নদীর তীরের এই রমনীয়তা এবং শান্তি আমার কাছে খুবই আনন্দদায়ক হয়েছে। আমার প্রিয়জনদের কাছ থেকে এত দূর না হলে এর চেয়ে সুখের জায়গা আর হয়না। আপনি ভাল ছিলেন তো ?'

'আমার আর কি সুখ ? নিজের নিকটতম মানুষ যখন কষ্ট ভোগ করে তখন কি মানুষের সুখ থাকে ?'

'মহারাজা যখন বন্দী তখন আপনার এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। দাদু বলেন যে তিনি আপনার কাছে পিতৃতুল্য।'

'শুধু ওঁর বিষয়েই আমি চিন্তিত ছিলাম না। আমার হৃদয়কে আলোকিত করেছে যে দীপশিখা সে দূরে থাকলে আমার সুখ হবেলা ?

আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। মহারাজ পৃথ্বী সিংহের বন্দীত্বের সমান দুঃখই আপনার উপর দিয়ে যে বিপদ গেছে তার ফলে আমি পেয়েছি। ঈশ্বরের কৃপায় এখন সে বিপদ কেটে গেছে।'

লজ্জায় সুরজমোহিনী নতমুখী হলো। শৃঙ্গার কলায় অনভিজ্ঞ বালিকারাও প্রিয়তম সন্নিধ্যে স্বাভাবিক ভাবানুভূতি প্রকাশ করে থাকে। নরনারীর আকর্ষণ প্রকৃতির নিয়ম সিদ্ধ। সেই কারণে এই ধরনের ভাব-বৈশিষ্ট পশুপাখিদের মধ্যেও দেখা যায়। নির্মলচিত্ত এবং ভাবমুগ্ধ ওই বালিকা প্রাণবল্লভের কথায় অনন্দলব্ধ পুলক অনুভব করলো। তার স্বাভাবিক বাক্‌পটুতা কোথায় যেন হারিয়ে গেল। এই ভাবে ক্ষণকালের জন্য নির্বাক সুরজমোহিনী নিজেকে সংযত করে নিয়ে বলল, 'আমার জন্য আপনার দুঃখ হয়েছে আর আপনার জন্য আমার দুশ্চিন্তার সীমা ছিলনা। নানা কাজে ব্যস্ত পুরুষ মেয়েদের ভাবনার কথা কি করে বুঝবে?'

'শেঠজী চিঠি থেকে আমার অনুমান, আমাদের বিপদের দিন শেষ হয়ে এসেছে।'

কাছেই একটি গাছে বিকশিত তিন চারটি ফুলের দিকে চেয়ে সুরজমোহিনী দাঁড়িয়ে রইল। তার দৃষ্টি নিজের উপর না পড়ায় ক্ষুব্ধ দলপতি সিংহ বললেন, 'এতদিন দূরে রইলাম। আজ চোখ ভরে দেখে নিই।'

সাহস সংগ্রহ করে সুরজমোহিনী তার কমলদলেরতুল্য চক্ষু মেলে তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করল। সারা বিশ্ব তার কাছে নতুন রূপে ধরা দিল। অনাস্বাদিতপূর্ব এক স্বর্গীয় আনন্দানুভূতি তাকে বিভোর করল। ঐ দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্য দিয়েই তাদের অন্তরের মিলন পূর্ণ হলো।

ক্ষণকাল পরেই বালিকা তার মুখ আনত করল। কিন্তু সে এক নতুন শক্তি এবং মনের নতুন এক প্রকাশের সন্ধান পেলো। একটি গোলাপ ফুল তুলে নিয়ে সে বলল, 'সকালেই আপনি গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাচ্ছেন। আমার স্মৃতি হিসাবে এই তুচ্ছ উপহার গ্রহণ করুন। ফুলটি নাকের কাছে নিয়ে তার সুগন্ধ একবার মাত্র অনুভব করে সেটি দলপতি সিংহের হাতে দিয়ে দিল। ঐ সুগন্ধ আস্বাদনের মধ্যে না জানি

কত প্রার্থনা করে পড়েছিল। হয়ত বা নিজের প্রেমপূর্ণ আত্মাকেই সে ফুলের মধ্যে বিকশিত করে তুলেছিল।

দলপতি সিংহ সাদরে সেই উপহার গ্রহণ করে নিজের অধরপুটে একবার স্পর্শ করলেন এবং রোমাঞ্চিত আবেগে একটি চুম্বনের দ্বারা তার দলগুলিকে বুঝিবা রক্তিমতর করে তুললেন। শেষে তিনি সেটি সযত্নে নিজ পোশাকের মধ্যে রেখে দিয়ে মৃদুস্বরে বললেন, 'প্রিয়তমে! আমার সব কাজে এই ফুল আমায় সাফল্য এনে দেবে।' কথা শেষ হওয়ার আগেই দুর্গাদেবী কাজ সেরে এসে পড়লেন। তিনি বললেন, 'কুমার, ভিতরে চলো স্নান প্রভৃতির ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আমাদের দুজনের দেবীদর্শনের সময়ও হয়ে এসেছে।' সময়ের গতি রুদ্ধ হয়না। দলপতি সিংহ ভাবলেন।

দাক্ষিণাত্য থেকে ফিরে বাদশাহ আকবর দেওয়ানী-ই-আমে প্রধান ওমরাহ প্রভৃতির সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং পরে দেওয়ানী-ই-খাসে নিজের মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে রাজকার্য সম্বন্ধে আলোচনা স্থগিত রেখেছিলেন। পিতৃতুল্য গুরুর মৃত্যুতে দুঃখেই তিনি এই রকম করছেন বলে অনেকের ধারণা হয়েছিল।

দলপতি সিংহ সেদিন আগ্রা থেকে রওনা হলেন তার পরে অষ্টম দিনে দরবার বসবার কথা ছিল। এই বিজ্ঞপ্তি রাজধানীর সবাইকে দেওয়া হয়েছিল। জনসাধারণ ধারণা করেছিল যে এই দরবারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মীমাংসিত হবে। নিজের নিকটতম বন্ধু এবং সচিবদের সঙ্গে ছাড়া বাদশাহ তিন মাস কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। সেইজন্য তাঁর দর্শনলাভের সংবাদে দরবারীরা প্রসন্ন হলেন। আগ্রা রাজপ্রাসাদের প্রকৃত বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। তখনকার দিনেই শুধু নয়, পরবর্তীকালে নির্মিত রাজপ্রসাদগুলির সঙ্গে তুলনা করলেও তাকে স্বর্গ নামে অভিহিত করতেই হবে। ফরাসীদেশীয় রাজাদের লুভর্ এবং ইংরেজ সম্রাটদের 'উইণ্ডসরের' সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয় যাঁর ছিল এমন ইউরোপীয় পর্যটকও আগ্রার রাজপ্রাসাদের সৌন্দর্য, শিল্প-বৈচিত্র্য এবং ঐশ্বর্যে আশ্চর্যান্বিত

না হয়ে পারেন নি। সমস্ত প্রধান অট্টালিকাগুলিই ছিল যমুনামুখী। তাদের বেষ্টন করে যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল তার পরিধি ছিল পাঁচ মাইল। প্রবেশ দ্বার ছিল চারটি। উত্তরদ্বারে সুবৃহৎ কামান শ্রেণী সজ্জিত ছিল। এই দ্বার বিশিষ্ট আরোহীর জন্যই উন্মুক্ত হতো। পশ্চিম দ্বারের নাম ছিল 'কাছারী দরজা'। তারই কাছে ছিল নগরকাজী নামধারী ন্যায়াধিশের প্রাসাদ। তারই লাগোয়া ছিল প্রধান বাজার। নগর কাজীর ভবনের সামনে ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কাছারী। তার সীমার মধ্যে পথের প্রান্তে ছিল দক্ষিণ দ্বার। তার মধ্য দিয়ে রাজপুরীর রাস্তা চলে গেছে। এই পথের দুধারে ছিল রাজনর্তকীদের আবাস। চতুর্থ দ্বার ছিল যমুনার দিকে। এখানে বাদশাহ প্রত্যহ প্রজাদের দর্শন দিতেন।

দক্ষিণ দ্বার অতিক্রম করলেই পাওয়া যেত একটি বিশাল অঙ্গন অথবা মাঠ। কয়েক হাজার সৈনিক অনায়াসে দাঁড়িয়ে থাকার উপযুক্ত এই মাঠের চারদিকে ছিল সুন্দর চত্বর। এই মাঠে এবং চত্বরে সৈন্য-দল সব সময় প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করত। দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখবর্তী চত্বরের আগে অপেক্ষাকৃত ছোট আর একটি অঙ্গন ছিল। সেখানে ওমরাহ এবং পদস্থ ব্যক্তিরাই কেবল প্রবেশাধিকার পেতেন। ঐ অঙ্গনের কাছেই ছিল বাদশাহের দেওয়ানী আম। অতি সুন্দর চিত্রকলা মণ্ডিত ও কারুকার্য সমন্বিত বিশাল কক্ষটির মধ্যস্থলে ছিল বাদশাহের সিংহাসন মঞ্চ। ভূমি থেকে প্রায় ছ ফুট উঁচু মঞ্চের মাঝখানে স্বর্ণনির্মিত ভদ্রাসন এবং চারটি স্বর্ণস্তম্ভের উপর একটি ছত্র ছিল।

কক্ষটির শিল্প কৌশলের বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। উপরে রজত এবং কাঞ্চনের কারুকার্য চমৎকার। রক্তবর্ণ প্রস্তর স্তম্ভের উপর রত্ন খচিত পক্ষী-মৃগাদির মূর্তি, ইতঃস্তত দোদুল্যমান দীপবৃক্ষের শোভা। নিম্নে বিস্তৃত পারস্যদেশীয় রত্নময় গালিচা, পার্শ্ববর্তী উদ্যানের রমনীয়তা, এই সবকিছুর সমাবেশে দেওয়ানী-আম এক অলৌকিক বস্তু মনে হতো।

এই দেওয়ান-ই-আম-এর পশ্চাদ্দেশেই ছিল দেওয়ান-ই-খাস। এখানে শুধুমাত্র মন্ত্রী, মহারাজা এবং স্বজনেরাই প্রবেশাধিকার পেতেন।

এখানকার সাজসজ্জা দেওয়ান-ই-আমের চেয়েও চমকপ্রদ ছিল। দেওয়ান-ই-খাসের লাগোয়া 'গুসলখানা' নামক একটি ক্ষুদ্র কক্ষ ছিল। এই নাম সত্বেও এটি স্নানাগার ছিল না। সর্বদা শীতল রাখার ব্যবস্থা এটিতে ছিল বলেই উক্ত নামকরণ। একান্ত গোপনীয় কথাবর্তা বাদশাহ এখানেই সারতেন। রত্ন শিল্পকলায় অলঙ্কৃত শ্বেতপ্রস্তরের একটি ফোয়ারা গৃহমধ্যে নির্মল জলধারার মধ্যে রামধনুর সপ্তবর্ণকে প্রতিফলিত করতো। ফলে গ্রীষ্মকালেও কক্ষটিতে অসাধারণ শীতলতা বিরাজ করতো।

গুসলখানার আগে ছিল অন্তঃপুর। সেখানে বাদশাহ এবং অন্তঃপুর রক্ষী হিজড়ারাই প্রবেশের অধিকারী ছিল।

মধ্যাহ্ন থেকেই রাজমহলের অঙ্গনে পদাতিক সৈন্যের আগমন আরম্ভ হলো। মাঝের রাস্তা ছেড়ে দিয়ে তারা দু-পঙক্তিতে দাঁড়িয়ে গেল। রত্নময় সাজে সজ্জিত নটি রাজহস্তী এবং তাদের প্রতিটির পিছনে স্বর্ণ-আভরণে ভূষিত দশটি করে হাতী ধীরে ধীরে এসে দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। পরে এই নব্বইটি হস্তী সিংহাসনের দিকে মুখ ঘুরিয়ে মাথা নীচু করে সিংহদ্বারের বাইরে গিয়ে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হলো। অলঙ্কারে, আকারে এবং রাজকীয় ভঙ্গিতে দর্শনীয় নটি গজশ্রেষ্ঠ ভিতরেই সেনাপংক্তির পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নটি সুসজ্জিত অশ্ব এদের সামনে এসে দাঁড়ালো।

এই সকল ব্যবস্থাপনার জন্য রাজপুরীর পাহারাদার রৌপ্য ও লৌহদণ্ডধারী অনুচরবৃন্দ সহ এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করছিল। দণ্ডধারী অনুচররা পোশাকে পদস্থ ব্যক্তিদেরও হার মানাচ্ছিল। বেগুনী রংয়ের আলখাল্লা, কোমরে সোনার পট্টী এবং মাথায় জরীর কাজ করা পাগড়ী পরিহিত এই লোকগুলি রাজমহলের বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রহরী। স্বর্ণদণ্ডধারীরা কেবল বাদশাহ এবং শাহজাদাদের আদেশ পালন করত। রৌপ্যদণ্ডের অধিকারীরা মন্ত্রী এবং সমতুল্য-পদাধিকারীদেরই আজ্ঞানুবর্তী ছিল। লৌহদণ্ডধারী অন্যান্য সকলের আজ্ঞাবাহী হিসাবে সক্রিয় থাকত। রাজপ্রাসাদের সমস্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা এদেরই

হাতে থাকায় এদের ক্ষমতাও ছিল সীমাহীন।

বেলা প্রায় দুটো থেকে পদাধিকারীরা আসতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা স্ব-স্ব পদমর্যাদা অনুযায়ী বেশভূষা এবং অলঙ্কার পরিধান করে এলেন। দানিয়াল শাহ নিজের অনুচরদের নিয়ে আগেই এসে গেছেন। তারপর এলেন রাজা ভোজ সিংহ। তুর্কী পদাধিকারীরা সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাদশাহের ধাত্রীপুত্র আজীজ কোকা, খানখানা, রাজা কিশনদাস প্রমুখ সকলেই এক এক করে এসে পড়লেন। বাদশাহের আসার সময় হলো। দণ্ডধারীদের নেতা দেওয়ান-ই-আমের দিককার দ্বার উন্মুক্ত করল। সমাগত সকলে নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে এসে দাঁড়ালেন। সিংহাসনের দক্ষিণপার্শ্বে দানিয়াল শাহ নিজের আসন গ্রহণ করলেন। তাঁর কাছেই বসলেন খানখানা। প্রায় একশত পদাধিকারী সেদিন হাজির ছিলেন।

প্রায় তিনটের সময় দণ্ডধারীদের প্রধান এসে রীতি মাফিক বাদশাহের আগমনবার্তা ঘোষণা করল। সঙ্গে সঙ্গে আকবর শাহও সিংহাসন মঞ্চে পদার্পণ করলেন। চামর ব্যজনকারী দুই ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গে মঞ্চে এলো। দরবারীরাও তাঁর দিকে না তাকিয়ে আনত মুখে তিনবার মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালেন। তাঁরা এমন ভাবে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলেন যে মনে হলো তাঁরা বাদশাহের দুর্ধর্ষ প্রভাবের সামনে মাথা তোলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। আকবর শাহের পরিধানে ছিল ঢাকার মিহি মখমলের জামা এবং পায়জামা। গলদেশে একটি মুক্তমালা শোভা পাচ্ছিল। প্রতিদিনের সাধারণ পাগড়ীটাই তিনি মাথায় পরেছিলেন। পাগড়ীটির মাঝখানে একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন ঝক্ ঝক্ করে জ্বলছিল। সভার মধ্যে তাঁর উপস্থিতির প্রভাব বেশ গভীর ছাপ ফেলেছিল।

আসন গ্রহণ করেই তিনি যথারীতি বার্তালাপ শুরু করলেন, 'বল, খানখানা, দক্ষিণের কী খবর ?'

খানখানা বললেন, 'জাঁহাপনা, আপনি যে কাজ শুরু করেছেন তার সমাপ্তি শুভ না হয়ে আর কি হবে ? খান্দেশ সম্পূর্ণ অধীনস্থ

হয়েছে। আপনার সার্বভৌম শক্তির সামনে তাদের সৈন্য বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে।'

'এ খবর দূত মারফৎ পেয়েছি। আজ থেকে ঐ রাজ্যটি আমার পুত্র দানিয়ালের হল। তার নাম খান্দেশের বদলে দান-দেশ রাখলাম।'

এই ফরমান বাদশাহের দানিয়াল-পক্ষপাতের প্রত্যক্ষ পরিচায়ক ছিল। সুতরাং তাঁর পক্ষভুক্তরা সন্তুষ্ট হলেন। আকবর আবার প্রশ্ন করলেন, 'এলাহাবাদ থেকে কি খবর এসেছে?'

এর উত্তরে দানিয়াল বললেন, 'শুনলাম ভাই সাহেব এক বিরাট বাহিনী নিয়ে আগ্রার দিকে অগ্রসর হচ্ছেন।'

আকবর বললেন, 'তাই নাকি? আমার বংশধররা তাহলে সহজে হার স্বীকার করার পাত্র নয়।'

এই ভাবে অল্পক্ষণ সাধারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে দেওয়ান-ই-আম শেষ হলো। খানখানা এবং দানিয়ালকে সংকেতে কাছে ডেকে আকবর জানালেন যে সেদিন কিছু বিশেষ কথা আছে। সেইজন্য সাধারণ পদাধিকারীদের দেওয়ান-ই-খাসে আসার দরকার নেই। কে কে আসবে সে সম্বন্ধে বিশেষ আদেশ দিয়ে সেই কয়জনকেই সঙ্গে নিয়ে তিনি দেওয়ান-ই-খাসে এলেন। সিংহাসনে উপবেশন করে তিনি খানখানাকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজা পৃথ্বী সিংহ কোথায়?'

'আপনার আদেশের অপেক্ষায় বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন।'

'নিয়ে এসো।'

রাজা পীথল যথাযোগ্য বেশবাসে সজ্জিত হয়ে প্রবেশ করলেন এবং বাদশাহকে অভিবাদন করে স্বস্থানে দাঁড়িয়ে রইলেন।'

বাদশাহ বলতে আরম্ভ করলেন, 'দানিয়াল! পৃথ্বী সিংহের বিরুদ্ধে অনেক অপরাধের অভিযোগ সহ তুমি আমায় লিখেছিলে। সে সমস্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এসেছে। জালালুদ্দীন আকবরের শাসনে নিরপরাধ ব্যক্তি যেন দণ্ডিত না হয়। সঙ্গে সঙ্গে অপরাধী দণ্ডিত না হওয়াও অনুচিত। এ হচ্ছে রাজধর্ম বিরোধী। তুমি যে সমস্ত অপরাধের কথা তুলেছিলে সেগুলি বল।

তারপর পৃথ্বী সিংহের উত্তর শুনবো। এই অভিযোগের বিচার আমিই করবো। সেইজন্য তোমার যা বলার আছে, বল।'

দানিয়াল বললেন, 'পূজনীয় পিতৃদেব, আপনার আদেশানুসারে যে সমস্ত ঘটনা সম্বন্ধে আমি ওয়াকিবহাল আছি সেগুলি আপনার কাছে নিবেদন করছি। রাজা পৃথ্বী সিংহের প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। আপনি আপনার অনুপস্থিতিতে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব আমাকে, নাসির খাঁকে এবং মহারাজা পৃথ্বী সিংহকে দিয়েছিলেন। সেই সময় পৃথ্বী সিংহ আপনার সঙ্গে যে বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করেছেন তার সবটাই আপনার কাছে নিবেদন করা আমার কর্তব্য। প্রথম অভিযোগ এই যে তিনি পূজনীয় এবং মহানুভব শেখ মুহম্মদকে বিষ দিয়ে হত্যা করিয়েছেন।'

আকবর বললেন, 'এর প্রমাণ ?'

আকবরের মুখে ক্রোধের ভাব ছিল না। তিনি মৃদুহেসে বললেন, 'এবিষয় পৃথ্বী সিংহকে প্রশ্ন করার কোন দরকার নেই। শেখসাহেবের চিকিৎসা যাঁরা করেছেন সেই বৈদ্য হাকিমরা এবং তাঁর শুশ্রূষাকারীরাই প্রমাণ করেছেন যে আমার গুরু স্বাভাবিক মৃত্যুই বরণ করেছেন।'

দানিয়ালের ধৈর্যচ্যুতি ঘটছে মনে হলো। তিনি বললেন, 'জাঁহাপনা! তা হলে নাসির খাঁও ঐভাবেই মরেছেন বোধ হয় ?'

'আমার মাননীয় শ্বশুরের হত্যাকাণ্ড যে পৃথ্বী সিংহই ঘটিয়েছেন তার কি প্রমাণ তোমার কাছে আছে ?'

'প্রথম প্রমাণ তাঁদের পারস্পরিক বিদ্বেষ। দ্বিতীয় প্রমাণ ক্ষমতা লাভের জন্য তাঁদের পরস্পরের প্রতি হিংসার মনোভাব পোষণ। তৃতীয়, নগরের সমস্ত তুর্কীদের এটাই বিশ্বাস।'

'ঠিক আছে পুত্র! তুমি যে এটা বিশ্বাস করেছ তাতে আমি আশ্চর্য হইনি। কিন্তু এব্যাপারেও আমি প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করেছি।' তিনি খানখানাকে বললেন, 'শেঠ কল্যাণমলকে নিয়ে এসো।'

শেঠজী এলেন। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, 'শেঠজী, আমি জানতে পেরেছি যে আমার শ্বশুরের মৃত্যু সম্পর্কে কতকগুলি খবর আপনার জানা আছে। এখানে বলুন।'

কল্যাণমল মাথা নত করে সেলাম জানিয়ে বললেন, 'জাঁহাপনা, এই সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে যে সব কথা বলছি তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নাসির খাঁর হত্যাকারী আমার হাতে ধরা পড়েছে। আদেশ হলে তাকে এখনই হাজির করতে পারি। সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তাঁর পদমর্যাদা এবং সম্মানের কথা না ভেবেই তাঁকে হত্যা করেছে।'

'হত্যাকারীকে পরে দেখবো। আপনি যা জানেন বলুন।'

'রক্ষা করা অথবা দণ্ড দেওয়ার একমাত্র মালিক বাদশাহ সালামতের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু এই সেবকের নিবেদন এই যে পরলোকগত ব্যক্তির অপরাধের কথা আমাকে দিয়ে যেন না বলানো হয়।'

'মৃত ব্যক্তির অপরাধের কথা শোনার জন্য বলছি না জীবিত ব্যক্তিদের ধর্মাচরণ করানোর জন্যই জিজ্ঞাসা করছি। যা জানেন অসঙ্কোচে বলুন।'

'আমি যা জানি তা হচ্ছে এই, গতবছর লাহোর থেকে আসার পথে সরহিন্দের নিকটবর্তী বামুন নামক স্থানে নাসির খাঁ সাহেব চোরদের ভয়ে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে আশ্রয় নেন। দ্বিতীয় দিনে সেখান থেকে আসার সময় তিনি আশ্রয় দাতার পত্নীকে অপহরণ করে নিয়ে আসেন। গজরাজ নামক সেই ক্ষত্রিয়টি সরহিন্দের সুবেদারের কাছে অভিযোগ জানায়। তিনি অপরাধীকে চিনতে পেরে অভিযোগকারীকেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং তার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেন। এইভাবে পত্নী এবং সম্পদ হারিয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা নিয়ে গজরাজ রাজধানীতে এসেছিল। অনেক দিন কোন সন্ধানই পায়নি কিন্তু একদিন যখন ঐ সন্ধান কার্যে সে দিলপসন্দ বীথীতে দাঁড়িয়ে ছিল তখন তার পত্নীর আপহরণকারীকে হীরাজান নামক বেশ্যার বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখতে পেল। যখন তিনি রাজপথ ছেড়ে অন্ধকার জায়গায় এসে পড়লেন তখন গজরাজ নিজের প্রতিশোধ নিয়ে নিল।'

ক্রোধে আকবরের মুখ ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করল। তিনি বললেন, 'আমার শাসনে পদাধিকারী এবং ওমরাহরা কি এই ভাবেই সৎলোকেদের সঙ্গে ব্যবহার করে? নাসির খাঁ যা করেছেন তা যদি সেলিমও করত

তাহলেও আমি ভয়ঙ্কর দণ্ড দিতাম। নাসির খাঁ আমার শ্বশুর ছিলেন। একজন বিচক্ষণ সৈনিক ছিলেন এবং একজন যোগ্য কর্মচারী ছিলেন। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্য হয় তবে তিনি যে শাস্তি পেয়েছেন তাতে আমার কোন দুঃখ নেই। কল্যাণমল, এসবের প্রমাণ আছে?'

'আদেশ হলে নাসির খাঁ কর্তৃক অপহৃত মহিলা এবং তাঁর পতিকে হাজির করি।'

আকবর ভেবে নিয়ে বললেন, 'তার প্রয়োজন নেই। ঐ স্ত্রীলোকটির স্বামীকে তার সমস্ত সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়া হোক। ক্ষয়ক্ষতির জন্য তাকে আরও দশহাজার টাকা দেওয়া হোক।'

'বাদশাহ আকবর লোকোত্তর পুরুষ।' মানুষের এই বিশ্বাস অসার্থক নয়। সেলাম জানিয়ে কল্যাণমল চলে গেলেন।

আকবর শাহ আবার দানিয়ালকে প্রশ্ন করলেন, 'দানিয়াল, তোমার আর কিছু বলার আছে?'

দানিয়াল বললেন, 'আমি যা নিবেদন করবো তা আমার স্বচক্ষে দেখা ঘটনা। পৃথ্বী সিংহ এই ঘটনা অস্বীকার করতে পারবেন না। ইনি আপনার নির্দেশ অমান্য করে রাজদ্রোহীদের সঙ্গে মিশে ষড়যন্ত্র করেছেন। রাজদ্রোহীকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছেন। আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে এঁর দুর্বুদ্ধি এবং রাজদ্রোহীতা।'

'তুমি রাজদ্রোহ কাকে বলো?'

'বাদশাহ সালামতের বিরুদ্ধে যাই করা হোক না কেন তাই রাজদ্রোহ। ভাইসাহেব সেলিম আগ্রা আক্রমণের জন্য সসৈন্যে এসে ছিলেন। সেই সময় ইনি নিজের ঘরে বসেই তাঁর সঙ্গে শলা পরামর্শ করে ছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করুন। ওঁর বিরোধীতা করার জন্য আমি যখন সেখানে গিয়েছিলাম তখন দুজনে মিলে আমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেছিলেন তাও বলুন।'

পৃথ্বী সিংহ বললেন, এসমস্ত কি সত্য?'

শীথল এতক্ষণ সমস্ত কথার সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার তিনি অসঙ্কোচে বললেন, 'দয়ালু এবং আশ্রিত রক্ষক বাদশাহ সালামত!

সেবকের সবিনয় নিবেদন শুনুন। শাহজাদা যা বললেন সবই সত্যি। নগর অবরোধ করার আগে সেলিমশাহ আমার কাছে এসেছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন যে আগ্রা শহর আমি তাঁর হাতে ছেড়ে দেবো। আমি বলেছিলাম, বাদশাহ সালামতের মুদ্রাঙ্কিত পত্র নিয়ে আসুন আমার কোন আপত্তি নেই। অন্যথায় আমার শরীরে প্রাণ থাকতে আগ্রাকে কারো হাতে সমর্পণ করা হবে না। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন যদি আমি আক্রমণ করি? আমি বলেছিলাম, নগর রক্ষা করা হবে। এই সময় দানিয়াল শাহ সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে বললেন, সেলিমকে বন্দী করা হোক। শাহজাদাকে বন্দী করার অধিকার আমি পাইনি, কেবল রাজধানী রক্ষা করার দায়িত্বই আছে আমার, এইকথা আমি বলতেই শাহজাদা দানিয়াল ক্রুদ্ধ হয়ে আমাকে অত্যন্ত খারাপ ভাষায় গালাগালি দিয়েছিলেন। সেলিম শাহ এই সব শুনে তাঁর হাতের চাবুক দিয়ে শাহাজাদার মুখে প্রহার করেছিলেন। এসমস্ত সত্য কথা। সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্য যে সে সময় শাহজাদার হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে ছোট্ট শিশুর মত কাঁদতে কাঁদতে ক্ষমাও চেয়েছিলেন।'

'দানিয়াল তাহলে মার খেয়ে চুপ করে রইল?'

'বলতে সঙ্কোচ বোধ করছি! যন্ত্রণায় পা ধরে ক্রন্দমান দানিয়াল শাহকে দেখে শাহজাদা সেলিম আমাকে বললেন, 'পীথল, পিতাজীকে এ কথা নিবেদন করতে ভুলো না যে ভারত সম্রাট হওয়ার আমি উপযুক্ত।'

যথেষ্ট সংযমের সঙ্গে বাদশাহ হাস্য রোধ করলেন। সেলিমের আন্দাজ মত তীর ঠিক লক্ষ্যে গিয়েই বিদ্ধ হলো। আগেই আকবরের আশঙ্কা ছিল যে দানিয়াল কাপুরুষ। তবুও তৈমুরের বংশে যে এতখানি ভীরুতা দেখা দেবে এটা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নি। সেলিমের যত দোষই থাক না কেন, ধৈর্য, শক্তি এবং সাহসে তিনি ছিলেন অগ্রগণ্য। বুদ্ধিমান শাহজাদা যে এই খবরের মধ্য দিয়ে তাঁর পক্ষপাতিত্বকে ব্যঙ্গ করেছেন এ কথা বাদশাহ বুঝলেন। তিনি বললেন, 'দানিয়াল! এসব কি সত্য?'

লজ্জায় দানিয়াল মুখ নীচু করে রইলেন। ক্ষণকালের জন্য চুপ করে আকবর বললেন, 'রাজধানীতে থেকে থেকে তুমি নরম প্রকৃতির

হয়ে গেছ। রাজাদের পক্ষে এ জিনিস উপযুক্ত নয়। আমার সন্তানদের নিবাস তো যুদ্ধক্ষেত্রে। তোমাকে দাক্ষিণাত্যের বাহিনীর উপনায়ক নিযুক্ত করছি। সত্বর রওনা হতে হবে।'

সকলেই অনুমানে বুঝলেন যে এ আদেশ প্রকারান্তরে নির্বাসন। সভাসদরা এই আদেশ সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন এমন সময় বাদশাহ পীথলকে বললেন, 'আমার পরম বন্ধু; এই সমস্ত মিথ্যা অভিযোগে বিশ্বাস স্থাপন করে আমি তোমাকে বন্দী করে রেখেছিলাম এমন কথা ভেবে দুঃখিত হয়ো না। এক মুহূর্তের জন্যও এসব কথা আমি বিশ্বাস করিনি। আমি জানি, সুনামকে আপনি প্রাণের চেয়ে দামী মনে করেন। সেই জন্য এইসব অভিযোগগুলির রূপকে স্পষ্ট করে দিয়ে তোমার কীর্তিকে বাঁচানো আমার কর্তব্য ছিল। সেই সময়ই আমি এগুলিকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দিতে পারতাম কিন্তু শক্তিবান লোকেরা যখন গুজব ছড়ায় তখন শীঘ্রই তা লোকের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। তোমার সুনাম এ পর্যন্ত নিষ্কলঙ্ক নির্মল রয়েছে। এ ঘটনা তার উপর একটি কলঙ্কের ছাপ হয়ে থাকত। তাকে বাঁচানোর জন্যই আমি এসব করেছি। তোমার মর্যাদার উপযুক্ত খেতাব এবং রত্নভাণ্ডার থেকে আমার নিত্য ব্যবহার্য রত্নহার তোমাকে আমি পুরস্কার হিসাবে দিচ্ছি। গ্রহণ কর।'

পীথল প্রানত হয়ে বাদশাহকে সেলাম জানিয়ে বললেন, 'আশ্রিত বৎসল প্রভু! আপনার ন্যায়পরায়ণতা এবং ধর্মনিষ্ঠা সর্বজন বিদিত। আপনার এই উদারতার জন্য আমি আপনার কাছে এবং এই সিংহাসনের কাছে ঋণী রইলাম। আজ পর্যন্ত আমি আপনার আদেশকে ঈশ্বরের আদেশ বলে মান্য করেছি। সেক্ষেত্রে কোথাও যদি কোন ত্রুটি হয় হয় তাহলে আপনার ক্ষমাশীলতাই আমাকে রক্ষা করবে।'

এই সময় এক দ্বাররক্ষী এসে জানালো যে সেলিম শাহের কাছ থেকে একজন বার্তাবহ এসেছে। ঐ দূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবাদ দিয়ে আসার জন্য খানখানাকে পাঠানো হল।

সমীপবর্তীদের উদ্দেশ্য করে বাদশাহ বললেন, 'আমার একরোখা

ছেলে এইবার কিছু করতে যাচ্ছে? আমি জানি ওর মধ্যে রাজোচিত গুণের সমারোহ রয়েছে। ভারত সাম্রাজ্যকে, শাসন করার যোগ্য রাজনীতিবোধ এবং ধৈর্য ও বীর্য ওর মধ্যে আছে। কিন্তু আমার খেদ এই কারণে যে ও বিবেকবান নয় এবং কঠোর দণ্ডদানেও সিদ্ধহস্ত।'

মহারাজ ভোজ সিংহ উত্তর দিলেন, 'আপনার বক্তব্য সম্পূর্ণ সত্য। এই দোষগুলি না থাকলে সেলিম শাহ হতেন দ্বিতীয় আকবর। কিন্তু আমি বলি কি, সেলিম শাহের তুলনা সাধারণ মানুষেরই সঙ্গে হওয়া উচিত, দৈবশক্তিসম্পন্ন এক অলৌকিক সম্রাটের সঙ্গে নয়।'

বাদশাহের নিজের বক্তব্যের সঙ্গে একমত না হওয়ার মত স্বাতন্ত্র্যবোধ ভোজ সিংহকে বিশেষ সম্মানের পাত্র করেছিল। আকবরের উত্তর শোনার জন্য অন্যেরা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলেন।

আকবর বললেন, 'আপনার বক্তব্যের অর্থ আমি বুঝতে পেরেছি। আমিও তাই ভেবেছিলাম। এখানে এখন আমার বিশ্বস্ত মিত্ররাই রয়েছেন। আপনারা সকলে রাজনীতিতে সুপণ্ডিত। আমি একটি প্রশ্ন করছি। রাজ্য শাসনের ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডদানকারী, ক্রোধী এবং হঠকারী রাজা শ্রেষ্ঠ অথবা শান্ত, নীতিনিপুণ এবং ন্যায়নিষ্ঠ রাজা শ্রেষ্ঠ? যুবাবস্থায় আমি মনে করতাম একজন রাজার পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ হচ্ছে ধৈর্য, পরাক্রম এবং সাহস প্রভৃতি। আজ আমি সে কথা অতটা মানি না। হিন্দুরাজধর্মেও অর্জুন এবং ভীমসেনের চেয়ে ধর্মপুত্রকেই যোগ্যতর বলে মানা হয়েছে। এই ব্যাপারে আমার মনে হয় রাজাদের শান্ত ও সহনশীল হওয়া উচিত।'

কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইলেন। পরে ভোজ সিংহ বললেন, 'আপনার কথা ঠিক। দৃঢ়ভিত্তিক রাজ্য, চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত রাজবংশের রাজা দুর্বল হওয়া সত্বেও শান্ত, নীনিনিপুণ এবং ক্ষমাশীল হলেও কাজ চলতে পারে, কিন্তু...'

আকবর বললেন, 'কথা শেষ করুন। ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য দৃঢ়ভিত্তিক নয়, তাই না?'

ভোজ সিংহ বললেন, 'আপনার গুণ-গরিমা, নীতিনৈপুণ্য এবং

বাহুবলের জন্য বর্তমানে তা সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু একথা বলা নিষ্প্রয়োজন যে সব সময়ের জন্য এই রকম থাকবে এই আশা আমরা এখনই করতে পারিনা। পরাজিত রাজাদের শক্তি অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়নি এবং নতুন মিত্রদের শ্রদ্ধা ও ভক্তির স্থিরতাও আসেনি। এই অবস্থায় যতই গুণবান হোন না কেন, দুর্বল সম্রাট……'

আকবর বললেন, 'ঠিক! পীথল, আপনার মতামত কি?'

পীথল বললেন, 'মহানুভব বুঁদি মহারাজের পরামর্শের উপর আমি আর কী বলব? আমার বুদ্ধিতে মনে হয় তাঁর কথা পুরোপুরি সত্য।'

ইতিমধ্যে খানখানা দরবারে ফিরে এলেন। বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, 'সেলিমের বক্তব্য কি?'

'সেলিম শাহ বিনয়াবনত হয়ে লিখেছেন যে, পূজনীয় পিতার প্রতি যে অপরাধ তিনি করেছেন তার গুরুত্ব তিনি উপলব্ধি করেছেন। ভবিষ্যতে আপনার আদেশ পূর্ণরূপে প্রতিপালনের আশ্বাস তিনি দিচ্ছেন। এপর্যন্ত যা ঘটেছে তারজন্য তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। রাজমাতা মহারাণীর আদেশের অনুবর্তী হয়ে তিনি পিতৃদেবকে প্রণামের উদ্দেশ্যে আগ্রা আসছেন।'

আকবর বললেন, 'আজ সবদিক থেকে আমাদের শুভদিন। যথাসময়ে সেলিমের যে সুবুদ্ধি ফিরে আসবে এ আমি জানতাম। সারা রাজ্যে ঢোলসহরতে এ খবর প্রচার করে দাও। সেলিমের সব অপরাধ মাফ করে দেওয়া হল। দূত পাঠিয়ে তাকে সত্বর আগ্রায় আসার সংবাদ দাও। আম্মীজানকে এ সংবাদ জানানোর জন্য এখনই লোক পাঠানো হোক।'

সেলিমের ক্ষমা প্রার্থনায় বাদশাহ অসীম আনন্দলাভ করলেন। গাম্ভীর্যপূর্ণ আকবরের মধ্যে আনন্দ, স্নেহ প্রভৃতি ভাবের এত প্রত্যক্ষ প্রকাশ আর কখনও দেখা যায়নি। একটি মহা সঙ্কট দূর হলো বলে সভাসদরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

আদেশ অনুযায়ী রাজধানীতে এই সংবাদ ঘোষণা করে দেওয়া হলো। দরবার শেষ করে বাদশাহ উঠতে যাবেন এমন সময় দ্বাররক্ষীদের

প্রধান এসে খবর দিল যে শেখ আবুলফজলের কাছ থেকে লোক এসেছে।

অনুমতি পাওয়া মাত্র দলপতি সিংহকে দরবার কক্ষে হাজির করা হলো। তাঁর অবস্থা, পোশাক প্রভৃতি দেখে বাদশাহ কিছুটা বিচলিত হলেন। ধূলি-মলিন পোশাক থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান ছিল যে তিনি বহু দূরের পথ অতিক্রম করেছেন। দেহের স্থানে স্থানে পট্টি বাঁধা ছিল। এতে বোঝা গেল যে সোজা যুদ্ধক্ষেত্র থেকেই আসছেন।

আকবর প্রশ্ন করলেন, 'আমার বন্ধু শেখের কী সংবাদ?'

দলপতি বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করুন, আমি একটি অত্যন্ত মর্মান্তিক সংবাদ এনেছি। শেখ সাহেব……।'

আকবর বললেন, 'সত্বর বল। শেখের কী হয়েছে?'

দলপতি সিংহ বললেন, 'পথে আততায়ীরা তাঁকে হত্যা করেছে।'

মুহূর্তের জন্য আকবর নির্বাক হয়ে গেলেন। বাদশাহ এইবার কী করবেন ভেবে দিশাহারা সভাসদবৃন্দও নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ধীরতার প্রতিমূর্তি আকবরের মুখ থেকে কেবল একটি মাত্র শব্দ নির্গত হলো, 'ইয়া ইলাহি।'

নিদারুণ দুঃখকে দমন করে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রের দন্ত উৎপাটক কে সেই দুঃসাহসী? আমার মন্ত্রী এবং বন্ধু আবুলফজলের হত্যাকারী সেই দুর্বৃত্ত কে? শীঘ্র বল।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'ওরছা-রাজ বীরসিংহ বুঁদেলার বড় একটি বাহিনী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করেছিলন। দেহে চৌদ্দটি আঘাত পাওয়ার পর শেখ সাহেব বীর গতি প্রাপ্ত হয়েছেন।'

'তারা কি হঠাৎ আক্রমণ করল?'

'না, তারা পথে তৈরী হয়ে ছিল। এই সংবাদ সেবক স্বয়ং শেখ সাহেবকে দিয়েছিল। এ কথাও বলেছিলাম যে তারা নরবরের কাছে পথরোধ করে রয়েছে। সুতরাং কয়েকদিন উজ্জয়িনীতে থেকে যাওয়াই ঠিক হবে। কিন্তু কোন অবস্থাতেই বাদশাহের আদেশ অমান্য করবেন না বলে তিনি যাত্রা করলেন। সঙ্গী তিন শত সৈনিকের সকলেই নিহত হয়েছে। হতভাগ্য আমিই কেবল জীবিত আছি।'

'আক্রমণকারী যে বুঁদেলা তা তুমি কি করে জানলে?'

'শেঠজীর কাছ থেকে আমি শুনেছিলাম। তাঁর দূত হিসাবেই আমি শেখ সাহেবের কাছে গিয়েছিলাম।'

এর পর মহারাজ ভোজ সিংহ বললেন, 'বাদশাহ সালামত করুণা করুন। এই যুবক পৃথ্বী সিংহের দেহরক্ষী। আমি শুনেছিলাম যে কোন শত্রুতার কারণে বুঁদেলা শেখ সাহেবকে আক্রমণ করবে। এ কথার মধ্যে কতটুকু সত্য আছে জানা সম্ভব ছিলনা। শুধু গুজবও হতে পারে। যা-ই হোক, শেখ সাহেবকে জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করে কল্যাণমল এবং আমি এই যুবককে পাঠিয়ে ছিলাম।'

আকবর বললেন, 'এই ভয়ঙ্কর কাজটি বুঁদেলা নিজেই না অন্য কারো প্ররোচনায় করেছে? জালালুদ্দিন আকবর এই শপথ করে বলেছে যে, যে কোন ব্যক্তিই একাজ করে থাকুক না কেন, তাকে শাস্তি না দিয়ে আমি ছাড়বো না। পৃথ্বি সিংহ, বুঁদেলাকে ধরে আনার দায়িত্ব তোমার উপর রইল। সে শেখ সাহেবকে হত্যা করেছে বলে আমি মনে করছি না, প্রকৃতপক্ষে আমার রাজতন্ত্রের উপরই সে ঘাতকের খড়্গ হেনেছে। আর দেরি কোরো না, বুন্দেল খণ্ড আমার শক্তির পরিচয় লাভ করুক।'

অসহ্য ক্ষোভে দুঃখে বাদশাহ আকবর সিংহাসনের উপরেই মাথা নীচু করে বসে রইলেন। তারপর উঠে নীরবে ভিতরে চলে গেলেন। সেদিনের দরবার সমাপ্ত হলো।

দরবার ত্যাগ করে বাদশাহ অন্তঃপুরে না গিয়ে পীথলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য ব্যবস্থা করার জন্য 'গুসলখানায়' গেলেন। দারুণ এই দুঃখের দিনেও কর্তব্য বিমুখ তিনি হননি।

গুসলখানায় প্রবেশ করেই তিনি কল্যাণমলকে ডেকে পাঠালেন। তিনি এসে অভিবাদন করতেই বাদশাহ প্রশ্ন করলেন, 'বন্ধুবর, আজকের দুঃসংবাদ তো আপনি জেনেছেন। এই অবস্থাও আপনি আমাকে ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন?'

কল্যাণমল তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'জাঁহাপনা। যতদিন আপনার

প্রয়োজন ততদিন আমি এখানে থাকব। আমার ইহলোকের সমস্ত বন্ধনই আপনার কৃপায় এক এক করে কাটছে। আমাদের ধর্মানুসারে এইবার আমার সন্ন্যাস নেওয়ার সময় হয়েছে।'

'হায়! আমিও যদি পারতাম! আপনি ভাগ্যবান। মুক্ত! জগতের কোন বন্ধন নেই। তবু, ভালবাসার মানুষকে দুঃখের দিনে কি ছেড়ে যেতে হয়? আবুলফজল তো আর নেই। আমার বন্ধুদের মধ্যে আপনি ছাড়া আর কে রইল?'

'আপনার আদেশে আমি আমার সিদ্ধান্তকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখছি। এটা আমার কর্তব্যও বটে। সন্ন্যাস নেওয়ার জন্য অরণ্যে যাওয়ার দরকার নেই। কিন্তু সংসারের বাঁধনে বাঁধার মত কাজগুলি থেকে আমায় মুক্ত হতে হবে।'

'কী কাজ আছে? আপনার ইচ্ছাগুলি এখনই আমি পূরণ করিয়ে দিচ্ছি। তারপর এই জগতে শুধু আমারই সঙ্গে আপনার বন্ধন থাকবে। এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও নিঃসঙ্গ আমার পক্ষে এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে?'

'সবার আগে সেই মেয়েটির বিবাহ। তার পিতা······'

'ছত্র সিংহ শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে লড়েছেন। কিন্তু তিনি যে একজন বড় বীর ছিলেন, একথা মানতেই হবে। তাঁর কন্যার বিবাহ আপনি কার সঙ্গে দিতে চান?'

'আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে। শেখ সাহেবের খবর নিয়ে সে-ই আজ দরবারে এসেছিল।'

'আমার মত আছে। যুবকটিকে আমি এক হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করছি। আর কী?'

'আর একটি নিবেদন আছে। রামগড়ের কথা আপনার জানা আছে। সুবেদারের কোন অভিসন্ধির ফলে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র সেখান রাজত্ব করছিল? সে দুশ্চরিত্র এবং বীরসিংহ বুঁদেলার পরম বন্ধু ছিল। শেখ সাহেবের সঙ্গে যুদ্ধে সে নিহত হয়েছে। আমার পুত্র না থাকায় দলপতি সিংহই এখন রাজ্যের উত্তরাধিকারী। সেই জন্য

রাজ্যটি কৃপা করে তাকেই দিন।'

'সেটাই ন্যায়সঙ্গত হবে। ছেলেটিকে ডাকুন।'

দলপতি সিংহ বাদশাহের সামনে এলে তিনি বললেন, 'আবুলফজলের প্রাণ রক্ষার জন্য তুমি যা করেছ তাতে আমি কৃতজ্ঞ। দেহের ক্ষতচিহ্নগুলিই তোমার বীরত্বের পরিচয় দিচ্ছে। আমি তোমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছি। তুমি কী চাও বল?'

'জাঁহাপনা বাদশাহ সালামতের কৃপা ছাড়া আর কিছু চাই না।'

'তুমি যোগ্য প্রত্যুত্তরই দিয়েছ। তবু আমি নিজের প্রসন্নতার প্রতীক হিসাবে তোমাকে এক হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করছি। রামগড় তোমারই; সুতরাং তা তোমাকে ফেরত দিচ্ছি।' ভাবাবেগে দলপতি সিংহ কিছু বলতে পারলেন না। তিনি নতশিরে বাদশাহকে অভিবাদন জানালেন।

বাদশাহ বললেন, 'এঁর চরণে প্রণাম জানাও। তোমার সৌভাগ্যের মূলে ইনি। রামগড় তোমাকে দান করার অধিকারী ইনিই। রাজত্ব ভোগ যে কষ্টকর একথা স্বীকার করার লোকের অভাব নেই কিন্তু রাজ্য ত্যাগ খুব কমলোকই করতে পারে। নিজের মহানুভব পিতৃব্য এবং রামগড়ের প্রকৃত রাজা অজিত সিংহকে প্রণাম করো।'

'অজিত সিংহ' নামটি শোনা মাত্র দলপতি সিংহ যে রকম বিস্মিত হলেন তার বর্ণনা করা কি সম্ভব! অবশ্য অনেকগুলি কারণে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে কল্যাণমল একজন সাধারণ জহুরী নন। প্রধান ওমরাহ এবং রাজামহারাজাদের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব, তাঁর প্রতি সকলের প্রগাঢ় ভালবাসা, বাদশাহের সম্মান প্রভৃতি এমন কতকগুলি জিনিস ছিল যা একজন ব্যবসায়ী মাত্রের পক্ষে সুলভ নয়। তখনকার দিনে রাজ্যচ্যুত রাজাদের অভাব ভারতে ছিল না। দলপতি সিংহ আন্দাজ করেছিলেন যে তিনিও সেই সমস্ত রাজাদের মধ্যে একজন। কিন্তু তাঁর বিনয় এবং রাজনীতির প্রতি উদাসীনতার ফলে তিনি স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি। শেষ পর্যন্ত তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আর্থিক-ক্ষমতা, স্বভাবগুণ এবং পরোপকারে তৎপরতার ফলেই তিনি এই মর্যাদার

অধিকারী হয়েছেন। বিস্ময়কর আনন্দের অনুভূতিতে স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বাদশাহের সামনে অন্য কারো সঙ্গে বাক্যালাপ না করার আদবকায়দা দলপতি সিংহের জানা থাকায় বাদশাহের মুখ থেকে ইনিই যে তাঁর পিতৃব্য সেকথা জেনে তাঁরই অনুমোদনে শেঠজীকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে উদ্যত হলেন। তাকে বিরত করে কল্যাণমল বললেন, 'বাদশাহ সালামতের সামনে অপর কাউকে প্রণাম জানানো হয় না।' তিনি তাঁকে বক্ষলগ্ন করে আলিঙ্গন করলেন।

বাদশাহ বললেন, 'এখন আপনাদের নিজেদের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা করে নিতে হবে।'

এই কথাকে আদেশ মেনে তাঁরা দুজন বাদশাহকে অভিনন্দনান্তে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দ্রুতগতিতে পথ পরিক্রমা করে শীঘ্রই তারা বাড়ি ফিরলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাতরত ভ্রাতুষ্পুত্রকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে কল্যাণমল বললেন, 'তোমার মনে নিশ্চয় এই প্রশ্ন আসবে যে কেন আমি তোমার কাছে এই সমস্ত কিছু গোপন করেছি। আমার প্রকৃত অবস্থার কথা কেবলমাত্র চারজন ব্যক্তিই জানেন, রাজা ভোজসিংহ, পীথল, বাদশাহ এবং মহারাণী দুর্গাদেবী। ভোজ সিংহ প্রথম থেকেই আমার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তিনি বাদশাহকে জানিয়েছিলেন। সরাসরি প্রশ্ন করায় পীথলকেও বলতে হয়েছিল। আমি দেবীর সামনে প্রতিজ্ঞা করেছি যে নিজেকে আর কখনও রামগড়ের রাজা বলে স্বীকার করবো না এবং পরিচিতও হবো না। সেইজন্য ওকথা কোনদিন আমি কাউকে বলিনি। তোমার মনে আমার প্রতি ভালবাসা, শ্রদ্ধা এবং আমার হাতে রাজ্য সমর্পণের আগ্রহ দেখে আমি মনে করেছি যে যদি কিছুটা বাস্তব জ্ঞান তোমাকে দিতে পারি তাহলে দুজনেই শান্তি পাবো।'

দলপতি সিংহ আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'এমন আদেশ করবেন না, তাত! আপনার হাতে রাজ্যভার সমর্পণ করাই পিতার অন্তিম ইচ্ছা ছিল। আপনার সেবায় জীবন উৎসর্গ করার বরই আমি আপনার কাছে থেকে প্রার্থনা করছি।'

'বাদশাহ চেয়েছিলেন যে রামগড় শাসন করি। কিন্তু আজ পর্যন্ত তা

আমি স্বীকার করিনি। এখন বিদায় নেওয়ার সময় সমাগত, এখন কি ভাবে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব স্বীকার করি? বৃদ্ধাবস্থায় সাধুর জীবন যাপনের কথা আমাদের ধর্মে আছে। আমি সেই মত অনুসরণ করবো।'

'তবুও আপনাকে সেবা করার অনুমতি আমাকে দিন।'

'কুলধর্মকে তুমি বিস্মৃত হচ্ছো। রাজ্য শাসনের কষ্ট স্বীকার ক্ষত্রিয়দের ধর্ম। পুত্রকে রাজ্যভার সমর্পণের পূর্বে রাজা সন্ন্যাস নিতে পারেন না। যোগ্য পুত্র আমি লাভ করেছি। সুতরাং আমি সন্ন্যাস নিতে পারি। কিন্তু তোমার সময় এখনও আসেনি। বাদশাহের আদেশও তোমার পক্ষে অলঙ্ঘনীয়।'

'প্রকৃত রাজা বর্তমান থাকতে রাজ্য আমি বাদশাহের হাত থেকে কি ভাবে নিতে পারি?'

'সেই কথাই বাদশাহ বলছিলেন। রাজ্য তুমি আমার কাছ থেকে নিচ্ছ। নিজের রাজ্যের ভার আমি তোমার হাতে অর্পণ করছি। আমার কোন পুত্র না থাকায় তুমিই উত্তরাধিকারী। সুরজমোহিনী এবং তার দিদিমাকেও এইবার আমি তোমার হাতে সমর্পণ করছি। সর্ব ঋণ হতে আজ আমি মুক্ত। এই ছিল আমার আকাঙ্খা। এইবার সুরজমোহিনী সম্বন্ধে বলছি। সীতাপুরীর রাজা ছত্র সিংহের কথা কি জান?'

'প্রতাপ সিংহের সঙ্গে আকবরের বিরুদ্ধে যে বীর যুদ্ধ করেছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনিই। তিনি ছিলেন আমার পরমবন্ধু। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি তাঁর স্ত্রীকে আমার আশ্রয়ে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর পাটরাণীর জননী হচ্ছে দুর্গাদেবী এবং কন্যা সুরজ মোহিনী। তাঁর মৃত্যু সংবাদে মর্মাহত সতী বিষপান করে আত্মহত্যা করেছিলেন। শৈশব থেকেই সুরজ আমার কাছে রয়েছে। তার রাজ্য এখন অন্যের হস্তগত। আত্মীয় স্বজন দুর্বল, পরজীবীতে পরিণত হয়েছে। এই সব কারণে সুরজমোহিনী আমার অতি আদরের মেয়ে। রামগড় রাজ্যের মত তাকেও আমি তোমার হাতে সঁপে দিচ্ছি।'

'এসমস্তই আপনার আশীর্বাদ।'

'মহারাণী দুর্গাদেবী এবং সুরজমোহিনীকে আনার জন্য লোক

পাঠিয়েছি। এসব শুনে তাঁরা খুবই আনন্দিত হবেন। ভাই-এর মৃত্যুর কারণে তোমার বিয়ের কিছুটা বিলম্ব হবে। ততদিন ওরা আমার কাছেই থাকবে। সন্ন্যাস নেওয়ার ব্যাপারেও আমাকে ততদিন অপেক্ষা করতে হবে। এখন আমার দীক্ষা নেওয়া বাদশাহও চাইছেন।'

পিতৃব্যকে নিজ সিদ্ধান্তে অটল দেখে দলপতি সিংহ আর কিছু বলতে পারলেন না।

শেঠজী আবার বললেন, 'এইবার তুমি সত্বর পৃথ্বী সিংহকে প্রণাম করে এসো। ঈশ্বরের অনুগ্রহেই তুমি এমন প্রভুর সেবা করার সুযোগ লাভ করেছ। দু চার দিনের মধ্যেই তিনি বুঁদেলার সঙ্গে যুদ্ধার্থে যাত্রা করছেন। বাদশাহ এখন তোমাকে এক হাজারী মনসবদার নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং তোমার পুরানো চাকরি শেষ হয়েছে। তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে তোমার কল্যাণার্থে তিনি যা করেছেন তার জন্য আমার পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ দিও। ভোজ সিংহের সঙ্গে দেখা করতেও ভুলোনা। তিনি কেন যে তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়েছিলেন তার কারণ বোধ হয় এখন তুমি বুঝতে পারছ। একটু বিশ্রাম করে কাজ আরম্ভ করো।' কল্যাণমলের নির্দেশ অনুযায়ী দলপতি সিংহ গৃহে ফিরে গেলেন। স্নান-ভোজন ইত্যাদি সেরে সেই রাত্রে তিনি বিশ্রাম করলেন। সকালে তিনি পৃথ্বীর কাছে গেলেন। মহারাজা যুদ্ধ যাত্রার আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন। দলপতি সিংহকে দেখে তিনি উঠে এসে তাঁকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন। তিনি বললেন, 'আপনার সৌভাগ্যে আমি আনন্দিত। কাল রাত্রে শেঠজী আমাকে সব বলেছেন।'

দলপতি সিংহ বললেন, 'আগেই এসে সমস্ত কথা আপনাকে না জানানোর জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। কিন্তু কাল রাত্রে আপনি সব জেনেছেন শুনে আশ্চর্যান্বিত হলাম।'

'একটা কথা এখন তোমায় বলার আছে, এটা শেঠজী আমার উপরই ছেড়ে দিয়েছেন। আমি যা বলতে যাচ্ছি তা তোমার জানা দরকার। এই রাজধানীতে একটি গুপ্ত সমিতি আছে। তোমার পিতৃব্য তার নেতা। হিন্দুধর্মের সংরক্ষণ হচ্ছে তার উদ্দেশ্য। এই সংঘের

প্রতিষ্ঠাতা এবং পরিচালক তিনিই। আমরা সকলে এর অন্তর্ভুক্ত এবং এর নির্দেশ মেনে চলি। মুসলমানদের হাতে নিগৃহীত স্ত্রীলোকদের রক্ষাই ছিল প্রথমে এর উদ্দেশ্য। কিন্তু এখন হিন্দুরাজ্যগুলিকে আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করা, হিন্দু নারীদের মর্যাদারক্ষা, হিন্দুধর্মের বিরোধীতার প্রতিরোধ করা প্রভৃতিও এর আদর্শের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যের সর্বত্র এর শক্তি বিস্তার লাভ করেছে। রাজধানীর সমস্ত হিন্দু পদাধিকারীই এই সংগঠনের সদস্য। অন্য রাজকার্যে এই সংঘ হস্তক্ষেপ করে না। ফলে বিভিন্ন দলভুক্ত লোক এর মধ্যে ঐক্যমতে কাজ করতে পারে।'

'এর নেতা কে? কার নির্দেশে এটা চলে?'

'নেতা বলতে আমরা পাঁচ জনকেই জানি। প্রধান নেতা শেঠজী, তার পর ভোজ সিংহ, দীনদয়াল, আমি এবং যে চুড়িওয়ালাকে তুমি দেখেছিলে, সে। সঙ্ঘের নির্দেশ চুড়িওয়ালার মাধ্যমে প্রচারিত হয় বলে কেউ টের পায় না।'

'এই সমস্তের নেতা তাহলে আমার পিতৃব্য?'

'উনি সাধারণ মানুষ নন, দিব্য পুরুষ। উচ্চপদের সম্মান নিয়ে দরবারের শোভা বর্ধনের জন্য বাদশাহ ওঁকে কতবার অনুরোধ জানিয়েছেন। উনি তাতে স্বীকৃত হননি। একটি মাত্র কাজে ওঁর সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল। তার জন্য উনি সদাতৎপর ছিলেন। ওঁর অনুগ্রহেই আমরা এতখানি সম্মানিত হয়েছি।'

'আমি কত ভাগ্যবান! কিন্তু এমন মহান শাসক লাভের সৌভাগ্য রামগড়ের হলোনা। অথবা হিন্দুধর্মের রক্ষায় সঙ্কল্পবদ্ধ এই মহাপুরুষের কাছে রামগড় রাজ্য কত তুচ্ছ!'

'তোমার কথা বাস্তবিকই সত্য। এখন কিন্তু উনি ঐ সঙ্ঘ থেকেও নিজেকে মুক্ত করছেন। নিজের সমস্ত কর্তব্য পুত্রের হাতে সমর্পণ করে তিনি সন্ন্যাস নিতে চান। এই তো প্রকৃত ধর্ম। সেই জন্য আমাদের দলে তোমাকে সম্মিলিত হতে হবে। তাঁর স্থলে রাজা ভোজ সিংহ কাজ কর্ম পরিচালনা করবেন।'

'তাঁর এবং আপনার ইচ্ছা আমার কাছে তো আদেশের সমতুল্য।'

'তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হবো। ভাল, এইবার তো শীঘ্রই তুমি রামগড় যাবেন। রাজ্য পরিচালনায় জড়িয়ে থেকে চিরকাল সুখে বাস করবে।'

'সে রাজ্য তো আপনারই প্রভু। আপনি বুন্দেলখণ্ড যাচ্ছেন। একদিনের জন্য রামগড়ে এসে অনুগৃহীত করবেন না?'

'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যদি না-ও যাই, আমার মেয়ে মোহিনীকে দেখতেও কি যাবো না?'

'এখন তো তুমি খুব ব্যস্ত থাকবে। দেরি করবে না। একটি কথা সর্বক্ষণ মনে রাখবে, পৃথ্বী সিংহের স্নেহ অচঞ্চল। আমার আশীর্বাদ রইল।'

পরস্পর আলিঙ্গনের পর বিদায়ের সময় দলপতি সিংহের চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝিকমিকিয়ে উঠলো। দেশে ফেরার আদেশ শীঘ্রই আসছে জেনে যাঁর যাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা দরকার তাঁদের সবার কাছেই তিনি গেলেন। প্রণাম করে ভোজ সিংহের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার সময় তিনি তাঁর হাতে একটি লোহার বালা পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই বলয়ের কথা সব সময় খেয়াল রেখো। এর উপর শ্রীচক্রের পূজা করা হয়েছে। এর ধারক তুমি, হিন্দু ধর্ম রক্ষায় তুমি বাধ্য। এই চিহ্ন দেখিয়ে ভারতে তোমার আদেশ পালন করতে প্রস্তুত এমন অনেক ব্যক্তিকে পাবে। এর শক্তিকে নিজের স্বার্থে বা দুষ্কার্যে লাগাবে না।'

গুল আনারাকে দলপতি সিংহ ভোলেন নি। এই স্বল্প সময়ের অবসরে তাঁদের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক প্রেমের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। দলপতি সিংহের সম্মানবৃদ্ধি এবং রাজ্য প্রাপ্তিতে তিনি যারপরনাই আনন্দিত হলেন। এখন আর তিনি রাজধানীতে আসবেন না—এই একটি মাত্র দুঃখ তাঁর ছিল। দলপতি সিংহ প্রত্যহ কল্যাণমলের বাড়ি যেতেন। তাঁদের কথা-বার্তার বিষয়বস্তু বেশিরভাগ সময়েই হতো রামগড় রাজ্য সংক্রান্ত। সে রাজ্যের উন্নতি, জনসাধারণের উন্নতির উপায়, প্রতিবেশী রাজাদের সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তি প্রভৃতি বহু বিষয় সম্বন্ধে শেঠজী তাঁকে উপদেশ দিতেন।

সেখানে গেলেই সুরজমোহিনীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টায় তিনি থাকতেন। কিন্তু তার সঙ্গে দেখা হতো না। রামগড় যাওয়ার দু দিন আগে তিনি যখন শেঠজীর বাড়ি থেকে ফিরছেন এমন সময় দুর্গাদেবী তাঁকে ভিতরে ডেকে পাঠালেন। রাণীর মুখ আনন্দে ভরে উঠেছিল। তিনি বললেন, 'মহারাজ! দুদিনের মধ্যেই আপনি চলে যাবেন। আমাকে এবং মোহিনীকে আপনি যে সাহায্য করেছেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে আজীবন ঋণী থাকবো। এই বৃদ্ধার আশীর্বাদ গ্রহণ করুন। কালীমাতার কৃপায় আপনার কল্যাণ হোক।'

'মহারাজ' সম্বোধনে দলপতি সিংহের হাসি পেল। কিন্তু নিজে যে পদাধিকারীর সম্মানে উন্নীত হয়েছেন সে কথা স্মরণ করে তিনি এই সম্মানসূচক সম্বোধনকে মেনে নিয়ে সবিনয়ে বললেন, 'মহারাণী, আমি এমন কি সাহায্য করতে পেরেছি যার জন্য আপনি এইকথা বলছেন? আপনার আশীর্বাদই আমার শক্তির উৎস। সুরজমোহিনী কেমন আছে?'

'মোহিনী ভাল আছে। আপনি মহারাজ এবং সে রাজকুমারী। সেই জন্য আমাদের আচার অনুযায়ী বিয়ের আগে আপনারা পরস্পরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না। সে স্বাধীনভাবে মানুষ হয়েছে। তার কাছে এটা খুব কষ্টকর তবু দাদুর আদেশে এটা তাকে মেনে চলতে হচ্ছে।'

দলপতি সিংহ এতক্ষণে ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়ার পর থেকে অনুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত বর-বধূর মিলন ক্ষত্রিয় রাজাদের রীতি অনুসারে নিষিদ্ধ ছিল। নিজের বংশ প্রভৃতি সম্বন্ধে সুরজমোহিনী এ পর্যন্ত অজ্ঞ ছিল। বিয়ের সম্বন্ধ স্থির হওয়ার পর এ সমস্ত তাকে জানিয়ে দেওয়া দরকার বলে শেঠজী অনুভব করেছিলেন। ছত্রসিংহের কন্যার পক্ষে রাজপুত আচার আচরণ ত্যাগ করা অনুচিত এবং রামগড়ের ভাবী রাণীর পক্ষেও কোন রকম অপবাদ বাঞ্ছনীয় নয়। এই সব কথা চিন্তা করে শেঠজী বিয়ে পর্যন্ত তার দলপতি সিংহের সামনে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কুলীন কুমারীও এই আদেশ শিরোধার্য করেছিল।

শেষে দলপতি সিংহ বললেন, 'মহারাণী, দুদিনের মধ্যেই আমি রামগড়ের দিকে রওনা হচ্ছি। কিন্তু আমার হৃদয় এখানে রেখে যাচ্ছি। আমার মন সর্বদা আপনার কাছেই পড়ে থাকবে।'

যথাসময়ে বাদশাহের আদেশনামা এলো। সকলের আশীর্বাদ নিয়ে দলপতি সিংহ রামগড়ের দিকে যাত্রা করলেন।

রামগড়ে রাজার রাজ্যাভিষেক যথারীতি সম্পন্ন হলো। বাদশাহের সম্মান এবং খেতাব নিয়ে রাজধানী থেকে যখন দূত এলো তখন রাজ্যের অধিবাসীরা জানতে পারল যে এতদিনের সাধারণ একটি রাজ্য রামগড় এখন থেকে ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির অন্যতম বলে পরিগণিত হবে। মহারাজ অজিত সিংহ যে তখনও জীবিত এবং তাঁর নির্দেশমত মতই যে দলপতি সিংহ রাজ সিংহাসন গ্রহণ করছেন এই কথা কেউ জানল না। রাজ্যাভিষেকের দিন সিংহাসনে আসীন নতুন মহারাজা উঠে দাঁড়িয়ে যখন বাদশাহের অভিজ্ঞানপত্র স্বীকার করলেন সেই সময় অপর একটি পত্রও তিনি অন্য একজন দূতের হাত থেকে গ্রহণ করলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলী এতে বিস্মিত হলেন। কিন্তু এই দূতটি যে কার তা তারা জানতে পারলেন না। ভ্রাতার মৃত্যু জনিত অশৌচ কেটে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরজমোহিনীর সঙ্গে দলপতি সিংহের বিয়ে হলো। ওই সময় তাঁরা বহু উপহার পেলেন। প্রাপ্ত উপহারগুলির মধ্যে তিনটি তাঁদের খুব আনন্দদান করল। একটি ছিল শেঠজী প্রেরিত একগাছি মুক্তার হার। তার সঙ্গে লেখা চিঠিতে শেঠজী জানালেন যে এই হারটি বহুদিন আগে কোন এক মারাঠা নায়কের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বংশ পরম্পরা রামগড়ের রাণীরা এই হার পরেছেন। রামগড়ে রাজলক্ষীর মত একে রক্ষা করা হয়েছে। মহারাণী হারটিকে সঙ্গে এনেছিলেন এবং এখন তিনি হারটি প্রকৃত উত্তরাধিকারিণীর কাছে পাঠাচ্ছেন। দ্বিতীয় উপহার ছিল বাদশাহের একটি ফরমান যার দ্বারা ছত্র সিংহের হাত থেকে নিয়ে নেওয়া তাঁর সীতাপুর রাজ্য তাঁর কন্যা সুরজমোহিনীকে সসম্মানে প্রত্যার্পিত হয়েছে। তৃতীয়

কন্তুটি ছিল আনারের দানার আকৃতি বিশিষ্ট রত্নেগাঁথা একটি মালা। এটি এসেছিল অজ্ঞাত এক প্রেরকের কাছ থেকে। মালাটি যে গুল আনারা পাঠিয়েছে তা দলপতি সিংহ বুঝতে পারলেন। তিনি যখন মালাটিকে মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষণ করছিলেন তখন সুরজ-মোহিনী সেটির সম্বন্ধে জানতে চাইল। গুল আনারার নিকলুষ প্রেম এবং তার সাহায্যের কাহিনী দলপতি সিংহ তার কাছে বর্ণনা করলেন। সুরজমোহিনী বলল, 'এই মালা আমি রোজ পরবো। সে যে আপনাকে ভালবেসেছে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু আমাকে বাঁচানোর যে চেষ্টা সে করেছে তার ফলে তার হৃদয়ের সৌন্দর্য পূর্ণ রূপে প্রকাশিত হয়েছে।'

সুরজমোহিনীর বিয়ের পর আকবরের সম্মতি নিয়ে কল্যাণমল সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। কোন্ দেশে যে তিনি গেলেন আর কোথায় যে তিনি তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন তা কেউ জানলো না।

কাহিনীর অপরাপর ব্যক্তিবর্গের সংবাদ জানার আগ্রহে পাঠকবৃন্দ নিশ্চয় উৎসুক হয়ে রয়েছেন। সেলিম শাহ আরও দু তিন বছর পিতার বিরুদ্ধে সংগ্রামরত রইলেন। অবশেষে রাজমাতার আগ্রহকে স্বীকার করে নিয়ে তিনি আগ্রায় ফিরে এলেন এবং বাদশাহের ক্ষমা লাভ করে যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হলেন। তিনিই শেষে 'জাহাঙ্গীর' নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়েছিলেন।

পৃথ্বী সিংহ রাঠোর বাদশাহের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর বিশ্বাসভাজন মন্ত্রীরূপে আগ্রা শহরেই রইলেন। বাদশাহ কর্তৃক সম্মানিত গজরাজ পত্নী এবং কনিষ্ঠা কন্যাসহ স্বগৃহে সুখে বাস করতে লাগলো। মুসলমানের অন্তঃপুরে থাকার দরুন প্রথমে সে তার স্ত্রীকে গ্রহণ করতে অস্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু কল্যাণমল এবং ভোজ সিংহ শ্রীরামচন্দ্রের উদাহরণ দিয়ে তাকে বুঝিয়ে বলাতে সে তার পত্নীকে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হয়েছিল। পিতার সঙ্গে ফিরে যেতে পদ্মিনী কোনমতেই রাজী হলো না। সুরজমোহিনীর সেবায় সে তার জীবন অতিবাহিত করবে বলে

দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। সুতরাং শেঠজী তাকে নিজের কাছেই রেখেছিলেন। বিয়ের পর সে সুরজমোহিনীর সঙ্গে রামগড় গেল।

নাসির খাঁর মৃত্যুর ফলে নিরাশ্রয় কাশিম বেগ হীরাজানের বাড়িতে রইল। পৃথ্বী সিংহের প্রাসাদে বন্দী ইব্রাহিম খাঁ আত্মীয়দের প্রতি-পত্তির সাহায্যে উন্নতি লাভ করল। দানিয়াল শাহের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যোগ্যতা প্রদর্শন করে সে উচ্চপদ লাভ করেছিল।

দানিয়াল শাহ দাক্ষিণাত্য থেকে আর ফেরেন নি। অত্যধিক মদ্যপানের ফলে তাঁর দেহ এবং মন ভেঙে গিয়েছিল। আকবরের জীবিতাবস্থাতেই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। বীরসিংহ বুঁদেলাকে বন্দী করা যায়নি। জাহাঙ্গীর বাদশাহ হওয়ার পর তিনি তাঁর কুকর্মের পুরস্কার লাভ করেছিলেন এবং শেষে সে বাদশাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসাবে জীবন কাটিয়েছিলেন।

রামগড়ের রাজ দম্পতি যথাকালে একটি পুত্রলাভ করলেন। দশ দিনের মধ্যে জনৈক ত্রিশূলধারী সন্ন্যাসী রাজপুরীতে এসে নবজাতককে একটি সোনার রক্ষা কবচ দান করে কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই অন্তর্হিত হলেন। কবচটি দেখে সুরজমোহিনী বললেন, 'সন্ন্যাসী হয়েও দাদু আমাদের ভুলতে পারেন নি। এই সন্তানকে চিরদিন তিনি রক্ষা করবেন।'

দলপতি সিংহের চোখে অশ্রু ভরে গেল।